প্রসঙ্গ ঃ
জাঁ পোল সার্ত্র

তন্ময় দত্ত সম্পাদিত

বিদ্বৎসাহী প্রকাশ
৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০১

PROSANGA : JEAN PAUL SARTRE
Editor : Tonmoy Dutta

মার্চ, ১৯৬৩

প্রকাশক
তন্ময় দত্ত
বিদ্বৎসাহী প্রকাশ
C/o. Shivali Copy Centre
৫, ম্যাঙ্গো লেন
কোলকাতা-৭০০ ০০১

মুদ্রক
এ্যাঞ্জেলা প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিসিটি
৭এ, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি

প্রচ্ছদ : আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী ঘোষ, সতীনাথ চক্রবর্তী আমায় বিশেষ উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

ফরাসী ভাষার শিক্ষক এবং কবি পুষ্কর দাশগুপ্তের কাছে আমি বিশেষ ঋণী। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজন বড়ুয়া এবং অন্যান্য অনেক বন্ধু আমায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

সুবীর পোদ্দার (আনন্দ), অভিজিৎ ঘোষ (প্রমা), ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মানব-মন), নৃপেন সাহা (গ্রুপ থিয়েটার), সুখেন্দু ভট্টাচার্য (আন্তর্জাতিক ছোট গল্প) প্রমুখ সম্পাদক, অনুবাদক এবং লেখকরা আমার সঙ্গে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তন্ময় দত্ত

প্রসঙ্গ ঃ জঁা পোল সার্ত্র

সূচীপত্র

সম্পাদকের বক্তব্য

॥ এক ॥

> "আমি মনে করেছিলাম কর্মের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হবে এক ব্যর্থতা-পরম্পরা, তা থেকে অদৃষ্টপূর্বভাবে বেরিয়ে আসবে ইতি-বাচক কিছু, যা ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল, কিন্তু যারা সফল হতে চেয়েছিল তাদের চোখে ধরা পড়েনি। যারা কাজ করেছে তাদের কাছে দুর্নিরীক্ষ এই সব আংশিক ও স্থানীয় সাফল্যের পর পর ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে এক অগ্রগতি রচনা করবে। ইতিহাসকে আমি বরাবর ঐভাবেই বুঝেছি।"
>
> (সাত্র্‌/শেষ সংলাপ। অনুঃ—অরুণ মিত্র)

একালের পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠস্বর এবং বুদ্ধিজীবী মহলের 'চলমান স্ববিরোধ' জাঁ-পোল সাত্র্‌ মারা গেলেন। মৃত্যুর পরেও সাত্র্‌কে নিয়ে বুদ্ধিজীবী এবং পণ্ডিত মহলে বিতর্কের শেষ নেই, সমাধানও 'দূর অস্ত'। 'প্রসঙ্গ জাঁ-পোল সাত্র্‌'ও কোনও সূক্ষ্ম সমাধানবাহী নয়। রূপরেখা মাত্র।

সাত্র্‌ নিজেকে 'চলমান স্ববিরোধ' বলে চিহ্নিত করতে পেছপা হন নি, যেমন হন নি তাঁর স্ববিরোধীতা নিয়ে যুক্তি-তর্কে মেতে উঠতে। কোনো সাক্ষাৎকার বা প্রবন্ধে তিনি তা এড়িয়ে যান নি, সতর্ক দার্শনিক-সুলভ অনু-সন্ধানী প্রেরনায় যুক্তির পরে যুক্তি সাজিয়ে, কখনো পূর্ব যুক্তি নতুন সময় এবং পরিস্থিতিতে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি তার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর 'সত্তা ও শূন্যতা' গ্রন্থের নিরাশার দিকটাকে শেষ জীবনে তিনি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন এবং নিজেকে 'অপটিমিষ্ট' বা আশাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।

ছেলেবেলাকার একাকী সাত্র্‌ তাঁর সমস্ত সত্তাকে 'বইয়ে'র মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। "জীবন শুরু করেছি আমি বইয়ের মধ্যে এবং নিঃসন্দেহে সেখানে শেষ করবো," বা তিনি যখন গ্রন্থাগারকে 'মন্দিরের' মতো দেখতে চান তখন 'বইপোকা' সাত্র্‌কে চিনে নিতে অসুবিধা কোথায়? রীতিমতো তালিম প্রাপ্ত দার্শনিক গবেষকের ভূমিকায় তাঁর সময়-পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তাঁর দৃষ্টিতে কোনো কিছুই 'অরাজনৈতিক' থাকে নি। নিজেকে তিনি যে স্থানাঙ্কে নির্ণয় করেছেন সেখানে তিনি শুধুমাত্র ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার বা দার্শনিক হয়ে থাকেন নি, সবশুদ্ধ নিজেকে

নিয়ে সমাজ এবং সময়ের সঙ্গে থেকেছেন, বোমার মতো ফেটে পড়তে চেয়েছেন গণমানসে, মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবেই নোবেল পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকার করেছেন।

সার্ত্র তত্ত্বের দেওয়ালে নিজেকে কখনো বন্দী রাখেন নি। যিনি প্রতিষ্ঠান বিরোধী তিনি যে কোন অর্থেই এবং পরিস্থিতিতেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। সার্ত্রের গোটা জীবনটা বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সত্যির মুখোমুখি হই।

ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়ে সার্ত্র তাঁর সবচেয়ে কাছের সঙ্গী হিসেবে তাঁর দাদামশাইকে পেয়েছিলেন, যিনি তাঁর অভিবাবকও ছিলেন। তাঁর মা তাঁর চোখে বোনের ইমেজ নিয়ে 'ছোট্ট-প্রভাতী বান্ধবী' হয়ে রয়ে গেছিলেন। নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর বাবার অকালমৃত্যু যে তাঁর ওপর এক অসম্পূর্ণ 'অদিপাউস কমপ্লেক্স' ফেলে গেছিল এমন কথাও তিনি কবুল করেছেন। সার্ত্র তাঁর মাতুলালয়ে ছেলেবেলা কাটিয়েছিলেন যে পরিবারে সেখানে ভলত্যের প্রভাবিত 'বুর্জোয়া লিবারেলিজমের' ছোঁয়া ফ্রান্সের অন্যান্য মধ্যবিত্তদের তুলনায় এক শতাব্দী আগেই লেগেছিল। যৌবনেই সার্ত্র নিজেকে জীবনের একনিষ্ঠ ছাত্ররূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। দর্শনের শিক্ষা নিয়েছেন জর্মনে দার্শনিক হুসের্লের কাছে। এরপর কিছুকালের জন্যে অধ্যাপনা করেছেন। তারপর সরাসরি লেখা এবং সাহিত্য তথা সমাজ-আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। "লিখবো সেটা বোঝা গেল ; আমার যথেষ্ট জানা দরকার যাতে আমার ইচ্ছাপথে বাধা না পাই" (শব্দাবলি), এই জানার আকাঙ্খার মাধ্যমে সার্ত্র নিজেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কেতাবী জগৎ থেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বুর্জোয়াজী প্রদত্ত পথে সার্ত্র হাঁটেন নি, যে পথে প্রতিষ্ঠা পেলে সার্ত্র বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হতেন।

'অস্তিত্ববাদী' সার্ত্র এক সাক্ষাৎকারে হেমিংওয়েকে বলেছিলেন : "Newspapermen made the word "Existentialism"—একথা সার্ত্র এমন এক পরিস্থিতিতে বলছেন যখন মার্কসবাদ এবং অস্তিত্ববাদকে তিনি আর আলাদা করে দেখছেন না। তাঁর প্রবন্ধাবলীর অনেক সমালোচনা তিনি নিজেই করে গেছেন, ফলে তিনি নিজেই সমালোচকদের 'বিতর্কিত' শব্দটা কোথাও কোথাও খণ্ডন করতে এবং 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেই সার্ত্র নিজেকে সরাসরি

সংগ্রামে যুক্ত করেন। ২য় মহাযুদ্ধের আগেকার অর্থনৈতিক সংকট, ফ্যাসীবাদের উদয় এবং মার্কসবাদের জনপ্রিয়তা—এই পটভূমিকায় সাত্র্ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিছু পরে তিনি পার্টি ত্যাগ করেন, কিন্তু মার্কসবাদ বিরোধী হন না। মার্কসবাদী সাত্র্ তাই পঞ্চাশের শেষে সেই সহাবস্থানের কথাই বলতেন—"কমিউনিষ্টরা ঠিক, আমিও ভুল করিনি।"

জর্মন অধিগ্রহণে বন্দী ফরাসী সৈনিক সাত্র্ পরে ফরাসী সরকারেই বন্দী হয়েছেন কয়েকবার, হয়েছেন আলজিরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে, ছাত্র-আন্দোলনের প্রশ্নে। শেষবার 'মাওবাদী' পত্রিকা সম্পাদনের কালে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে দ্য গল তাকে ভলতোরের মহান রূপের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এটা কোন কর্তব্যের ব্যাপার নয়। ক'বছর আগে তাঁর বাসস্থানে সাত্র্ দুবার গুণ্ডাদের বোমার আক্রমণ সহ্য করেন।

যে কালে ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং ফ্যাসীবাদের প্রতিবাদে ইউরোপ, আমেরিকা, রাশা হয়ে এশার বিভিন্ন অংশেও 'প্রতিরোধী মোর্চা' তৈরী হয়েছিল সাত্র্ সেকালেই প্যারীতে প্রতিরোধের মাধ্যমে শিল্পে-সাহিত্যে টিকে থাকার আন্দোলনে সামিল হন। প্রতিরোধ, দায়বদ্ধতা, সেই সঙ্গে অস্তিত্বের সংকট মোচনের প্রচেষ্টায় সাত্র্ নিজেকে আজীবন যুক্ত করে রেখেছেন—তাতে তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং নাটকগুলো যে ভীষণভাবে প্রভাবিত সন্দেহ নেই। ভাবনাকে তিনি সৎ এবং দায়িত্বশীলের কঠোর ক্ষমতা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিতে প্রয়োগ করেছেন। তা তাঁর 'অন্তরঙ্গতা' গল্প গ্রন্থ থেকে 'সার্চ ফর এ মেথড' প্রবন্ধগ্রন্থ অবধি প্রতিফলিত। 'বিবমিষা' (উপন্যাস) এবং 'মাছি' (নাটক) তাই তাঁর দর্শন-যুক্ত-রাজনৈতিক ভাবনা প্রসূত। সময়ের দিক থেকে দুটোই দুভাবে বৈপ্লবিক। 'স্বাধীনতার পথে' (উপন্যাসত্রয়) চল্লিশের যুদ্ধরত (দুভাবেই-আত্মিক এবং জাগতিক) মানসিকতা প্রচণ্ড পরাজয় জেনেও পালায় না। প্রতিরোধ করে, করতে করতে ঘৃণা চরম শত্রুর বিরুদ্ধে চরম ক্রোধের জন্ম দেয়। এই মানসিক জয়ের আশাতেই সাত্র্ আশাবাদী। তাই 'বিবমিষা'য় অধ্যাপক কর্তৃক গ্রন্থাগারিক প্রহারের ঘটনা আরো বেশী করে এক আশাবাদী সাত্রে্র পরিচয় দেয়। ধারণাকে সাত্র্ কখনোই পরিস্ফুট-রূপ দেন নি। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে তাই বৃদ্ধ দৃষ্টিশক্তিহীন সাত্র্কে বলতে হয় "ভবিষ্যত আমার অনেক সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করবে, আমি আশা করি আমার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত টিকে থাকবে" (শেষ সংলাপ) এবং টিকে থাকবে মানুষের

প্রয়োজনেই। কেননা "সাত্রঁ-এর দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বরাবরই মানুষ, সেই মানুষই তাঁর এই অন্তিম অনুধ্যানেরও বিষয়।" আমরা অবশ্যই গোর্কির জোরালো গলায় 'মানুষের জন্তে' শুনেছি। সাত্রেঁর গলায় তারই স্বাভাবিক পরিণতি, যা আধুনিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মানুষিক অনেকজটিলতার সমাধানে নব্য-জটিলতার মুখোমুখি। মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে উপমানবীয় স্তর থেকে মানবতায় উত্তরণের পথে। "...মানুষের অস্তিত্ব যখন সত্যিকার হবে, সমগ্র হবে, তখন তার দোসরদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং নিজের দ্বারা তার নিজের হয়ে ওঠার পদ্ধতি. যাকে বলা হয় মানবতাবাদ, অর্থাৎ সোজা কথায় মানবতাবাদ হবে মানুষের হয়ে ওঠার পদ্ধতি, অন্য মানুষের সঙ্গে তার হয়ে ওঠার পদ্ধতি" (শেষ সংলাপ)। এবং সাত্রঁ তাঁর শ্রেণী চরিত্র অনুযায়ী 'হয়ে ওঠার' কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন পরম যুক্তিবাদী পথে। এই কাজে 'মার্কসীয়' প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে যাননি কোথাও। এ'ব্যাপারে শিল্পী-সমালোচক-গবেষক এবং দার্শনিক সততার দিক দিয়ে, অনমনীয়তার দিক দিয়ে সাত্রঁ ইতিহাসের সফল আধুনিক মানুষদের একজন। মানুষকে 'উপমানবীয়' স্তরে প্রত্যক্ষ করেছেন সাত্রঁ। সেই স্তরকেই তাঁর আশাবাদের আলোয় এনে বৃদ্ধ সাত্রঁ বলেছেন:"..যদি মনে করা যায় এই সব উপ-মানবের মধ্যে এমন মূলনীতি আছে যা উপমানব প্রাণীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে আজকের দিনে যেসব মূলনীতি প্রতিষ্ঠালাভ করছে তার দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-চিন্তাকে আমরা বলতে পারব মানবতাবাদ" (শেষ সংলাপ)। এই মানবতাবাদ ধরেই বরং সাত্রঁ প্রসঙ্গের অবতারণা। এভাবে বলা যায় : মানুষের 'হতাশার উল্টোপিঠে ইতিহাস লিখে রাখা'র 'সত্তা এবং শূন্যতা'কে স্থিতিশীল কিমিতিবাদে পরিণত হতে না দিয়ে, জীবনের একনিষ্ঠ সিয়েরিয়াস ছাত্র এবং শিক্ষক জ্যাঁ-পোল সাত্রঁ নিজেকে 'আলোচনার মাধ্যমে' বার করে আনতে চেয়েছেন।

ব্যক্তির রাজনৈতিক ভূমিকায় তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি রাজনীতি এড়িয়ে গেলেও রাজনীতি ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় না। এই জাতীয় অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্নের স্বতঃসিদ্ধতার মোকাবিলা করতে চেয়েছেন সাত্রঁ। 'ব্যক্তি-সমাজ-রাজনীতি'—এর কোনটাকে কোনটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি দেখতে চাননি।

প্রথম দিকের রচিত ছোটগল্পগুলোয় (অন্তরঙ্গতা) তাঁর সমকালীন মানসিকতা কাজ করেছে। 'অন্তরঙ্গতা' গল্পে সাত্রঁ দেখিয়েছেন মানুষের

ভালবাসা অভ্যাসে পরিণত। এই অভ্যাসই মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতার জন্ম দেয়, যা ইচ্ছে করলেই আমরা ত্যাগ করতে পারি না।

'ইরোসট্রেটাস' গল্পে এক বিশেষ ধরণের ইউরোপিয়ান মানুষের ছবি এঁকেছেন, যে পুঁজিবাদী সংকটে নিঃস্ব এবং একা। এই একাকিত্ব তাকে তার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের দাপটে অসামাজিক এবং নৈরাজ্যবাদী করে তোলে। তার উদ্‌ভ্রান্তি উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয় যখন সে মানুষের মধ্যে এসে পড়ে। সে যৌন-বিকৃতি এবং 'সুপার-ম্যানিয়ায়' ভোগে, পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করতে চায় এবং অবশেষে সে জানত 'ওরা আমায় একদিন পিটিয়েই ছাড়বে'—তাই ঘটে। সাত্রে'র ওপর যে নিৎসে এবং নৈরাজ্যবাদের ছায়া পড়েছিল তার সুচিন্তিত পরিচয় তিনি রেখেছেন এই গল্পে। এ জাতীয় বিপন্ন অস্তিত্বের মানুষ আঁকার চেষ্টা ১ম মহাযুদ্ধের পর থেকে এই ঠাণ্ডা ৩য় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির দিন অবধি রয়ে গেছে। ডারউইন-এ্যান্টিডারউইন, ফ্রয়েড-এ্যান্টি-ফ্রয়েড, মার্কস-এ্যান্টি-মার্কস—ইত্যাদি ঝোঁক যে জটিল বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে তাতে দস্তোয়েভস্কি, পো, কাফ্‌কা, কামু, জয়েস, উলফ্-হয়ে আজ এই বোরহেস-সলবেলোর কাল অবধি একই যন্ত্রণা। চীনা লেখক লু-সুন বা আলবেনীয় লেখক মিগজেনীও এ থেকে রেহাই পান নি। যার মোকাবিলা করছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা—গোর্কির নির্দেশিত পথ। 'ইরোসট্রেটাস' এক গ্রীক সম্রাটের কাল্পনিক রূপ, যে নিজে মহৎ কিছু করতে পারে নি বলে ইপিসিউসের মন্দিরগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল।

'জনৈক নেতার ছেলেবেলা'য় সাত্র' এক বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত ছেলেবেলা দেখিয়েছেন যা উচ্চমার্গীয় বা এলিয়টিও জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। সেই 'অদিপাউস কমপ্লেক্সে' ভোগা এক শিশু যে তার মাকে বান্ধবীর আসনে বসিয়ে তার খেলার সঙ্গী খুঁজে পায়। 'কক্ষটি' গল্পে তিনি একই জটিলতার ছবি এঁকেছেন। এই সমস্ত ছবি তাঁর চারপাশ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ছবি—আসলে সাত্র' যার বিরোধীতা করতে চেয়েছেন।

তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সার্থক এবং উল্লেখযোগ্য গল্প হলো—'দেওয়াল'। পৃথিবীর গল্পের ইতিহাসে এই গল্প এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সংযোজন। এই জনপ্রিয় গল্প বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্তদের চরম প্রতিরোধের পরিচয় বহন করছে। পটভূমিকা স্পেনের গৃহযুদ্ধের, যে যুদ্ধে পৃথিবীর তাবৎ বিদ্বৎ-পণ্ডিত এবং মধ্যবিত্তরা সরিক হয়েছিলেন। যে আন্তর্জাতিক ইনটেলেকচুয়াল অনুপ্রেরণায় 'ইন্টারন্যাশনাল বিগ্রেড' তৈরী হয়েছিল তাতে

অসংখ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-সমালোচকদের প্রাণ বলিদান হয়। যদিও ফ্যাসীবাদ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং স্পেনের 'জনপ্রিয় সরকারে'র পতন হয়, তবু পৃথিবীতে যতদিন ফ্যাসীবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন স্পেনই ফ্যাসী-বিরোধীদের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎসবিন্দু। 'দেওয়াল' পাঠক-মানসে এক অদ্ভুত বিক্রিয়ার জন্ম দেয়, যা অনুভূতির দিক দিয়ে অসাধারণত্বের দাবী রাখতে পারে। 'দেওয়ালে' ফ্যাসিষ্টদের অত্যাচার এবং বিপ্লবীদের প্রতিরোধ দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী ছিল। বিপ্লবীদের মানসিকতাকে সার্ত্র এক বিশিষ্ট ঝাঁঝে পরিণত করেছেন যা পাঠকদের মনে সংক্রামিত এবং সঞ্চারিত হতে বাধ্য, যার আরেক বাস্তব রূপ দিয়েছেন তাঁর নাটক 'ছায়াহীন-মানুষেরা'য়।

তাঁর আজীবন সঙ্গীনী সিমোন দ্য বভোয়া সার্ত্রের বুর্জোয়া সাংস্কৃতির বিরোধীতার পরিচয় রেখেছেন : "In Sartre, bourgeois recognised themselves without consenting to the self-transcendence he exemplified ; he was speaking their language, and using it to tell them things they did not want to hear." (Force of Circumstances)। অন্য পক্ষে সার্ত্র বলেছেন : "যদিও আমি চিরকাল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধীতা করেছি, আমার সব রচনাই লেখা হয়েছে এই শ্রেণীর জন্য, এই শ্রেণীর ভাষায়।" সার্ত্রের মৃত্যুর পর বভোয়া আরও বলেন যে শ্রমিকদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা সত্ত্বেও সার্ত্র শ্রমিকদের কাছে পৌঁছুতে পারেন নি। সার্ত্র তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিতে আগামীদিনে তাঁর রচনা নিয়ে শ্রমিক পাঠকদের তর্ক-বিতর্ক প্রত্যক্ষ করে গেছেন মাত্র।

সমকালে 'Action পত্রিকায় Henry Lefebvre সার্ত্রকে অভিযুক্ত করেন সমস্ত দর্শনের পথে প্রতিবন্ধক বলে। কিন্তু এ সম্পর্কে বিশেষ করে না হলেও চল্লিশের দশকে সার্ত্র তার যুক্তি রেখেছিলেন : "সত্যি যদি একটাই হয়, আমি ভেবেছিলাম, তাহলে আমাদের তা চিন্তা করা উচিত, আমরা অর্থের শিকারী হব, আমরা পৃথিবী এবং আমাদের জীবনের সত্যি কথা বলবো"। এই আত্মস্বীকৃত সত্যির কাছে তিনি আজীবন সৎ এবং দায়বদ্ধ ছিলেন।

দায়বদ্ধতা এবং সততা সার্ত্রকে তাঁর প্রতিরোধী ভূমিকায় দৃঢ়বদ্ধ করেছে। চল্লিশের ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন, দায়বদ্ধতার সাহিত্য আন্দোলন, জর্মণ অধিগ্রহণে নাৎসী-বন্দী সার্ত্রের নাট্য-আন্দোলন, আলজিরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্দোলন, সাম্যবাদী দলে যুক্ত হয়ে মার্কসবাদী আন্দোলন, নোবেল

পুরস্কার অস্বীকারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার আন্দোলন, 'ওয়ার্ল্ড পিস্ কাউন্সিলে'র মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তিকামী আন্দোলন, যুক্তরাষ্ট্রের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ভিয়েতনামে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ষাটের শেষে ছাত্র-আন্দোলন—ইত্যাদি আন্দোলনে তিনি শুধুমাত্র সহানুভূতির মাধ্যমে যুক্ত হননি, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন এবং কখনো নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কোন সমস্যাই তাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। আজকের বুদ্ধিজীবী সমস্যা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসনিক সমস্যা, আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা কোন কিছুতেই তিনি তাঁর ভাবনা বহির্ভূত রাখেন নি। মধ্য প্রাচ্য সমস্যা, সমাজতান্ত্রিক শিবির বিভাজন, তৃতীয় দুনিয়া সমস্যা থেকে 'আংশিক বিলুপ্তির পথে' মাওবাদ অবধি আধুনিক সমস্যাকেও তিনি তাঁর চিন্তায় স্থান দিয়েছেন। এমনকি তাঁর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে, অন্ধ সাত্র্ আফগান সমস্যা প্রসঙ্গেও মতামত রেখেছেন।

এদিকে দিয়ে সাত্র্ এই শতাব্দীর একজন সঠিক বুদ্ধিজীবী এবং নির্ভেজাল বিদ্বৎজন। সাত্র্ খোলাখুলি বলার ক্ষমতা রাখেন যে "মধ্যবিত্ত স্তর থেকে এসে, আমরা ইনটেলেকচুয়াল পাতি-বুর্জোয়াজী এবং কমিউনিষ্ট ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যেকার ফাঁদে সেতু নির্মাণের চেষ্টা করেছি।" মনে হয় সাত্রে'র এই খোলাখুলি মতামত তাঁর সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক পরিচয় বহন করছে। তবু তাঁর এই প্রচেষ্টা এযাবৎ বিকল, 'আংশিক সফলতা সত্ত্বেও। এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট বিতর্কিত। যার চূড়ান্ত পর্যায়ে মার্কসবাদ এবং অস্তিত্ববাদের মিলন-সেতু নির্মাণের চিন্তা কাজ করেছে। মার্গারেট চ্যাটার্জী তাঁর 'দি একসিস্টেনশিয়ালিষ্ট আউটলুক' গ্রন্থে মতামত রাখছেন : What Sartre has tried to do is to graft on to a Marxist framework a fragment of liberal ideology, the belief in the efficacy of individual initiative." এবং শ্রীমতী চ্যাটার্জী ফলাফল প্রসঙ্গে বলছেন : "The attempt is brave but the result not very successful."—এই মতামত অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। দর্শন তাঁর রচনা থেকে রেহাই পায় নি কখনো। কেউ কেউ অভিযোগ করেন জর্মন দর্শন এবং আমেরিকান রচনা-পদ্ধতি দ্বারা সাত্র্ প্রভাবিত হয়েছিলেন। Robert Denoon Cumming তাঁর 'দি ফিলজফি অব জ্যঁ-পোল সাত্র্' সংকলনের ভূমিকায় বলছেন : "......how difficult it is to separate the American Novelist in Sartre from the

German philosopher.'' এই মন্তব্যেও আংশিক সত্যি নিহিত রয়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর মাতুলালয়ের মাধ্যমে জর্মন সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা এবং প্যারীর রেঁস্তোরায় হেমিংওয়েকে নিয়ে মাতামাতি সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তার ইতিহাসে ভলতেয়রের ধারায় ফ্রান্সের যে দান সাত্র' সেই ধারা বহির্ভূত ছিলেন না। যে ধারার প্রভাবেই তিনি বলেন : 'পৃথিবীর ভার আমাদের সবার মাথার ওপর।'' এবং তাঁর রচনায় উলফ-জয়েসের 'চেতনা-প্রবাহের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তারও আধুনিক জন্ম তো ফরাসী মনেই—প্রুস্তের কলমে।

সময়ের সঙ্গে পরিণত সাত্র' প্রতিভা বিরোধী সবকিছুকেই 'চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে গ্রহণ করতেন'। সাম্প্রতিককালে জনৈক ইয়োরোপীয় সাংবাদিক সাত্র'কে বলেছিলেন যে তাঁর বই আর তেমন সংখ্যায় পঠিত হচ্ছে না যুবক মহলে। উত্তরে সাত্র' বলেন : ''ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রে খুব খারাপ, সেই সঙ্গে ওদের ক্ষেত্রেও।''

॥ ২ ॥

> ''মারশিয়া বাংলায় যাচ্ছিল এক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে। আমি চিরকাল বাংলায় যেতে চাইতাম এবং ও আমাকে ওর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।''
>
> (সাত্র'/'বিবমিষা')

'বিবমিষা'র নায়ক শেষ অবধি বাংলায় এসে পৌছয়নি। তার ইচ্ছে ইচ্ছে পর্যায়েই রয়ে গেছে, শুধু ছাপার অক্ষরে জাহাজে বা বিমানে এই সংবাদ বাংলায় পৌছেছে। সাত্র'-চর্চা কিন্তু তার আগেই বাংলায় শুরু হয়েছে, সতীনাথ ভাদুড়ির 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে হলেও সাত্র' তাঁর সমসাময়িক কাল থেকেই বাংলায় চর্চিত ও আলোচিত। উৎপল দত্ত তাঁর 'শেক্সপিরীয়ানা' নাট্যগোষ্টির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, তিনি যে তাঁর কোনো ইংরেজ সহকর্মী মহিলার সাত্র'-চর্চাকে ঠাট্টা করতেন এমন দৃষ্টান্তও রেখেছেন। স্বাধীনতা, অগ্রণী পরিচয় প্রমুখ সংবাদপত্র-পত্রিকায় সেকালে সাত্রে'র রচনা এবং বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এই কাজে সেকালে যাঁরা তৎপর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সরোজ দত্ত, সরোজ আচার্য, চিত্তরঞ্জন, বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, অজিষ্ণু ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

চল্লিশের শেষ থেকে আজ অবধি বাংলায় সাত্র'-চর্চার ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলও

আরও ব্যাপকতা পেয়েছে। 'পরিচয়' তাঁর ফ্যাসী-বিরোধী রচনার পূর্ণমুদ্রণ করেছে। 'আনৃন্য' কামু-সাত্রে'র দর্শন এবং বিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছে। 'সত্যযুগ' আলোচনা করেছে ত'ার দর্শন, লামদঁ পত্রিকার সাক্ষাৎকার ছাপিয়েছে। 'বিজ্ঞাপন' পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে তাঁর কিছু রচনার মৌলিক অনুবাদ এবং কিছু পুর্ণমুদ্রণ। 'পাঁচিল' গল্প একাধিকবার অনূদিত হয়ে 'প্রতিরোধের গল্প' সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'তত্ত্বকৌমুদি' পত্রিকা তাঁর দর্শনের আলোচনা প্রকাশ করেছে। মৃত্যুর পর 'প্রমা' পত্রিকা তাঁর দর্শন, সাহিত্য রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। 'আন্তর্জাতিক' ছোটগল্প' তাঁর সাক্ষাৎকারের অংশ, ফ্যাসী-বিরোধী রচনার পূর্ণমুদ্রন, আত্মজীবনী সংকলন এবং 'হৈরাসট্রেটাস' ছোটগল্পটি প্রকাশ করেছে। 'অনুবাদ পত্রিকা'য় তাঁর সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রকাশ করেছে। 'মানব-মন' তাঁর দর্শনের ওপর আলোচনা প্রকাশ করেছে। 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা ত'ার নাটকের ওপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও মৃত্যুর আগে এবং পরে সাত্র' সম্পর্কিত আলোচনা, সাত্রে'র নিজস্ব রচনার অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে যা আমার ব্যক্তিগত জানার মধ্যে নেই। 'বিশ্বকোষে' ত'াকে স্থান দেওয়া হলেও বাংলায় যে তিনি যথেষ্ট চর্চিত নন—একথা সন্দেহাতীত। বিনয় ঘোষ ত'ার বিভিন্ন প্রবন্ধে একাধিকবার সাত্রে'র উক্তি গ্রহণ করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ত'াকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে কয়েকবার। এমনকি মার্কাস এফ. ফ্রণ্ডা ত'ার দীর্ঘ এগারো বছরের অনুশীলন শেষে এস. কে. ঘোষের "ষ্টুডেণ্ট চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড দ্যা ওয়াণ্ড" প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে বলেই বসলেন : "...Indian political and social leaders explained the Naxalites (supporters of Naxalbari) by referring to their sence of alienation and to the influence of writers like Marcuse and Sartre which has sceming by dominated the minds of young people through the world in the 1960s."

ফ্রণ্ডার এই মতামত বাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। ইনটেলেক-চুয়াল মহলে মার্কুশে-সাত্র' চর্চা হয়েছে নিঃশ্চয়ই, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মানস থেকে তা 'নকশাল আন্দোলনে' প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না।

ষাঠের দশক থেকে আশী অবধি কোলকাতার কয়েকটি নাট্যদল ত'ার

নাটক অভিনয় করেছেন। কোলকাতার নাট্যমোদিদের কাছে 'শ্রদ্ধাবতী বারাঙ্গনা', 'মাছি', 'ছায়াহীন মানুষেরা' নাটক পরিচিত নাটক।

বর্তমান সংকলনে সার্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে মাত্র। যদিও এই সংকলনেও ব্যাপকভাবে সার্ত্রকে নিশ্চয়ই জানা যাবে না, যতক্ষণ না তাঁর রচনাগুলোর মূলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। তবু তাঁর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিয়ে এই সংকলনের প্রচেষ্টা পাঠক-মানসে সার্ত্রকে উপস্থিত করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

শেষ জীবনে দৃষ্টি-শক্তির অসচ্ছতা যতো বেড়েছে, সেই সঙ্গেই বেড়েছে রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ। আরও বেশী করে মানুষের জন্যে চিন্তা করেছেন সার্ত্র। সেখানে দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা তাকে খুব বেশী বাধার মুখোমুখি হতে দেয়নি। তাই বোধ হয় জীবনের শেষ দিকে তাঁর স্ববিরোধীতার উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত মতামত রাখেন : "....আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা সমস্ত বলে উঠতে পারিনি, যেভাবে বলতে চেয়েছিলাম তাও বলতে পারিনি, তার জন্যে আমার জীবনের কোনো কোনো সময় কষ্ট পেয়েছি, আবার কোনো কোনো সময়ে আমার ভুলগুলো আমি বুঝতে পারিনি, ভেবেছি আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা করেছি কিন্তু আজ আমি এর কোনটাই মনে করি না। আজ আমি মনে করি আমি আমার যা সাধ্য তাই করেছি, তার যা মূল্য তাই তার মূল্য, ভবিষ্যৎ আমার অনেক সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করবে, আমি আশা করি আমার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত টিকে থাকবে।" (শেষ সংলাপ/অনু: অরুণ মিত্র)

সার্ত্র সম্পর্কে সার্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত মতামত মনে রেখে 'প্রসঙ্গ : জাঁ-পোল সার্ত্রের অবতারণা।'

—তন্ময় দত্ত

আমাদের চিন্তাধারার স্বচ্ছতা আনাতে জ্ঞানের দুটো শাখা সাহায্য করতে পারে। তা হল মার্কসবাদ ও মনোসমীক্ষা। বালজারে সার্ত্র ও পোলিটজারের মধ্যে যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল তার কথা মনে পড়ছে। পোলিটজার দেখাতে চাইছিলেন যে সার্ত্র মনে প্রাণে একজন পাতি-বুর্জোয়া। সার্ত্র তা অস্বীকার করেননি, তবে তিনি বলতে চাইলেন শুধু পাতি-বুর্জোয়া বললেই তার দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সংজ্ঞা নিরূপণ হয় না। তিনি হলেন সেই সমস্যাপূর্ণ বুর্জোয়া-ঐতিহ্যভিত্তিক বুদ্ধিজীবি যিনি, মার্কসের মতে, তার শ্রেণীসুলভ বিশ্বাসের উর্ধেও উঠতে পারেন। কি কি অবস্থায়, কেমন করে, কেন তা ঘটতে পারে? পোলিটজারের লাল চুলের গোছা আগুনের মত জ্বলতে থাকে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে শব্দের স্রোত, কিন্তু তবু তিনি সার্ত্রকে বোঝাতে পারেন না। যাইই হোক না কেন স্বাধীনতার লড়াইএ সাত্রে তার ভূমিকা পালন করেই যাবেন। আজও তিনি সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। কিন্তু সমস্যাটা ভালভাবে বিশ্লেষণ করা গেলে দেখা যেত সমস্যাটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তা বদলে গেছে। অর্থের প্রতি আমাদের যে উদাসীনতা তা ছিল এক জাতের বিলাস। প্রচুর ছিল বলেই সত্যিকারের দারিদ্র্য অথবা কঠোর অতৃপ্তিদায়ক কাজ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। আমাদের খোলা মন নিয়ে চলার পিছনে ছিল প্রথম, আমাদের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, আর দ্বিতীয়, আমরা যে সামাজিব শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণী সুলভ যে কাজকর্মগুলো তা।

অন্য আত্মপ্রশ্রয়কে বাদ দিয়ে কেন এই বিশেষ আত্মপ্রশ্ন? নিঝুম নিয়ম বাধা নিশ্চিন্ততার পথে না গিয়ে কেন এই প্রতিনিয়ত সপ্রশ্ন সচেতনতার পথ? মনোসমীক্ষকের কাছে হয়ত এর কিছু কিছু জবাব পাওয়া যেত। মানুষের মনোবিকলনে যে চিহ্নগুলো ফুটে ওঠে সেগুলোর প্রত্যেকটার একটা অর্থ আছে, আর তা রোগীর শৈশবকে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই পাওয়া যাবে—মনোসমীক্ষণের এই বক্তব্যে আমাদের আস্থা ছিল। কিন্তু এখানেই আমরা থেমে পড়ি। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনের খবর নেবার যন্ত্র হিসাবে মনোসমীক্ষণকে আমরা নাকচ করে দিই। ফ্রয়েডের "স্বপ্ন-বিশ্লেষণ" করে ও দৈনন্দিন জীবনের মনোসমীক্ষণ" বইদুটো ছাড়া আর কোন বই পড়া ছিল না। ফ্রয়েডবাদ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তাতে ফ্রয়েডবাদের মধ্যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কোনও

স্থান নেই। এই দুটোকে কিভাবে মেলানো যেতে পারে তা আমাদের কেউ দেখান নি, আমরা তা খুঁজে বার করতে অক্ষম। আমরা আমাদের "যুক্তি-স্বাধীন ইচ্ছাবাদ" নিয়ে বুঁদ হয়ে রইলাম। আমাদের বিশ্বাস স্বচ্ছ মনের কোন ব্যক্তিকে মানসিক স্বাধীনতা, সব রকমের স্মৃতি, প্রভাব, মগ্নতা বা অন্য উত্তেজক অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। বহুদিন পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ছেলেবেলায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা দিয়েই পরবর্তীকালে শৈশব থেকে আমাদের যে আবেগ-বিচ্ছিন্নতা বা শৈশবের দিন-গুলোর প্রতি আমাদের যে ঔদাসিন্য তাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

যে বয়সে তরুণদের মার্কসবাদ বা মনোসমীক্ষনের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে সেই বয়েস আমাদের ওপর এই দুই এর প্রভাব অতি সামান্যই পড়েছিল। তার কারণ শুধু এইই নয় যে এই দুই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল খাপছাড়া, টুকরো টুকরো। আমরা চাইনি যে দূর থেকে অপরিচিতের মত আমরা আমাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

কৈশোরের দায়িত্বহীনতা কাটিয়ে যে প্রাপ্তবয়স্কতাকে মনে মনে ঘৃণা করতেন সাত্র´ তারই দিকে এগিয়ে এলেন। এইবার তার মানসিক স্বনির্ভরতার পথে বিপদ দেখা দিল। প্রথমেই তাকে ১৮ মাসের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হল। পরে করতে হল শিক্ষকের কাজ। তবে এর হাত থেকে নিস্তার পাবার রাস্তাও তিনি পেলেন। জাপানে ফরাসী ভাষার অধ্যাপকের পদের এক বিজ্ঞাপন দেখে সাত্র´ ১৯৩১ সালের অক্টোবরে দরখাস্ত করে দিলেন। দু'বছর বাইরে কাটাবার কথা তার মনে মনে ছিল। পরে বিদেশে আরও কোন চাকরী যদি পান তাতেও তার অনিহা ছিল। সাত্র´র মতে লেখক বা গল্প বলিয়ের জন মিলিংটন সিংএর 'প্লে-বয়' এর মত কোন এক জায়গায় বা কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে বেশীদিন কাটান ঠিক নয়। প্রকৃতির দিক থেকে সাত্র´'একনারী-পুরুষ' নয়। স্ত্রীলোকদের সঙ্গ তার ভালোই লাগত। পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের তার কম হাস্যকর জীব বলে মনে হত। ২৩ বছর বছর বয়সে নানা রঙ্গের স্ত্রীলোক দেখার ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করার ইচ্ছে সাত্র´র মোটেই ছিল না।

সাত্র´ যে আজ আমার কাছে খোলা বইয়ের মত, আমার নিজের মনের মতই পরিস্কার, তা জেনে মনটা খুব হাল্কা হয়ে গেল। পরে ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। যদি দুজন লোকের এই ধারণা হয় যে, যে ঘটনা বা যে ব্যক্তি

সেই দুজন লোকের আস্থাভাজন তাদের ওপর ওদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে তাহলে তারা নিজেদেরই ফাঁকি দেবে। নিজেদের সত্তার ধারণা তাদের ভাগমাত্র। একজাতের ধরে-নেওয়া আনুগত্য আছে দেখছি যা চরম ভণ্ডামীরই নামান্তর। সারা দুনিয়াটাই যখন দুজনের সাধারণ সম্পত্তি তখন এই বাড়ীতে দুজনেরই থাকার কি অর্থ? দুজনকে যখন সত্যিসত্যিই ছাড়াছাড়ি করা যাবে না তখন দুইএর মধ্যে বিশাল ব্যবধান রচনা করার ভয় কেন? দুজনের-ত একটাই লক্ষ, ছিল—সবরকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা আর তার সাক্ষী হয়ে থাকা। সার্ত্র আর আমি দুজনেই এক জাতের 'মুক্তি' খুঁজছিলাম। আমি 'মুক্তি' শব্দটা ব্যবহার করছি কারণ দুজনেই ছিলাম, "মিষ্টিক"। 'সুন্দরের' প্রতি সার্ত্রের আনুগত্য ছিল নিঃসর্ত, 'সুন্দর' আর শিল্প অবিচ্ছেদ্য বলেই তিনি মনে করতেন। আর আমার কাছে "জীবন" ছিল চরম গুরুত্বের জিনিষ।

সোস্যালিষ্ট পার্টি সংগঠনটাকে আমরা তাচ্ছিল্যের জগতেই রেখেছিলাম। তার কারণ এই সংগঠনে যথেষ্ট বুর্জোয়াদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আর দ্বিতীয়তঃ আমরা মানসিকতার দিক থেকে যেকোন রকমের সংস্কারের বিরোধী ছিলাম। আমরা মনে করতাম সারা পৃথিবী জুড়ে হঠাৎ একটা ওলটপালটের মধ্যে দিয়েই সমাজ বদলাতে পারে, নইলে নয়।

সার্ত্র মনের সচেতন অংশটিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন, অথচ বাস্তবতার তিনি ছিলেন এক গভীর প্রতিবেদক। এইখানেই সার্ত্রের মৌলিকত্ব। সার্ত্র প্রচণ্ডভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন। আবার তার মধ্যে মাটি ঘেঁসে চলার একটা গুনও যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। নিজের দৃষ্টি আর যে বস্তুকে তিনি দেখছেন এই দুই এর মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করতেন না। ফলে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হত। তবে তা তার বিশ্বাসকে টলাতে পারত না।

শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়ারা আমাদের শত্রু এবং সেই শ্রেণীর বিনাশ চাই। নীতিগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে আমরা সমর্থন করতাম কারণ তারা বুর্জোয়া ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত। তাদের চাহিদার যে স্থূল সরলতা আর নানা রকমের বাস্তব অসুবিধার সঙ্গে তারা যে নিরন্তর লড়াই করে যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যে তারা বাস্তবতার সঙ্গে সত্যিকারের মুখোমুখি হয়েই লড়াই করছে।

নীতিগত পর্যায়েতেও আমরা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে নাকচ করে দিয়েছিলাম। কেতাবী ভাষায় যাকে "নৈতিক মূল্যবোধ" বলে অভিহিত করা

হয়ে থাকে তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ইকোল নর্মালে, সাত্র´ এক বেশ কার্যকরী ধ্বনি তুলেছিল, বল নাচেব বাইরের খোলসাটা হল বিজ্ঞান, ভিতরের শূন্যতাটা হল নৈতিক কচকচানি।' যে লোক সত্যিকারের প্রজ্ঞাসম্পন্ন সে নিজের ও নিজের বাইরের বিশ্বজগতের মধ্যে একটা ভারসাম্য গড়ে তোলে। এই ভারসাম্য একাধারে ব্যক্তিগত অথচ সমষ্টিগত। জ্ঞান অবিভাজ্য, তাকে টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। আর, যোগ্যতার ধীর সঞ্চয়নের মধ্য দিয়েই একমাত্র জ্ঞান লাভ করা যায়। সাত্রে´র মতে 'সত্য হল ব্যবসায়িক মনের পার্শ্বিক ফলশ্রুতি, আর ব্যবসায়িক মনই গণতন্ত্র চালায়।' যে সমস্ত মানুষ চুক্তি ঘেঁসা ও অংক-কষা নগরজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজন জগতে পথ চলেন ও জ্ঞানের পথপ্রদর্শক হিসাবে একমাত্র ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস করতেন তাঁদের প্রতি সাত্রে´র যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

আর এক শিল্প মাধ্যমকে সাত্র´ সাহিত্যের মতই উঁচুতে স্থান দিয়েছেন, তা হল চলচ্চিত্র। সাত্র´ ও আমার. দুজনেরই পরিবারের লোকেরা (সত্যি বলতে কি মধ্যবিত্তদের একটা বিরাট অংশ) মনে করতেন চলচ্চিত্র হল বাড়ীর 'ঝি'এদের চিত্তবিনোদনের জিনিষ। ইকোল নর্মালে যখন যার যার প্রিয় চলচিত্র নিয়ে আলোচা হত। তখন সাত্র´ ও তার বন্ধুরা বুঝতেন যে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থে:ক তারা অগ্রগামী দলের লোক। নির্বাক চলচ্চিত্রকে সাত্র´ এত ভালবাসতেন যে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছিবেন যে সবাক চিত্র নির্বাক চিত্রকে একসময় হটিয়ে দিতে পারে। সবাক চিত্র ভবিষ্যতে তার স্থুল টেকনিক্যাল ত্রুটিগুলো থেকে মুক্তি পাবে। উদাহরণ স্বরূপ চলা যেতে পারে চলাফেরার ও দূরত্বের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সঙ্গতি আসবে। কিন্তু সাত্র´র বিশ্বাস ছিল যে চলচ্চিত্রের পক্ষে চাক্ষুষ রূপকল্পের ভাষাই যথেষ্ট। তার ওপর অন্য কোন মাধ্যমকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিশেষ বাস্তব-বিরোধিতার আকর্ষণে তিনি চলচিত্রের দিকে ঝুঁকে ছিলেন, তার সেই কাব্যময় হাস্যরসাত্মক ও বলদৃপ্ত দিকগুলো, সেগুলোর সঙ্গে মুখের কথা ঠিক খাপ খাবে না বলেই তিনি মনে করতেন।

থিয়েটারের বেলায়, যে নিচু মানের নাটকগুলো অভিনীত হচ্ছিল তাতে আমরা উৎসাহ পেতাম না। তাই থিয়েটারেও যেতাম না। ১৯৩০-শের অক্টোবরে বারটোল্ড ব্রেষটের 'তিনপয়সার পালা' মর্তপারনাসে থিয়েটার উদ্বোধন করে। ব্রেষটের কথা কিছুই জানতাম না। কিন্তু ব্রেষট ম্যাকের

দুঃসাহসিক চরিত্রটা যেভাবে দেখিয়েছিল তাতে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

বিয়ে করার ফলে মানুষের গার্হস্থ্য দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় সামাজিক দায়িত্বও। আইন-স্বীকৃতির জোয়াল কাঁধে নেওয়ার ব্যাপারে একটা বিষয়েই গুরুত্ব আমাদের কাছে ছিল। তা হল সন্তানসন্ততি পাওয়ার ইচ্ছা। আমাদের সে ইচ্ছা ছিল না। সাত্র´ আর আমি যে বাঁধনে বাঁধা ছিলাম তাকে সুদৃঢ় করার জন্য কোন সন্তানের প্রয়োজন ছিল না। আর এটাও চাইছিলাম না যে সাত্রে´র অস্তিত্ব অন্য কারও মধ্যে প্রতিফলিত হোক। আমাদের উভয়ের পক্ষে সাত্র´ একাই যথেষ্ট। সন্তানের মা হয়েও তার মধ্যে আবার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কথা আমার স্বপ্নেও মনে আসেনি।

ছবি আমার কাছে মূলতঃ রঙ্ দিয়ে ঢাকা খানিকটা সমতল জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাত্রে´র বেলায় কিন্তু আলাদা। ছবির বিষয়বস্তু বা ছবির মূর্ত্তিগুলোর মুখের প্রকাশিত ভাব সাত্রে´র মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। আর তা এত বেশী করত যে আস্তে আস্তে জিদো রেনীর ছবির প্রতি সাত্র´ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

ক্রমশঃ কমিউনিষ্টদের ওপর সহানুভূতি নিঃসন্দেহে বেড়ে যাচ্ছিল। যদিও মে মাসের নির্বাচনে কমিউনিষ্টরা ৩০০,০০০ ভোট হারায়, তবু সাত্র´ ভোট দিতে যায় নি। আমাদের এই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউই আমাদের টেনে বার করতে পারে নি। বান-কোয়ালিসনের জয় হল, তার মানে শান্তির নীতির জয় হল। র‍্যাডিক্যাল-সোসালিষ্টরা পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ নীতি আর জার্মানীর সঙ্গে বোঝাপড়ার পক্ষে ছিল।

আমাদের কেনে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ছিল না বলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। চিরাচরিত ফরাসী মনোবিজ্ঞানে আমাদের আস্থা ছিল না, আচরণবাদেও আমরা বিশ্বাসী নই, মনোসমীক্ষণে আমাদের আস্থা সীমাবদ্ধ। কমিউনিষ্টরা মনোসমীক্ষণের নিন্দা করেন। 'কমিউন' পত্রিকায় পোলিটজার লিখলেন মনোসমীক্ষণ বাস্তব-বহির্ভূত একটা আদর্শে পৌঁছবার বিষয় মাত্র, অতএব তার সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য ট্রট্স্কাইট ও অন্যান্য ক্ষুদে দলগুলি মনোসমীক্ষণকে আদর করে জড়িয়ে ধরে। কোলেট আর তার বন্ধুরা তাদের ধ্যান, ধারণা, আচরণ ও ব্যক্তিগত কাজ কর্মের ব্যাখ্যা করত ফ্রয়েড বা এ্যাডলারের অনুকরণে।

মনোসমীক্ষকদের আমরা সমালোচনা করতাম এই বলে যে তারা মানুষকে

বোঝার চেয়ে তাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তাদের মূল নীতিগুলোর প্রায়-যান্ত্রিক প্রয়োগের ফলে মানুষের অভিজ্ঞতাগুলোকে ব্যক্তি-ভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ না করে তারা কতগুলো ভুল সিদ্ধান্তে আসে। আমাদের এই জাতীয় সমালোচনা অবশ্য মাত্র আংশিক ঠিক।

সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষাবর্ষ সুরু হওয়ার ঠিক পরেই ব্রন্‌ওতে যৌন সংস্কার বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে। এই কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছা-নিবীর্যকরণ ও সাধারণভাবে জন্মতত্ত্ব। সামাজিক নিয়মশাসনের হাত থেকে আর প্রকৃতির রাজত্ব থেকে মানুষের দেহকে মুক্ত করার এই প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থন ছিল।

সুখের কথা, ধনতন্ত্রবাদের মৃত্যু হল বলে। ১৯২৯ সালে দেখা দেওয়া সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই সংকটের চমক দেওয়া দিকগুলো সবচেয়ে বোকারও বুঝতে ভুল হবে না।

জার্মানী, ফ্রান্স আর আমেরিকাতে বলতে গেলে লাখ লাখ লোক বেকার (চার কোটি)। ওয়াকি টনে ক্ষুধার্ত জনতা মার্চ করে গেছে। অথচ টন টন কফি আর গম সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। একেবারে দক্ষিণের দিকে মাঠের ফসল তুলে মাটিতে পুতে ফেলা হচ্ছে। হলাণ্ডে দুগ্ধবতী গরুগুলো জবাই করে শুয়োরকে খাওয়ান হচ্ছে, আর ডেনমার্কে হাজার হাজার সবে বাচ্চা হয়েছে এমন শুয়োরকে মেরে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনকার কাগজে বেরোচ্ছে গাদা গাদা দেউলে হওয়ার আর অন্যান্য কেলেংকারীর কাহিনী, ব্যবসায়ী আর আন্তর্জাতিক মহাজনদের আত্মহত্যার খবর। সারা দুনিয়াটা চলেছে তীব্র চাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে। এই সময়ে সাত্রে´র এক একবার মনে হত যে বিপ্লব এগিয়ে আসছে তাতে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত হবে কি না।

মাঝে মাঝে আমরা ভাবতাম শ্রমিকশ্রেণী যে লড়াই করে চলেছে তার প্রতি সহানুভূতি দেখানই যথেষ্ট কি না। না আমরা সেই লড়াই-এ যোগ দেব ? এই সময়টাতে কয়েকবার সাত্র´ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার ধ্যানধারণা, জীবনে তার লক্ষ্য আর তার মেজাজ সবকিছুর সঙ্গেই তাতে ঠোকাঠুকি লেগেছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর সাত্র´র আর আমার অগাধ বিশ্বাস থাকলেও ওর দায়িত্বজ্ঞান অনেক বেশী। একটা সময়ে আমরা ঠিক করলাম যে প্রলেটারিয়েটের ঘরের লোক হতে গেলে কমিউনিষ্ট হতেই হবে, তবে অবশ্য আমরা যে কোন সিদ্ধান্তই নিই না কেন তা নিতান্তই সাময়িক ও

পরীক্ষামূলক। প্রলেটারিয়েটের লড়াই আমাদের চিন্তার বিষয় হলেও আমাদের লড়াই নয়। আমরা এইটুকু ঠিক করে নিলাম যে, তর্কে-বিতর্কে আমরা সবসময় প্রলেতারীয় সংগ্রামের পক্ষে কথা বলে যাব। আমাদের নিজস্ব করণীয় কাজ তা' আছে, আর সে কাজ করতে গিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলে ঠোকাঠুকি লাগবেই। এই শিক্ষকতার কাজ আর আলোচনা—এই দুটোর মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের অবদানটা রাখতে চেয়েছিলাম। এই অবদানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সমালোচনার দিকটাই প্রধান, জ্ঞান দেওয়াটা গৌণ। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তটিতে ফ্রান্সে সমালোচকের ভূমিকাটা অগ্রগণ্য বলেই আমাদের মনে হয়েছিল।

সাত্র' খবরের কাগজ পড়তেন খাপছাড়া খাপছাড়াভাবে, তবে সেটুকু বিশেষ যত্ন সহকারে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে যা ঘটছে, যেমন চীন-জাপান যুদ্ধ বা ভারতবর্ষে গান্ধীর অভিযান, তার প্রভাব আমাদের ওপর পড়ত না বললেই চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টা আমরা তখন ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমাদের লক্ষ্য তখন ছিল বাড়ীর পাশে জার্মানীতে কি ঘটছে তার ওপর। ফরাসী বামপন্থীদের আর সবার মত আমরাও চুপচাপ সেখানকার ঘটনাবলী লক্ষ্য করতাম।

মনের শান্তি ভাঙতে আমি চাইনি। তাই নিজেকে গুটিয়ে রাখতাম 'নিঃসঙ্গ মানুষে'র দোহাই দিয়ে। সাত্র' তার প্রতিবাদ করে বলতেন 'নিঃসঙ্গ মানুষ'ও দৈনন্দিন ঘটনাস্রোতে উৎসাহী না হয়ে পারেন না। 'নিঃসঙ্গ মানুষে'র চিন্তাধারার সঙ্গে অপরের না মিলতে পারে, তাই বলে অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। সাত্র'র এই প্রতিবাদ আমাকে বেশ নাড়া দিত, তবু নিজের মত নিয়েই থাকতাম। দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ফল ঘটনাগুলো মানুষ ঘৃণা করে চলুক, তাই-ই আমি চাইতাম। ঠিক যেমনটি চাইতেন রিমবোঁ, লত্রেমঁ বা ভ্যান গগ্।

'মানুষ' নামে জীবকে সাত্র' ভালও বাসতেন না, ঘৃণাও করতেন না। অথচ কি মাদ্রিদে, কি ভ্যালেন্সিয়াতে, কি প্যারীর রাস্তায়, কি কোন মেলায়, অথবা লণ্ডন ডকে নোংরা দোকান, শ্রমিকদের বাড়ী বা নোংরা রাস্তাগুলোতে মানুষের সংস্পর্শে এসে আমাদের কি ভালই না লাগত! এই ভাল লাগার কারণ মনে হয় এই যে, আমরা কোন সময়েই মানুষের অবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলাম না। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা প্রায়ই বিস্তারিত আলোচনা করতাম, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম না। সত্যি কথা বলতে কি সাত্র' কোন

কোন সামাজিক শ্রেণীকে বিশেষভাবে ঘৃণা করতেন, সমগ্রভাবে মানবজাতিকে নয়। মানুষকে নিয়ে যারা আদিখ্যেতা দেখান তাদের প্রতিই সার্ত্র ছিলেন কঠোর। কয়েক বছর আগে এক ভদ্রমহিলা (এঁর ডজনখানেক পোষা বেড়াল ছিল) জাঁ জেনেকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি সত্যি সত্যিই পশুপাখীদের পছন্দ করেন না?" জেনের উত্তর : পশুপাখী যারা পছন্দ করেন আমি তাদের পছন্দ করি না। মানুষের প্রতি সার্ত্রর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঠিক এই রকমই।

সার্ত্র আর আমি দুজনেই 'নতুন লেখা' চালিয়ে যেতে লাগলাম। সেই বছরটা দুটো নামের জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রথম নামটা উইলিয়ম ফক্‌নারের। তার দুখানা বই, 'এ্যাজ্ আই লে ডাইং' ও 'স্যাংচুয়ারী' একই সময়ে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তথাকথিত বাস্তব উপন্যাসের ভুয়ো তাস্থিকতাকে বর্জন করে খানিকটা আত্মনিষ্ঠ পথে দুনিয়াটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা তার আগে জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ আর হেমিংওয়ে করেছিলেন। কিন্তু ফকনারের কৌশলের অভিনবত্ব আর কার্যকারিতা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। অনেকগুলো দৃষ্টিকোণকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সুচালিত করে প্রকাশ করার দক্ষতাই শুধু ফকনার দেখাননি, তিনি প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে ঢুকে তাদের জ্ঞান, তাদের অজ্ঞতা, তাদের অসততার মুহূর্তগুলো, তাদের অদ্ভুত স্বপ্ন, তাদের বাক্‌চাতুর্য ও তাদের মৌনতা—সব কিছুকে টেনে বার করে এনেছেন। ফকনারের গল্পগুলোতে যে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং যে শৈল্পিক দক্ষতায় সেগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, দুই-ই আমাদের প্রচণ্ড ভাল লাগত।

দ্বিতীয় নামটা ফ্রানৎজ কাফ্‌কার। আমাদের কাছে কাফ্‌কার গুরুত্ব আরও গভীর। কাফ্‌কার 'মেটামরফসিস' গল্পটা ফরাসী অনুবাদে পড়েছিলাম। কোনও এক প্রবন্ধকার জয়েস আর প্রুস্তের সঙ্গে কাফ্‌কাকে একই আসনে বসিয়েছেন। জিনিসটা একটুও হাসির ব্যাপার নয়। কাফ্‌কার 'ট্রায়াল' বেরোল, পড়লামও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে, 'ট্রায়ালকে' রূপক বলে ছেড়ে দেওয়া বা তার মধ্যে কোন প্রতীকী ব্যাখ্যা খোঁজা নিরর্থক। এর মধ্যে যা পাওয়া যায় তা হল সারা বিশ্বের একটা সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা। লক্ষ্য ও পথের মধ্যে সম্পর্কটাকে গুলিয়ে ফেলে কাফ্‌কা মানুষের কাজকর্ম কীর্তি সব কিছুকেই শুধু সন্দেহ করেননি, সারা বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককেও সন্দেহের চোখে দেখেছেন। মানুষের সমাজকে উল্টে তিনি এমনভাবে সামনে এনে

ধরলেন যা শুধু অদ্ভুতই নয়, অসহনীয়ও। সার্ত্র ১৯৪৩ সালে ব্লানশোর কথা বলতে গিয়ে এই ধারারই আর একটু উন্নত রূপ উপস্থিত করেন। ফকনার আর অন্যান্যরা আমাদের যে গল্পগুলো দিয়েছেন তা আমাদের অভিজ্ঞতার জগত থেকে অনেক দূরে, কিন্তু কাফ্‌কার মধ্যে আমরা পেয়েছি 'আমাদেরই'। ঈশ্বরহীন যে দুনিয়ায় আমাদের মুক্তি এখনও বিপন্ন সেই দুনিয়ায় যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই সমস্যাগুলোকেই কাফ্‌কা খোলাখুলি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। কোন বাবা আমাদের 'নিয়মে'র ধারণাটা দিয়ে দেননি, তবু নিয়ম' এর ব্যাপারটা আমাদের বুকে দুর্মোচনীয়ভাবে আঁকা ছিল। বিশ্বজনীন যুক্তির আলোতে সেই 'নিয়মে'র খোঁজ পাওয়া যাবে না। সে নিয়ম একান্ত গোপন, অদ্বিতীয়, যা আমরাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে এ কথা ঠিক যে, এ নিয়মের কথা একবার ভোলা মানে তা চিরকালের জন্যে হারানো।

ভেতরে কেউ যেন লিখে যেতে বলত। আমরা লিখে যেতাম, পাতার পর পাতা, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? কারা এই লেখা পড়বে, আর কিই-ই বা পড়বে? ভাগ্যের হঠাৎ ধাক্কায় যে সঙ্কটময় পথে আমরা পা বাড়ালাম তা নিয়ে গেল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে। মাঝে মাঝে হঠাৎ একটুকরো আলোর ঝলক এসে লক্ষ্যটাকে উদ্ভাসিত করে তুলত। এই উপন্যাস বা প্রবন্ধটা শেষ করতে হবে। দূর দিগন্তে তা পরিপূর্ণতায় ঝলমল করত। কিন্তু খুঁজে পেতাম না সেই কথাগুলো, যা দিয়ে পাতার পর পাতায় পা ফেলে আমরা সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাব। শঙ্কা ছিল হয়ত অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছাব, নয়ত কোথাওই পৌঁছাতে পারব না। ইতিমধ্যেই অন্তরে এক মহাসত্যের আবির্ভাব হতে শুরু করেছে, যার কথা পরবর্তীকালে প্রায়ই মনে পড়ত। এই অন্ধের মত পথ চলাটা হয়ত ঠিক হচ্ছে না, আর পথটাও অন্তহীন। হঠাৎ হয়ত দেখব মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়িয়েছে, জোসেফ কাফ্‌কার মুখোমুখি হয়ে সে যেমন একদিন দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বের রায়টা হয়ত তখনও পাওয়া যাবে না। সবকিছু একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে থাকবে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর আর ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থাটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠল, অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে। অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। স্তামসন কারখানা শ্রমিক ছাঁটাই করল, সিত্রোয়েঁ দেউলে হয়ে গেল, বেকারের সংখ্যা এসে দাঁড়াল বিশ লক্ষে।

জেনোফোবিয়ার ঢেউ বয়ে গেল ফ্রান্সে। ফরাসীরাই যখন বেকার তখন পোলিশ বা ইটালিয়ান শ্রমিক নিয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

গণতন্ত্রবিরোধী প্রচার ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। ক্রয় দ্য ফো আন্দোলনের তীব্রতা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। সাপ্তাহিক 'কাঁদিদ' হয়ে দাঁড়াল এই আন্দোলনের মুখপত্র। কর্নেল দ্য লা রোক ফলাও প্রচারের মধ্য দিয়ে তার কর্মসূচীকে অভিষিক্ত করলেন বিপ্লবের কর্মসূচী। ইতিমধ্যে 'গ্রিঁগয়ের' পত্রিকার মারফৎ কারবুচিয়া আর এক ধরণের ফ্যাসীবাদ প্রচার করে চলেছেন। ১৯৩৪ সালের শেষে গ্রিঁগয়েরের প্রায় সাড়ে ছ লাখ কপি বিক্রি হত। আমার বাবার প্রিয় পত্রিকা। এই সব দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কামনা ছিল ফ্রান্সে এক ফরাসী হিটলারের আবির্ভাব হোক। মুসোলিনি ইথিওপিয়া আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। লাভাল তার সঙ্গে চুক্তি করে তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিলেন। লাভাল হিটলারের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা চালালেন। বেশ কিছু ফরাসী বুদ্ধিজীবি তার পিছনে এসে দাঁড়াল। বামপন্থীদেরও যথেষ্ট সমস্যা ছিল। প্রতিক্রিয়ার দিকে দেশ যাতে ঝুঁকে না পড়ে তার জন্যে ১৯৩৭ সালের জুন মাসে এ্যালেঁ, লাজভাঁ, রিভে আর পিয়ের জেরোম মিলে ফ্যাসী বিরোধী কমিটি গড়ে তোলেন। সব ফ্যাসীবিরোধীই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে "শান্তিবাদ''-এর দিন চলে গেছে।

এদিকে ক্যাটালোনিয়া আর এ্যাস্টুরিয়াতে শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করল আর দক্ষিণপন্থী সরকার বর্বর হাতে সেই বিদ্রোহকে দমন করে।

১৯৩৫শের মার্চে হিটলার বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আইন করলেন। ফ্রান্সে কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী সবাই ভয়ে শিউরে উঠল। ইউ. এস. এস আ'রের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হল তাতে আমরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। স্টালিন সরকারীভাবে আমাদের আত্মরক্ষা নীতি সমর্থন করলেন। তার সঙ্গে সঙ্গেই সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট শ্রমিকদের সঙ্গে পাতিবুর্জোয়াদের যে ব্যবধানটা ছিল তা ভেঙে পড়ল। প্রায় সব রাজনৈতিক মতের পত্রিকা মস্কো ও আর তার সর্বশক্তিমান লালফৌজ সম্পর্কে গাদা গাদা সহানুভূতিসূচক প্রবন্ধ বার করতে সুরু করল। স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে এর ফলে কমিউনিষ্টদের একটু সুবিধা হয়, আর তাদের সঙ্গে বাকী ছুটো বামপন্থী দলের একটা

সমর্থোতাও হয়ে যায়। জুনের শেষে এক সাধারণ বামপন্থী কোয়ালিশন মারফৎ পপুলার ফ্রন্টের সূত্রপাত হয়।

ফ্রান্সে বামপন্থীরা ঠিক করল বিশাল এক শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই বিজয় উৎসব পালন করবে। ১৪ই জুলাই এর উৎসবে এত বড় শোভাযাত্রা এর আগে আর কখনও হয়নি। দায়িত্ব পড়ল এক কমিটির ওপর আর তারা উঠে পড়ে লেগে গেল সব কিছুর আয়োজন করতে। সাত্র আর আমি দুজনে গেলাম ব্যাস্তিলে। পাঁচ লক্ষ মানুষের এক মিছিল সেখানে গান ও চীৎকার করতে করতে আর তিন রঙা পতাকা ওড়াতে ওড়াতে সামনে দিয়ে পা ফেলে মার্চ করে গেল। ওদের সব চেয়ে প্রিয় ধ্বনি হল 'লা রোক মুর্দাবাদ', 'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ'। একটা ধাপ পর্যন্ত আমরাও এই আনন্দের অংশীদার হলুম, কিন্তু ওদের সঙ্গে চীৎকার আর গান করতে বা শোভাযাত্রায় যোগ দিইনি। এর থেকেই আমাদের তৎকালের দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝা যাবে। বিভিন্ন ঘটনায় আমরা যথেষ্ট ভাবাভিভূত হয়ে পড়তুম, কোন সময় রাগ, কোন সময় ভয়, কোন সময় আনন্দ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমরা আত্মবিস্মৃত হতাম না। দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি আর কি।

আমার মানসিক শান্তি আবার একটু একটু করে ফিরে আসতে সুরু করল। সাত্র'ও মনে হল আবার শান্ত স্থির হয়ে আসছেন। রোমে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব ঠিক করলাম। এই বছরটার গোটাটা ধরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে চোখ খুলে রাখতে ভুলিনি। পপুলার ফ্রন্ট যখন বিজয়ী হল আমরা তাকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলাম। পপুলার ফ্রন্টের এই জয় সাত্র' আর আমার দুজনার মনেই রেখাপাত করেছিল। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদের প্রগতিশীল বৃত্তিগুলোকে টেনে রেখেছিল। ফলে ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই আমাদের যে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেই চোখে আমরা তখনও দেখছিলাম। ওরা যে কোথায় রাত কাটিয়েছিলাম মনে পড়ছে না। নিঃসন্দেহে রুঁমের কাছাকাছি কোন সাধারণ পার্কে। ওখানে লাউডস্পীকারে নির্বাচনের ফলাফল ও বিস্তারিত বিবরণগুলো একে একে ঘোষণা করা হচ্ছিল, আর আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠছিল। অথচ সাত্র' নিজের ভোটটা দেননি। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার কথা চিন্তা করে তিনি নিজের কাঁধ দুটোকে একটু ঝাঁকিয়েছিলেন

মাত্র। তবুও এর পর যখন ধর্মঘটগুলো আরম্ভ হয়েছিল আর শ্রমিকরা রাস্তায় রাস্তায় সাহায্য সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল, আমরা যতদূর সম্ভব ওদের সাহায্য করেছিলাম।

পপুলার ফ্রন্টের অগ্রগতিতে এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে তার অবনতিতে সেই পরিমাণেই মর্মাহত হলাম। ব্লুমের আর্থিক সংকট তখন ভয়ংকর রকমে দেখা দিয়েছে। তাই ব্লুমের মত হল বেশ কিছুদিন সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। ফ্রান্সের মত ইংল্যাণ্ডও চুপচাপ বসে স্পেনে জার্মান ও ইটালিয়ানদের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করার পক্ষপাতী। একমাত্র দেশ যার ফ্যাসীবাদের অগ্রগতি রোধ করার ইচ্ছে ও ক্ষমতা দুইই ছিল তা হল সোভিয়েট রাশিয়া। স্পেন তখন আর 'মুক্তির' দেশ নয়। স্পেন তখন এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র আর সেখানে যুদ্ধের অবস্থাও দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

স্পেনের বিপ্লবী বাহিনীতে তখন নানান জিনিসের অভাব। অভাব শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের, অভাব নিয়মানুবর্তীতার, অভাব সংগঠনের। সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে অভাবও বড় কম ছিল না। কমিউনিষ্ট সিণ্ডিক্যালিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল, এ্যানার্কিষ্ট—সবাই কিন্তু এক স্বার্থে গ্রথিত নয়। বিপ্লব সার্থক করার আগে যে যুদ্ধটা জিততে হবে তা এ্যানার্কিষ্টরা ও স্বীকারই করতে চাননি। ক্যাটালোনিয়া সহ কোন কোন অঞ্চলে তো এ্যানার্কিষ্টরা সোভিয়েত তৈরী করতেই লেগে গিয়েছিল। অথচ ঐ সময়টা কারখানাগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তায় নিয়োগ করলে কাজ হত।

নেগ্রি তার মন্ত্রীসভা তৈরী করে গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন এ্যানার্কিষ্ট আর ট্রটস্কাইটদের সেই সব কাজগুলো যা ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পি, ও, ইউ, এম সংস্থাকে কমিউনিষ্টরা নাম দিল 'এক দল বিশ্বাসঘাতকের বাসা'। ওই সংগঠনের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। অপরদিকে এ্যানার্কিষ্টরা আর সোস্যালিষ্টদের একটা ছোট গোষ্ঠী বলে বসল 'নেগ্রী আর স্টালিনপন্থীরা শুধু প্রলেতারীয় আন্দোলনকেই নয়, গোটা সাধারণতন্ত্রটাকেই হত্যা করছে। এই খাওযাখাওয়ির ফল পরে খুবই অশুভ হয়েছিল। নাৎসী জোয়ডুয়গুলো মাদ্রিদ আর বার্সিলোনরা তাদের আক্রমণ ক্রমাগত জোরাল করে চলছিল। উত্তর দিকে ফ্রাঙ্কো তার আক্রমণ দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ করল।

ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট সরকার আরও কয়েকমাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল।

পৌঁছতে সরকারের পিছন থেকে কমিউনিষ্টরা তাদের সমর্থন সরিয়ে নিতেই তা ভেঙে পড়ল। বামপন্থীরা যখন এই ভাঙনের মুখে ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাস তখন বেড়েই চলেছে। অক্ষশক্তিরা (জার্মানী, জাপান ও ইটালি) ওদিকে খুঁচোচো এক নতুন যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। 'মার্কো পোলো সেতু'র ঘটনার পর জাপানীরা পিকিং দখল করে নেয়। গোটা চীনকে ছুঁইয়ে ফেলার এক দৃঢ় ঝোঁক তাদের দেখা যায়। চীনের কমিউনিষ্ট ও জাতীয়তাবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হল বটে, কিন্তু মূল্য দিতে হল অসাধারণ। পিকিংকে বোমা আর কামানের গোলায় ধুলা করে দেওয়া হল। সাংহাই এর উত্তর শহরতলী চাপেইকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল জাপানীরা। কাগজে বেরোল জাপানী বোমার ঘায়ে মৃতদেহের স্তূপের ভয়াবহ ছবি—খালি শিশু ও নারী। আমাদের ঘরের দরজা গোড়াতেই হিটলার আর মুসোলিনি তখন স্পেনকে গুঁড়োচ্ছে।

বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী বারবার এই কথা আউড়ে যাচ্ছিলেন 'পৃথিবীর তাবৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলোই বিশ্বে শান্তি ঘোষণা করেছে।' আরও একটা ধ্বনি চালু হচ্ছিল "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেই শান্তি কাজ করে যাচ্ছে।" মিউনিক চুক্তির বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা তাদের মত জাহির করলেও অনির্দিষ্টকাল ধরে তাদের সেই মত নিয়ে জাবর কাটলেই চলে না। এগিয়ে যেতে হবে, আর ব্যক্তিগতভাবে যাইই বিশ্বাস থাক না কেন দলগতভাবে অন্তহীন আশা নিয়ে বেশ উৎসাহভাবেই এগোতে হবে। তাই ওরা ফরাসী সরকারকে বলল "আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্ক পাল্টে দিন, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিতে আসুন, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করুন, আর হিটলারের হুমকিবাজির জবাব দিন ক্রমবর্ধমান দৃঢ়তার মধ্যে দিয়ে।"

বছরের গোড়া থেকেই সার্ত্র হাইডেগারকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, মূল জার্মান ও করবাইনের ফরাসী অনুবাদের মধ্য দিয়ে। সিষ্টেরোঁতেই প্রথম সার্ত্র আমার সঙ্গে হাইডেগারকে নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। এখনও চোখে ভেসে আসছে সেই পাথরের বেঞ্চিটা যেটার ওপর বসে সার্ত্র মানুষকে কেন 'দূরত্বের শিকার' বলা হয় এবং বেখাপ্পাভাবে জোড়া দেওয়া কাচের মধ্যে দিয়ে দুনিয়াটাকে কেমন দেখায় তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তা বুঝেছিলাম, কিন্তু হাইডেগার ভবিষ্যৎ এর ওপর কতখানি সত্যিকারের আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা ভালভাবে বুঝতে পারিনি। বাস্তব পৃথিবীর বাস্তবতাকে বজায় রাখাই ছিল সার্ত্রর চিরকালের চিন্তা। সার্ত্র বুঝেছিলেন হাইডেগারের

দর্শনের প্রাণবস্তু হল বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে আত্মনিষ্ঠতার সমন্বয় সাধন। তবে সার্ত্র'র মতে হাইডেগার তা সুবিন্যস্ত যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরতে পারেননি, শুধু তার বাঙ্গময় ভাবধারাগুলোকে তার দর্শনে ঠেসে পুরে দিয়েছেন।

কোলেট অড্রি আব সার্ত্র'র মধ্যে একবার এক আলোচনা হয়েছিল মনে পড়ে। স্পেনের ঘটনা অড্রিকে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছিল যে রাজনৈতিক দিক থেকে তার বিশ্বাস বলে আর কিছুই ছিল না। কোলেটের কথা—যুদ্ধ ছাড়া আর যা ঘটে ঘটুক। সার্ত্র'র কথা—না, 'আর যা' নয়, ফ্যাসীবাদ ত নিশ্চয়ই নয়।

আমাদের তরুণ বয়সে কমিউনিষ্ট পার্টিকে খুব কাছাকাছি মনে হত, অবশ্য আমাদের নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে পার্টির নেতিবাদ যেখানে যেখানে মিলে যেত। আমরা চাইছিলুম ধনতন্ত্রবাদ হারুক, তবে যে সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে সেই সমাজতন্ত্রকে চাইছিলাম না। তাই ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরের তারিখে সার্ত্র তার নোটবুকে লিখেছিলেন: 'সমাজতন্ত্রের মোহ এখন আমার কেটে গেছে, যদিও কেটে যাওয়ার প্রয়োজন কোনদিন ছিল বলে মনে হয় না।' তা সত্ত্বেও '৪১ সালে প্রতিরোধ-বাহিনী গড়ে তোলার সময় যে কথা দুটি সার্ত্র বীজমন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তা হল: সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা। যুদ্ধ লেগে যাওয়া কালে সার্ত্রে'র মধ্যে এক সুনিশ্চিত রূপান্তর দেখা যায়।

যে ছোটখাট আত্মবঞ্চনাগুলো আমরা নিজেদের ওপর চালাই সেগুলোকে সার্ত্র ঘৃণা করতেন। কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু মৌখিক প্রতিবাদ করে সার্ত্র নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে বেশীদিন চেপে রেখে সার্ত্র সন্তুষ্ট থাকতেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে, যখন আমরা কোন নিরঙ্কুশ অবস্থার মধ্যে বাস করছি না, বাস করছি দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে। তখন এই শুধু 'থাকাটা' ছাড়তে হবে, গ্রহণ করতে হবে 'করার' প্রতিজ্ঞা। সার্ত্র'র পক্ষে এই রূপান্তর মোটেই কঠিন ছিল না, তার পূর্ব কৃতির জন্যে। চিন্তাশীল হিসাবে, লেখক হিসাবে তার মূল লক্ষ্য ছিল কোন কিছুর নিহিতার্থকে উপলব্ধি করা। কিন্তু ১৯৪০ সালে হাইডেগার ও সাঁৎএক্সুপেরি পড়ার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল মানুষের কাজের মধ্যে দিয়েই অর্থের উদ্ভব হয়। তাই তিনি চিন্তার ওপরে কর্মকে স্থান দিয়েছেন।

"সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা" বইটি ব্যর্থ হবার পর সার্ত্র বোধ হয় বাস্তব সম্পর্কে

এক নতুন ধারণা পেয়েছিলেন। তার প্রথম গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনা এর পরে আসে, কমিউনিষ্টদের সহযোগিতায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বে কোনও খাদ ছিল না। রাশিয়ার সাধারণ মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তাতে বোঝা গিয়েছিল যে, রুশ নেতারা ওই দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সত্যিকারের প্রতীক ছিলেন। তাই কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সর্বস্তরে সহযোগিতা করতে কোন বাধা ছিল না। সাত্র' অবশ্য পার্টির সভ্য হওয়ার কথা চিন্তা করেননি। একটা কারণ, তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। কিন্তু সবার ওপরে ছিল তার সঙ্গে মার্কসবাদীদের বিরাট আদর্শগত মতপার্থক্য। কমিউনিষ্টরা মার্কসবাদের যে রূপটাকে গ্রহণ করেছিল সাত্র' ছিলেন সেই রূপের প্রচণ্ড বিরোধী। সাত্র' মানুষের মানবিক দিকগুলোকে সযত্নে সংরক্ষণ করায় ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তাঁর আশা ছিল কমিউনিষ্টরা মানবিক মূল্যবোধগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবেন, এবং তাদের দেওয়া অস্ত্রের সাহায্যে সাত্র' বুর্জোয়াদের কবল থেকে মানবতাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। আমরা দুজনেই মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আসার জন্যে কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবী আর পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে দূরত্বটা আছে তার মধ্যে দিয়ে একটা পথ করে নেওয়ার চেষ্টা করতাম।

সাত্র' তাঁর উদ্দেশ্যের কথা নিজেই বলেছেন।

"আমার মনে হত—সত্য যদি একটাই হয়, তবে ভগবান সম্বন্ধে জিদ যা বলেছেন, আমারও সেই কথা। তাকে খুঁজতে হবে কোন বিশেষ জায়গায় নয় সর্বত্র। সবচেয়ে গোপন থেকে সবচেয়ে প্রকাশ্য যেসব সামাজিক ভাবধারা ও ভঙ্গিগুলো আছে সে সবই সেই সত্যের প্রতিমূর্তি। কোন রাজনৈতিক সংবিধানের মধ্যে যেমন পাওয়া যায় একটা গোটা যুগের প্রতিচ্ছবি, একটা কিংবদন্তীর মধ্যেও তাই-ই পাওয়া যায়। আমরা হলাম অর্থানুসন্ধানী, এই বিশ্ব সম্পর্কে যা সত্যি তাই বলব।"

যে পত্রিকা বার করব তার নাম দেওয়া হল 'আধুনিক কাল' (লো টাঁ মদার্ন)। নামটা কেমন ম্যাড়মেড়ে, কিন্তু চ্যাপলিনের সঙ্গে এই নামের যোগ আছে বলে ভাল লাগল। পত্রিকাটা বেরোতে শুরু করার পর অর্গাস সংস্থা প্রায়ই চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র থেকে কাটা ছবি পাঠিয়ে দিতেন। পিকাসো একটা প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছিলেন, তবে তা আমাদের পত্রিকার পক্ষে অনেক উচ্চমানের।

একদিন সন্ধ্যায় লিস এসে বউল, "তুমি আর সাত্র' হেমিংওয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাও ?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই"। এরকম প্রস্তাব যখন আসত তখন খুবই ভাল লাগত।

হেমিংওয়ে ছিলেন যুদ্ধ-সাংবাদিক। সেই সন্ধ্যাতেই প্যারিস এসে পৌঁছেছেন। উঠেছেন রিৎসাত্র। ভাইকে সেখানে ওঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছেন। ভাই-ই লিজ্‌কে বলেছে যে, ওর সঙ্গে সে, সাত্র' আর আমিও যাই। রিৎসের যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম সেরকম ঘরে যে রিৎসে থাকতে পারে তার কোন পূর্ব-ধারণা আমার ছিল না। ঘরটা বড, কিন্তু কুৎসিত। ঘরে দুটো পেতলের খাট। পায়জামা পরে হেমিংওয়ে তার একটায় শুয়েছিলেন। নীল চোখ-ঢাকায় চোখ দুটো ঢাকা। হাতের কাছেই একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা স্কচ্, কতকগুলো অর্ধেক খালি বোতল, কতকগুলো পুরো। উঠে বসলেন। সাত্র'কে বুকে চেপে ধরলেন। চেপে ধরে বললেন, 'আপনি ত সেনাপতি। আমি একজন ক্যাপ্টেন মাত্র। আপনি সেনাপতি।" এইরকম দিলখোলা অবস্থায় আমরা কথা বলতে লাগলাম, মাঝে মাঝে স্কচ্ চল্‌ল। হেমিংওয়ে ফ্লুতে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও কি প্রচুর প্রাণশক্তি। রাত্রি তিনটে নাগাদ সাত্র' টলতে টলতে উঠে গেলেন, চোখ খুলে রাখতে পারছিলেন না। আমি সকাল পর্যন্ত রইলাম।

রুয়ে ভেনোতে জিদের ঘরে ক্যামু ছিলেন। তার সঙ্গেই প্রাক্-নববর্ষ সন্ধ্যাটা কাটালাম। ঘরে ছিল একটা ট্রাপিজ আর একটা পিয়ানো। আলজিরিয়ার মুক্তির পরেই ক্যামু আলজিরিয়া থেকে ফিরেছেন। লালচে, তাজা, স্লেট রং-এর প্যান্টে ক্যামুকে খুব সুপুরুষ দেখাচ্ছিল।

বুর্জোয়ারা সাত্রে'র মধ্যে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সাত্র' যে তাদের স্তরে অনেক উপরে উঠেছিলেন তাতে তাদের সায় ছিল না। সাত্র তাদের ভাষাতেই কথা বলতেন, আর সেই ভাষায় এমন সব জিনিস বলতেন যা তারা শুনতে চাইত না। তারা তার কাছে আসত, যেত, আবার আসত তার কারণ তাদের মনে যে প্রশ্ন ছিল সে প্রশ্ন সাত্র'রও। কিন্তু সাত্র' যে জবাব দিতেন সে জবাবের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে তারা ছুটে পালাতেন।

মানুষের মনে বিশ্বাস নিয়ে আসা আবার তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া—এই দু'কাজই সাত্র' পারতেন। সেই সময়ের সেই অশান্ত দিনগুলোতে পরম নিশ্চিন্ত ও আরামের জায়গাগুলোতেও পৃথিবীর নানারকমের গুজবগুলো এসে ধাক্কা দিত।

মানুষ চাইত যা তা হল সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাঝে যে ফাঁক আছে তা কেউ পূরণ করে দিক। সেদিনের সেই পরিবর্তিত দুনিয়াকে জানার জন্যে তারা উন্মুখ হয়ে থাকত। এই জানার জ্বালা তাদের মিটবে যদি এই জীবন্ত জলন্ত বাস্তবকে কেউ শিল্পের পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায়, আর তা কেউ কোনদিন যায়নি। অনন্তকেও তারা ছাড়তে চায়নি। সাহিত্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমতল-ভূমি থেকে তুলে নিয়ে যাক এমন এক উচ্চতায় যেখানে শিল্পই একমাত্র সম্রাট। সার্ত্র সাহিত্যকে সম্মান দিতেন। সে সম্মান এতই গভীর যে, সার্ত্রের কাছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য আর জীবনের উদ্দেশ্য এক হয়ে যেত। বাইরের লোকের কাছে মনে হত সার্ত্র বুঝি সাহিত্যকে স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়ে মাটির পৃথিবীতে এনে ফেলছেন।

যে নিয়ম সার্ত্র মেনে চলতেন সে নিয়ম মানতে গিয়ে তিনি নিজেকে আক্রমণের এক সহজ লক্ষ্য করে তুলেছিলেন। এই নিয়মটা হল: কোন অবস্থায় চরম প্রতিক্রিয় হয়েও চরম নিষ্ক্রিয় থাকা। এই অভ্যাসের তার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। হোটেল কাফেতেই দিন কাটাতেন, পোষাক-পরিচ্ছদের কথা চিন্তাই করতেন না, সমাজ বলতে যা বোঝায় তা এড়িয়ে চলতেন। বিয়ে থা করেননি। আমরা দুজনে আমাদের স্বাধীন জীবন এমনভাবে কাটাতাম যে, আমাদের মাঝের সম্পর্কটা যে "মুক্ত প্রেমের" এক আদর্শ নজীর তা লোকে বুঝতেই পারত না। তার এইসব খামখেয়ালীপনা সবাই হয়ত মেনে নিত যদি সার্ত্র "সাহিত্যিক" এই নামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। কিন্তু তা কোনদিনও করেননি। যখন তার রূপান্তর ঘটছে, তখন তিনি তাতে বিস্মিত, হচ্ছেন। কিন্তু তবু সেই নতুন অবস্থাকে যে তিনি হিসেবের মধ্যে আনবেন, তাও করেননি। এই সরলতার জন্যেই অনেকে সার্ত্রকে ভালবাসত।

মো টাঁ মডার্নে 'মটিরিয়ালিজম ও বিপ্লব' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তা কেতাবী মার্কসবাদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ববাদের তিনি সমালোচনা করেন সেই প্রবন্ধে। যে যুক্তিগুলো তখন ব্যবহার করেছিলেন তা হয়ত আজ আর ব্যবহার করবেন না, তবে তা আজকের মতই একই মূল নীতির ওপর ভিত্তি করা। এই প্রবন্ধে তিনি বস্তুবাদকে বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সবরকমের সবলতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও বস্তুবাদ শুধু বিপ্লবী স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

সার্ত্রের দর্শন অবশ্য সোজাসুজি মার্কসবাদের বিরোধিতা করেনি, বিনিময় করা যায় কিনা তার রাস্তা খুঁজেছেন সার্ত্র। কমিউনিষ্টরা তা নাকচ করে

দিয়েছে। বুর্জোয়া ভাবসম্পন্ন সাধারণ মানুষ অবশ্য অস্তিত্ববাদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, তাতে তার আসল অর্থটাই বিকৃত হয়ে গেছে। ক্যামুর নৈতিকতাবাদের মত অস্তিত্ববাদকেও ওরা বাড়তি বা বিপদের সময় ব্যবহার করার মত একটা মতবাদ বলেই মনে করত। কমিউনিষ্টরাও অস্তিত্ববাদকে তাই-ই মনে করত। এই গোষ্ঠীসংকীর্ণতা কি তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল ? সত্যি কথা বলতে কি সাত্র'র সঙ্গে বুদ্ধিগত-ভাবে কমিউনিষ্টরা কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তারা দক্ষিণপন্থীদের দেওয়া গালাগালিগুলোই আউড়ে যেতে লাগলেন : নোংরা নর্দমার কবি, হতাশা আর সাম্যতার দার্শনিক। সাত্র'র যেখানে লেগেছিল তা হল এই কুৎসায় সাত্র' জনমানসের কাছে শত্রু হিসাবে গণ্য হয়েছেন। পরবর্তী এক চিঠিতে সাত্র' লেখেন যশ আমার কাছে ঘৃণার বস্তু।'

সাত্র'র নাটক 'শ্রদ্ধাবতী বারবণিতা'র সমালোচনা কমিউনিষ্টরা এইভাবে করেছিল যে, সাত্র' তার নাটকে নিগ্রো ভদ্রলোকটিকে সত্যিকারের একজন যোদ্ধা হিসাবে তুলে না ধরে দেখিয়েছেন সে ভয়ে কাঁপছে, আর নিজের সম্মান বাঁচাতেই ব্যস্ত। সাত্র' বল্লেন, "এই কারণেই তা দেখিয়েছি যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণসমস্যার সমাধান এই সময়ে একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু কমিউনিষ্টদের ধারণায় সাহিত্য কি হওয়া উচিত তা সুদৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট, আর সাত্র' সেই নির্দেশ মেনে চলেন না বলেই তাদের অভিযোগ।"

কমিউনিষ্টদের মতটা সাত্র' বুঝতেন। জনসাধারণের ক্ষেত্রে আশা একটা খুব বড় জিনিস। আশা সক্রিয়তার এক উপাদান। সংগ্রাম এতই কঠোর যে, ভবিষ্যৎ জয়ের আশা যদি না থাকে তবে সংগ্রামের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে মানুষ চায় না। তাই 'শ্রদ্ধাবতী বারবণিতা' যখন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হল তখন সাত্র' নিজের ইচ্ছায় তার শেষটা এইভাবে বদলে দিলেন— লিজি সেই অসহায় নিগ্রো ভদ্রলোককে বাঁচাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপন্যাসের 'নায়ক' উপন্যাসের এক জটিল সমস্যাবিজড়িত অঙ্গ। নিরঙ্কুশ চরম মূল্যগুলির খোঁজ সে করে, কিন্তু খোঁজ করার কায়দাটা বিশ্বাসযোগ্যও নয়, ত্রুটিমুক্তও নয়। উপন্যাসের জগতে 'অস্তিবাচক' নায়ক থাকতে পারে না। থাকতে পারে না এই কারণে যে মূল্যগুলোর সন্ধান আমরা পাই তা 'অন্তর্নিহিত'। তাই সেই মূল্যগুলোর প্রেক্ষিতে যেসব চরিত্রকে দেখি তারা একই সঙ্গে অস্তিবাচক ও নেতিবাচক। কিন্তু উপন্যাস যদি সুবিধাভোগী শ্রেণীর বদলে অত্যাচারিত শ্রেণীর উদ্দেশ্যে রচিত হয় তাহলে সমস্যা উপস্থাপনের সঙ্গে

সঙ্গে সমস্যা সমাধানের পথেরও আভাস দিতে হবে। ১৯৫৫ সালে আমি আর সাত্র´ এক অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলুম। তিরিশ দশকের শেষের দিকে চৈনিক লেখক লুস্থন-এর সমস্যাটা ছিল একেবারে সাত্র´র মত। সমাজকে তিনি সমালোচকের চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এই সমাজে সেই সময়ে বিপ্লব অসম্ভব। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—ভবিষ্যৎটা কি? অনেক ধস্তাধস্তির পর তিনি 'কর্মপ্রেরণার' একটা অংশ জুড়ে দিলেন বটে, কিন্তু বল্লেন তার বই-এর নান্দনিক মূল্য আর কিছুই রইল না। সোভিয়েট রাশিয়াতে বারটোল্ট ব্রেখ্‌ট সম্পর্কেও একই সন্দেহ করা হয়েছিল। ব্রেখ্‌টের প্রধান অস্ত্র ছিল ব্যঙ্গ, সস্তা আবেগ নয়।

টাকা পয়সার ব্যাপারে সাত্র´ কোনদিনই সিরিয়াস ছিলেন না। গোপা-টোনার ব্যাপারটাকে তিনি ঘেন্না করতেন। নিজেকে এক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা তার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। তাড়াতাড়া ভেবে চিন্তে অপরকে দান করতে গেলে সে দানের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ছোপ লেগে যায়। সাত্র´ যা উপার্জন করতেন তার অনেকটাই দিয়ে দিতেন। তবে তা দিতেন বন্ধুদের বা যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের, অথবা যারা চিঠি লিখে চাইত তাদের। দেওয়াটেওয়ার ব্যাপারে এরকম মুক্তকচ্ছ হওয়াটা সত্যই দুর্ভাগ্যের কথা। নিজের ব্যাপারে তাই যত পারি কম খরচ করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম।

ক্যামু আর আমাদের মধ্যে কয়েক জায়গায় মতের অমিল ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের মধ্যে তখনও অবশ্য মিল ছিল। ক্যামু তখন মনের দিক থেকে ততটা মুক্ত নয় আর আমাদের সঙ্গেও আগে যতখানি মাখামাখি ছিল তখন ততটা ছিল না। তবে তা না থাকলেও বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু সেই শীতেই কোয়েসলারের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

অস্তিত্ববাদকে ঘিরে যে ব্যর্থবোধের সৃষ্টি হয়েছিল সাত্রে´র শত্রুরা তাতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকলেন। আমাদের সব বইয়েই অস্তিত্ববাদী ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধের আগের লেখা বইগুলোতেও সেই ছাপ পড়ল, পড়ল বন্ধুদের লেখা বইয়েও, পড়ল এক জাতের চিত্রকলাতে আর সঙ্গীতে।

সব অকমিউনিষ্ট বামপন্থীর মত সাত্র´ও টিটো আর সোভিয়েট ইউনিয়নের ছাড়াছাড়িতে খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। দুটো ব্লকের কোনটিকেই বেছে না নেওয়ার যুগোশ্লাভিয়ার যে সিদ্ধান্ত তাতে সাত্র´ নিরপেক্ষতার শক্তিকেই সুদৃঢ় হতে দেখেছিলেন।

বার্লিন ব্লকেড চলেছে। চীনে মাওয়ের সেনাবাহিনী একটার পর

একটা যুদ্ধ জিতে চলেছে। নানকিং এর পতন হতে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র মাথা গলাবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তাই যদি হয় তা হলে দূরপ্রাচ্যেই তার সব শক্তি সংযোজিত হবে। আর ইউরোপ যদি সে সামগ্রিকভাবেও ছেড়ে দেয় তাহলে রাশিয়া ইউরোপ আক্রমণ করবেই। আর তখনই ফ্রান্সে আর জার্মানীতে এই দুই মহাশক্তির দেখা হবে। আমেরিকার এক জাঁদরেল যুদ্ধবাজ করেষ্টালও এমনই আতঙ্কে ভুগতে শুরু করল যে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল লালফৌজ সারা বিশ্বে বন্যার স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ছে, নিউ-ইয়র্কেও ঢুকে পড়েছে। করেষ্টাল এমনই চীৎকার করতে শুরু করল যে, তাকে তালা দিয়ে রাখতে হয়েছিল। শেষে করেষ্টাল হাসপাতালের ষোল তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়। ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থীরা বেশ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ত্রাস ছড়িয়ে যাচ্ছিল। দুটো বিষয়কে তারা হয় একসঙ্গে নয় একটার পর আর একটা কায়দায় প্রচার করছিল। বিষয় দুটো হল— (১) সোভিয়েট রাষ্ট্র ভীষণ নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থই হল দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, একনায়কতন্ত্র আর হত্যা। (২) আমেরিকার সাহায্য না পেলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ব। এক সপ্তাহের মধ্যেই লালফৌজ ব্রেষ্টে এসে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে দখলকারী সৈন্যবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার। ক্যারেকো পত্রিকা এইভাবেই সুপরিকল্পিত প্রচারের মধ্যে দিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল।

লোকে অবাক হয়ে ভাবত মাও-সে-তুঙ কি করে কবিতা লেখে। তারা জানত না প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষই তার দেশে কলম নিয়ে একবার না একবার নাড়াচাড়া করে। লেখাপড়া শেখা বলেই এইসব বিপ্লবীরা এমন এক প্রাচীন প্রজ্ঞার অধিকারী, যে প্রজ্ঞার সঙ্গে মার্কসবাদের এক চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। চীনে মাঠে দাঁড়িয়ে লেখাপড়া শেখা সৈন্যবাহিনীতে থিয়েটার ও নারীর মুক্তি সম্পর্কে সুন্দর অথচ সত্যি গল্প বলা হত। অনেকেই মনে করতেন যে, কমিউনিজমে যাবার চৈনিক পথ রুশ পথের চেয়ে অনেক বেশী নমনীয় ও উদার হবে এবং তা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমস্ত রঙটাই বদলে দেওয়া যাবে।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ক্যামু ফিরে এলেন। সে জাষ্টের উদ্বোধন রজনীতে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, বোধ হয় বাইরে তার খুব খাটুনি হয়েছিল। কিন্তু যে উষ্ণ অভ্যর্থনা তার কাছে পেলাম তাতে আমাদের বন্ধুত্বের সেই পুরানো দিনগুলো মনে পড়ে গেল। সুঅভিনীত এই নাটকটি প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক বলেই মনে হল। হাসিমুখে সন্ধিগ্ধ সরলতার সঙ্গে তিনি আমাদের

করমর্দন আর অভিনন্দনগুলো গ্রহণ করলেন। 'সামনে ঝোঁকা, বিধ্বস্ত চেহারার, অত্যন্ত দামী পোষাকপরা রোজমণ্ড জেরার্ড দৌড়ে গিয়ে কামুকে বল্লেন, 'লে মেন সেলের' চেয়েও ভাল লেগেছে। জেরার্ড সার্ত্র যে কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন তা দেখতে পাননি। তার দিকে ফিরে সম্মতির হাসি মুখে নিয়ে কামু বললেন, 'এক ঢিলেই দুটো পাখি মারলাম তাহলে'। সার্ত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাটাকে কামু মোটেই পছন্দ করতেন না।

সবকিছু সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া সমাজতন্ত্রের মাতৃসমা দেশ। আগেও ছিল, এখনও আছে। এখানেই বিপ্লবী ক্ষমতা দখল সুসম্পন্ন হয়েছে।

চীনে মাও এর জয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেহারাকে বদলে দিল। চীন ও রাশিয়ার স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে হো-চি-মিন পৃথিবীর বৃহৎ দুই শক্তি জোট সম্পর্কে যে নিরপেক্ষতা নীতি মেনে আসছিলেন তা থেকে সরে এলেন। এখন থেকে ফরাসী প্রচার দপ্তর ভিয়েতনাম যুদ্ধকে 'কমিউনিষ্ট বিরোধী' ধর্মযুদ্ধের'ই একটা অংশ বলে প্রচার করতে লাগল। পশ্চিমের দেশগুলো ভয়ে কেঁপে উঠল যখন ১৯৪৯ সালের ৯ই অক্টোবর সেনাপতি ব্রাডলি ঘোষণা করলেন যে 'লাল পরমাণু এসে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার এখন পরমাণু বোমা আছে।

বালজাক্রে কামু সার্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "রাশিয়ানরা এখানে এলে আপনার কি হবে?" তারপর খানিকটা আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেন, "আপনি এখানে থাকবেন না।" সার্ত্র তাকে বলেন, "আপনি কি যাবার কথা ভাবছেন?" কামুর জবাব: "জার্মানরা থাকার সময় যা করেছিলাম তাই-ই করব।" লুস্টোনোলাকো চিরকালই গোপন সমিতি ভালবাসে সেই-ই প্রথম গুপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন এবং কামুর মাথায় ঢোকায়। যাই হোক কামুর সঙ্গে আমরা আর খোলাখুলি আলোচনা করিনি। কামু খুব তাড়াতাড়ি রেগে যান আর খুবই জোরালো হয়ে ওঠেন। আর সার্ত্র'র একমাত্র আপত্তি হল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে তিনি কোনদিন অস্ত্র ধরবেন না।

১৯৪৫ সালে সার্ত্র ও কামুর রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত ভাবধারার যে পার্থক্য ছিল তা বছরে বছরে বাড়তে থাকে। কামু আদর্শবাদী, নীতিবাগীশ ও সাম্যবাদবিরোধী। একসময়ে ইতিহাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইতিহাসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। মানুষের কষ্টের প্রতি কামু যথেষ্ট সংবেদনশীল, কিন্তু তার মতে

মানুষের কষ্ট প্রকৃতির সৃষ্টি। ১৯৪০ থেকে সার্ত্র চেষ্টা করে গেছেন ভাববাদকে ত্যাগ করতে আর নিজের প্রথম দিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে। সার্ত্র চেষ্টা করে গেছেন ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের মধ্যে বেঁচে থাকতে। তার জায়গাটা মার্কসবাদের কাছাকাছি, আর তাই তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মৈত্রী চেয়েছেন। কামু সার্ত্রর মত বিশেষ ও বিস্তারিত কাজকর্মের মাঝে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না। সার্ত্র যতই সমাজতন্ত্রের সত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে লাগলেন, কামু ততই বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। তার প্রমাণ 'দি রেবেল।' ফলে হল কি এই দুই এর মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ স্থান নেওয়া মুসকিল হয়ে দাঁড়াল। সার্ত্র ও তার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া ঘেঁষা হয়ে পড়লেন। কামু রাশিয়ানদের ঘৃণা করতেন। যদিও আমেরিকাকে কামু খুব পছন্দ করতেন না, তবু দিন দিন আমেরিকার দিকেই ঝুঁকতে লাগলেন।

দুজনের মতানৈক্য এতই গভীর ছিল যে তাদের বন্ধুত্ব চিড় খাবেই। তাছাড়া ক্যামুর চরিত্রের মানুষের কাছে আপোষ ছিল অত্যন্ত দুরূহ জিনিস। আমার ধারণা ক্যামু বুঝতেন যে তার অবস্থাটা কতখানি নড়বড়ে। তার মতামতকে চ্যালেঞ্জ কেউ করুক তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যখনই দেখতেন চ্যালেঞ্জ আসছে তখনই তিনি তার স্বভাবসুলভ অকারণ ক্রোধের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন।

সার্ত্র একদিন আমাকে বললেন, "চিরকালই নিজের বিরুদ্ধে ভেবে এসেছি" কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি নিজের বিরুদ্ধে যে রকম তীব্রতার সঙ্গে ভেবেছিলেন সে রকম আর কখনও ভাবেননি। ১৯৪৫ সালে লেখকের অঙ্গীকার নিয়ে যে প্রবন্ধ তিনি শুরু করেছিলেন তা শেষ হল। ব্যক্তিগত মুক্তির যে ধারণা তাঁর এতদিন গড়ে উঠেছিল তাকে নিজ হাতেই খান খান করে দিলেন।

একদিন সার্ত্রর কবি লুই আরাগঁর সঙ্গে লাঞ্চ খাবার কথা। দেড় ঘণ্টা দেরী করে আরাগঁ এলেন, দাড়িভর্তি মুখ, দেহের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। স্টালিন মারা গেছেন।

ইন্দোচীনে তখনও লড়াই চলেছে। উত্তর আফ্রিকাতেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দুবছরের শান্তিপূর্ণ চেষ্টার ফলশ্রুতি কিছু মৃত আশা নিয়ে বুরগিবা হিংসা ছাড়া টিউনিসিয়ার মুক্তির আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছেন না। তার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশময় দাঙ্গা আর সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হল। শৃঙ্খলা

ও শান্তি ফিরল বটে, তবে তা ২০,০০০ মানুষকে গ্রেপ্তার আর বার বাকি মানুষ-গুলোকে নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করার পর। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে ফেরহ্যাট হ্যাচেড্-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে মিঃ বনিফেস মরক্কোর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পিটিয়ে খতম করে দিলেন। ৫০০ শ্রমিককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। সাত্র'র যতটুকু সামর্থ ছিল তা দিয়েই তিনি শ্রমিকদের সমর্থন জানালেন, লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, মিটিং-এ গেলেন, লা ট'া মডার্নস-এ লিখলেন।

লা মডার্নস টেম্পে সাত্র' লিখলেন—মার্কসবাদ শুধু একটা দর্শনই নয়, মার্কসবাদ আমাদের ভাবধারার এক পুষ্টিকর পরিবেশ, হেগেল যাকে 'অবজেকটিভ স্পিরিট' বলেছেন।

গোঁড়া কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বা সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলনের রাস্তাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সাত্র'র ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে নয়। সাত্র' দেখলেন মস্কোতে তার 'দি রেস্পেক্টফুল প্রসটিউটে'র তখনও অভিনয় হচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়াতেও হচ্ছে, কিছুদিন পরে হাঙ্গেরীতেও হল। ১৯৫৭ সালের বসন্তে এরেনবুর্গের সঙ্গে তার দুবার দেখা হল। কেউ কারও জায়গা থেকে এক পা-ও নড়লেন না। তবু তাদের কথাবার্তা বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই হল। রাশিয়ানরা খুব চালাক! ২০ কংগ্রেসের মূল সুরের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য। তাই যারা বুদাপেস্ত ঘোষণা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে সেই সব সমর্থকদের তাঁরা চটালেন না। প্রতিবাদকারীদের একজন ভেরকর্স ১৯৫৭ সালে মস্কো থেকে আমন্ত্রণ পেলেন।

ইতিমধ্যে লিসোভস্কির কথায় সাত্র' মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের সম্পর্কটি পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছেন। "পদ্ধতির প্রশ্ন" নাম দিয়ে তিনি এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

একদিন সবে খেতে বসেছি এমন সময় সাত্র'র টেলিফোন এল। "ম'সিয়ে সাত্র', খুব ইচ্ছে হল তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে, জেনারেল দ্য গ্যলে আলজিরিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য তৈরী হচ্ছেন, আপনাকে বোধহয় গ্রেপ্তার করা হবে না, আর আপনি "লা এক্সপ্রেসে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছেন তা আমাদের পছন্দ নয়।" খুবই নম্রভাবে বললেন। বোধহয় কথায় সাত্র'কে ভজাতে চান।

'যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচারের' কথায় এলে বলতে হয় ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে

বারবার এই অত্যাচারকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে গু গালে স্থির মাথায় ঘোষণা করলেন, "অত্যাচার একটি বিশেষ ব্যবস্থার অঙ্গ। ব্যবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারও চলে যাবে।" ১৩ই মে মালরো জাতিকে আশ্বাস দিলেন 'অত্যাচার বন্ধ হয়েছে'। আসলে এই অত্যাচার ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়েছে তখন।

আইনের সীমার মধ্যে লড়াই চালিয়ে যেতে বামপন্থীরা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলে যদি কেউ তার উপনিবেশবিরোধী বিশ্বাসকে বজায় রেখে এই যুদ্ধের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না রাখতে চায়, তা হলে তার একমাত্র রাস্তা হল গুপ্তসংগ্রামের পথ নেওয়া। যাঁরা এই পথে গেলেন তাঁরা আমার চোখে খুব বড় রইলেন। কিন্তু এ রাস্তায় যেতে গেলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে হয়। আমার পক্ষে তা ভান করা মানেই ঠকানো।

১৯৫৮ সালে আলজীরিয় যুদ্ধের আর ফ্যাসিস্ট পুনরুদ্ভবের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা ফরাসী কমিউনিষ্টদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। শান্তি আন্দোলনের কাছে সার্ত্র একটা অনুরোধ রেখেছিলেন—ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার জন্য যেমন লড়াই করা হয়েছে, আলজিরিয় স্বাধীনতার জন্য তেমনি লড়াই করা হোক।

কোন এক জানুয়ারী মাসের বিকেলবেলা সার্ত্রর ঘরে আমি একা বসে আছি এমন সময় টেলিফোন এল। ল'জমাঁ জানালেন 'মোটর দুর্ঘটনায় ক্যামু মারা গেছেন।' এক বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে ফিরছিলেন, গাড়ীটা একটা গাছে ধাক্কা খায়। ক্যামু সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। কণ্ঠস্বর আটকে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—কাঁদব না। আমার কাছে ক্যামুর দাম আর কি আছে। দাঁড়িয়ে রইলাম জানলায় হেলান দিয়ে। দেখলাম আস্তে আস্তে রাস্তায় সন্ধ্যা নেমে আসছে। কাঁদতেও পারলাম না, নিজেকে শান্ত করতেও পারলাম না। সার্ত্রও খুব মুষড়ে পড়লেন। দুজনে ভোস্টের সঙ্গে সারাটা সন্ধ্যা ক্যামুর সম্পর্কে আলোচনা করে কাটালাম।

আমাদের কিউবা ভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে সার্ত্র বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বিপ্লব কিউবার মানুষের সামনে কি কি সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করে দিয়েছে। অত্যাচার, অনশন, বস্তীজীবন, বেকারী আর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ৬ কোটি মানুষের লড়াই-এর কায়দাগুলো আর সেই লড়াই-এর তাৎপর্য বোঝার মত তীব্র অভিজ্ঞতা আর কিছুতেই নেই।

সার্ত্র আমাদের কিউবা ভ্রমণের নাম দিলেন—'বিপ্লবের মধুমাস'। কোন সরকারী যন্ত্র নেই, নেই কোন আমলার সারি। আছে শুধু নেতায় মানুষে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, আর আছে মানুষের মনের অফুরন্ত আশা, খানিকটা বিভ্রান্তি মেশানো। এ অবস্থা বেশীদিন থাকবে না। তবে যতোদিন থাকে ততদিনই মনোমুগ্ধকর।

হিংসার মধ্যে থেকে যে মাঙ্গলিক সুখ বেরিয়ে আসতে পারে তা জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের সকল পূর্ব অভিজ্ঞতাই এর বিপরীত, বিশেষ করে এ্যালজিরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা।

সার্ত্র'র 'ক্রিটিক দি লা রেজোঁ ডায়ালেকটিক' প্রকাশিত হল। দক্ষিণপন্থীরা, কমিউনিষ্টরা আর জাতিবিজ্ঞানের প্রবক্তারা বইটিকে আক্রমণ করে লিখলেন'। তবে দার্শনিকেরা বইটিকে সমর্থন জানালেন।

লুমুম্বার হত্যা, তার শেষ ছবিগুলো, মাথা কামানো ও বুক খোলা অবস্থায় লোকযাত্রার সামনে থাকা তার স্ত্রীর ফোটোগুলো—এগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবার মত কোন উপন্যাস লেখা যায় কি? এই হত্যার ফলে শুধু কাসাভুবু ও শোম্বের মুখেই চুণকালি পড়েনি, চুণকালি পড়েছে আমেরিকার মুখে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখে, বেলজিয়ামের মুখে, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের মুখে আর তার সঙ্গে সঙ্গে লুমুম্বার নিকটতম অনুগামীদের মুখে।

ফ্যানন তার লে ডামনে অ লা তেরে' বই এর একটা ভূমিকা লেখার অনুরোধ করে লাঁজমাঁর হাতে পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিউবাতে থাকার সময়েই সার্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন ফ্যানন কি বলতে চায়। ফ্যাননের বক্তব্য: হিংসার মধ্যে দিয়েই অত্যাচারিতেরা তাদের মানবিক মর্যাদা ফিরে পায়।

গ্রামশি প্রতিষ্ঠান ইতালীয় মার্কসবাদীদের সঙ্গে সার্ত্র'র এক আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিষয়বস্তু—আত্মনিষ্ঠতার তত্ত্ব আর ফ্রান্স ও ইতালীতে ধনতান্ত্রিক কায়দাগুলো যে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা।

আমাদের যা করণীয় তা নিজেদের কাজ। প্রচণ্ড মনোসংযোগের সঙ্গে সার্ত্র তার কয়েকবছর আগে ছক করে রাখা ফ্লবেয়ার অধ্যয়নের কাজ শুরু করে দিলেন।

তিনদিন কেটে গেল। একদিন রাত্রি এগারোটা নাগাদ ফো টেলিফোন করল। ৪২ নম্বর রুমে বোমাপাত, বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 'লিবারেশন' পত্রিকার লোকেরা তাকে টেলিফোন করে খবরটা জানিয়েছে। আমাদের মনে হল ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও যেন একটা ক্ষীণ বিদ্রূপের রেখা দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টা খানেক পরে ফো যখন আবার টেলিফোন

করল তখন আর তার মুখে হাসি নেই। 'এইবার ওরা সত্যিই তোমার রক্ত দেখতে চাইছে। বাড়ীটার প্রহরারত পুলিশটিকে কে নাকি বলেছে. "আমি বাড়ীর মালিকের সেক্রেটারী। আমার কাছে চাবি আছে।" পুলিশটির জবাব, "চাবির দরকার হবে না।" প্লাষ্টিক বোমাটা সার্ত্রে'র ঠিক ওপর তলায় রাখা হয়েছিল, আর তার ফলে ৬ তলায় দুটো ফ্ল্যাটই উড়ে গেছে, ৭ তলার শোবার ঘরগুলোও। সার্ত্রে'র তলাটা খুব জখম হয়নি, তবে দরজার পাল্লাদুটো খুলে বেরিয়ে গেছে আর চাতালের ওপর যে কাবার্ডটা ছিল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ৩ তলা থেকে ওপর পর্যন্ত দেওয়ালটা ভেঙে পড়ার ফলে সিঁড়িটা শূন্যে ঝুলছে।

রোমে সার্ত্রে যে সাংবাদিকদের সভা ডেকেছিলেন বোমাটা তারই প্রতিশোধ।

ক্রমে বেশীর ভাগ বামপন্থী সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকই বোমা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল।

ব্রাসেলে সার্ত্র আলজিরিয়া ও ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে রাজী হলেন।

আলজিয়ার্সে এক রাতে ১০৪টা বিস্ফোরণ ঘটল। লোকের মনে হল হয়ত বা গোটা সৈন্যবাহিনীটাই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে। ৮ই এপ্রিলের গণ-ভোটে দেখা গেল ফ্রান্সের প্রায় প্রত্যেকটা মানুষ আলজীরিয়-যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলার পক্ষে।

সোভিয়েট লেখক সংঘ আমাদের মস্কোতে নেমতন্ন করেছে। যে ক্ষেত্রটিতে আমাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী সেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ২০ ও ২২ পার্টি কংগ্রেস খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। ইয়েভটুশেঙ্কোর ভ্রমণ আর প্যারীতে রুশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের উপস্থিতিই তা প্রমাণ করে।

পুরানো পরিচিতদের সঙ্গে আবার দেখা হল—সিমোনভ, কেভিন, সুরকভ, অলগা, কর্ণিচুক, ইরেনবুর্গের স্ত্রী। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গেও আলাপ হল।

১৯৫৪ সালে সার্ত্র যখন একটা ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন তখন তিনি দস্টয়ভস্কির কথা তুলেছিলেন। ১২ বছরের একটা মেয়ে তেড়ে মেড়ে বলে উঠেছিল, "ওকে নিয়ে মাথা ঘামান আবার কেন?" আজ ওরা দস্টয়ভস্কি পড়ছে। ভালই লাগছে ওদের।

[বর্তমান রচনাটি সিমোন দ্য বভোয়ার আত্মজীবনীর দুটি খণ্ড ('প্রাইম অব লাইফ' এবং 'ফোর্স অব সারকামসটেন্স) থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।]

সংকলন : তন্ময় দত্ত।

রূপান্তর : শ্রীশান্তি দত্ত।

সার্ত্রে'র চোখে সার্ত্র'

[সার্ত্র' তাঁর আত্মজীবনীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—'পড়া' এবং 'লেখা'। সংকলিত অংশগুলো কখনো একটা বাক্যের অংশ, কখনো গোটা একটা পরিচ্ছেদ]

।। পড়া ।।

"নিয়মমতো ভাল বাবা বলে কিছু নেই; পচে যাওয়া পিতৃত্বের বন্ধনের মধ্যেই এর ত্রুটি। সন্তান উৎপাদন ছাড়া ভাল কিছু নেই, কিন্তু কিছু সন্তান হলেই তার মতো পাপ আর কিছু নেই! তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, আমার বাবা, আমার উপর চড়াও হয়ে বসতেন এবং আমায় দমিয়ে রাখতেন। ভাগ্য ভাল, তিনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন;......। এ সমস্ত ভাল না খারাপ? জানি না; কিন্তু একজন বিখ্যাত মনো-বিশ্লেষকের বিচক্ষনতা অনুযায়ী আমি এই সম্মতি পেতে পারি: আমার কোন 'সুপার ইগো' নেই।

"ঘটনাক্রমে, বাবার দ্রুত পশ্চাদগমন আমায় এক অসম্পূর্ণ অয়াদিপাউস কমপ্লেক্সে ফেলে গেছিল: কোন 'সুপার-ইগো' নয়, আমি মানি, কিন্তু লাফ দিয়ে আক্রমনের মতোও কিছু নয়।

"নিজেকে সৃষ্টি করতে আমি কোনদিনই থামিনি: আমি ছিলাম দুই-ই, দাতা এবং গ্রহীতা। বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি আমার কর্তব্য জেনে যেতাম; তিনি মারা গেছিলেন, তাই জানিনি। অধিকার বলতে আমার কিছুই ছিল না কেননা আমায় ভালবাসার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কর্তব্য বলতেও কিছু ছিল না কেননা আমি সবকিছুই করতাম ভালবাসার মধ্যে দিয়ে। উদ্দেশ্য একটাই: আনন্দ দেওয়া; যার সবকিছুই লোক দেখানো......। এই সজ্জিত পৃথিবীতে গরীব মানুষেরা আছে। পাঁচ পেয়ে ভেড়া, শ্যামদেশীয় যমজ এবং রেলওয়ে দুর্ঘটনাও আছে, এই সমস্ত অস্বাভাবিক ব্যাপারে কারো কোন দোষ নেই। গরীব এবং ধর্মপ্রাণ লোকগুলো জানতো না যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের উদারতাকে ব্যবহার করা; গরীব আর লজ্জিতরা যেত দেওয়াল ঘেঁষে; আমি ওদের কাছে যেতাম, ওদের হাতে একটা করে পেনি

খুঁজে দিতাম, আর দিতাম খুব প্রয়োজনীয় ; ওদের শাস্তির উপহার স্বরূপ এক মোলায়েম গণতান্ত্রিক হাসি। দেখতে পেতাম লোকগুলো বোকার মতো তাকিয়ে আছে এবং আমার ওদের শরীরে হাত ঠেকাতে ইচ্ছে করতো না, কিন্তু তবু ছুঁতাম এবং তারপর ওরা আমায় নিঃশ্চই ভালবাসতো : সেই ভালবাসা ওদের জীবনকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তুলতো। জানতাম জীবনের আবশ্যকতার অভাব ছিল ওদের এবং আমি চেয়েছিলাম ওদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশী দিতে।

"কেউ যদি নিজেকে শুধু মাত্র বিরুদ্ধাচারনের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে, তাহলে আমি রক্ত মাংসের ব্যাখ্যা না করা একজন ; প্রেম এবং ঘৃণা যদি একই মুদ্রার দু'পিঠ হয়, তাহলে আমি কোন কিছু ভালবাসি না এবং কাউকে না।

"জীবন শুরু করেছি আমি বইয়ের মধ্যে এবং নিঃসন্দেহে সেখানেই শেষ করবো।

"..., ভয় পেতাম : বইগুলো কি বলেছে ? কারা লিখেছে ওগুলো ? কেন ? এই সমস্ত উদ্বেগ নিয়ে দাদামশায়ের কাছে গিয়ে বিশ্বাস করে গোপনে বলেছিলাম, যিনি বেশ চিন্তা করে ঠিক করেছিলেন যে আমায় স্বাধীনতা দেওয়ার সময় উপস্থিত এবং দক্ষতার সঙ্গেই তিনি তা দিলেন, যা আমার ওপর দাগ ফেলে গেছে।

"...: তিনি তাঁর হাঁটুর ওপর আমায় বসালেন এবং আমার চোখের দিকে তাকালেন : আমি একজন মানুষ, আর মানুষিক কোন কিছুই আমার কাছে ভিন্‌দেশী নয়।

"আমার ধর্ম আমি খুঁজে পেয়েছিলাম : বইয়ের থেকে বেশী প্রয়োজনীয় কোন কিছুকে মনে হত না। গ্রন্থাগারকে আমি মন্দিরের মতো দেখতাম। জনৈক 'পুরোহিতে'র নাতি, আমি থাকতাম পৃথিবীর ছাতে, সাত তলায়,......। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক স্থান থাকে ; অহঙ্কার বা ক্রোধ তাকে ওই উচ্চতায় বসায় না : শিশুকালই সবকিছু নির্ধারণ করে......।

ব্রহ্মাণ্ড আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল এবং সবকিছু অত্যন্ত বিনীত হয়ে এক একটা নাম ভিক্ষে করছিল, এবং নাম দেওয়া মানেই একে সৃষ্টি করা এবং গ্রহণ করা—দুইই এক। এই প্রাথমিক মোহ না থাকলে, হয়তো কিছুই লিখতাম না কোন দিন।

"বয়স্কদের সঙ্গে আমি একা ছিলাম বয়স্কদের প্রতিরূপ, আমি ছিলাম প্রাপ্তবয়স্ক ক্ষুদ্রাকার এবং আমি বড়দের বই পড়তাম ; যা ইতিপূর্বেই ফাঁকা ঘণ্টা বাজিয়েছিল, একই অবস্থায় আমি শিশুও রয়ে গেছিলাম। দোষ করেছি তা বলছি না, ব্যাপারটা এইরকমই ছিল, ব্যাস ;...। বয়েসের উর্দ্ধেই আমি বেঁচেছিলাম লোকে যেমন বেঁচে থাকে তাদের সামর্থের বাইরে : ব্যগ্রতায়, ক্লান্তিতে, অমিতব্যায়ীতায়, আর সব কিছু দেখানোর জন্যে।......। ওরা এ'ও বলতো : 'বাচ্চাটার জানার কৌতূহল আছে!' এবং ওদের ওইকথা বলতে দিতাম। কিন্তু সত্যি সত্যি আমি কিছু শিখছিলাম না : আমি বার করে ফেলেছিলাম যে বিশ্বকোষে নাটক এবং উপন্যাসগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া থাকে ; ওতে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

"ওই সমস্ত বই আর পত্রিকাগুলো থেকে আমি আমার সবচেয়ে ব্যক্তিগত 'ফ্যানতাসি' জগতের বুৎপত্তি নির্ণয় করতে পেরেছিলাম : যা আসলে আশাবাদ।

"আমার সত্যিকারের সত্তা, আমার চরিত্র এবং আমার নাম ছিল বড়দের হাতে ; আমি নিজেকে দেখতে শিখেছিলাম ওদের চোখ দিয়ে ; আমি শিশু ছিলাম, এই দানবকে ওরা তৈরী করে চলেছিল নিজেদের খেদ সত্ত্বেও। ওরা যখন থাকত না, নিজেদের চোখগুলো ফেলে যেত পেছনে, আলোর অংশ হিসাবে ; এই মনোযোগের মধ্যে দিয়ে আমি দৌড় দিতাম আর লাফাতাম যা আমার 'স্যাটাস্'কে সুরক্ষিত রাখত একজন আদর্শ নাতি হিসাবে এবং যা আমাকে খেলনা আর তার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই দিয়ে চলেছিল।

"আমায় দৃঢ়বিশ্বস্ত করা হয়েছিল যে আমরা জন্মেছি একে অপরের সঙ্গে অভিনয় করার জন্যে। অভিনয় করতে আমার অনাগ্রহ ছিল না কিন্তু জেদ করে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলাম। তবু সংকটের সময় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে, আমি লক্ষ করেছি যে আমার শুধু মেকি 'একক' ভূমিকা। অনেক কথা এবং অনেকবার আসা-যাওয়া, কিন্তু কোন দৃশ্যই 'আমার নিজস্ব' নয়। এক কথায়, আমি বড়দের অভিনয়ের খেই ধরিয়ে দিচ্ছিলাম।...এক অসহিষ্ণু অবস্থায় কাটাতাম যখন ওদের বাহ্য লৌকিকতাগুলো আমায় দৃঢ়বিশ্বস্ত করে তুলত যে কোন কিছুরই কারণ ছাড়া কোন অস্তিত্ব নেই এবং প্রত্যেকে, উচ্চ থেকে নিম্ন, যে যার স্থানে নিযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে, আমার নিজস্ব কারণটা অদৃশ্য হয়ে গেছিল। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যে আমি কাদার মতো নমণীয় এবং এই সজ্জিত পৃথিবীতে আমার অনুপযোগী উপস্থিতির জন্যে লজ্জা পেয়েছিলাম।

"মুহূর্তের অনন্ততায় এক বুর্জোয়া ছেলেবেলা কাটান হল, বলতে গেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে। আমি সোজাসুজি মানচিত্র হতে চেয়েছিলাম, চিরকালের জন্যে এবং সময়ের শুরু থেকে। আমার ক্ষেত্রে এটা ঘটেনি যে একজন হয়ে ওঠার জন্যে আমি কাজ করতে পারতাম; 'সুপ্রিম কোর্ট' নয়, আমার এক রায়ের প্রয়োজন ছিল অধিকার পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু 'ম্যাজিস্ট্রেট' কোথায়? আমার স্বাভাবিক বিচারকেরা অভিনয় করতে করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। ওদের কাছে আমি প্রতিবাদ রেখেছিলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

"বিশ্বাস আর নির্জনতায় আমার আত্মা এক নির্বাচিত মাটি যেখানে স্বর্গের বীজ বপন করা যায়; এই ভুল বোঝাবুঝি না হলে আমি হয়ত সন্ন্যাসী হতাম। কিন্তু আমাদের পরিবারে ভলতেয়ার প্রভাবিত উগ্র বুর্জোয়াবাদের প্রভাবে অ-খৃষ্টিয়করণের ছোঁয়া লেগেছিল এবং যা সমাজের প্রত্যেক স্তরে ছড়িয়ে পড়তে আরো এক শতাব্দী সময় নিয়েছিল।

"সবার সাহায্যে নির্মিত দেবমূর্তি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে খারিজ হওয়া, আমি এক দফা যে ফিরে পড়েছিল, এবং সাত বছর বয়েসে, আমি শুধুমাত্র নিজের ওপরেই ফিরে পড়তে পারতাম; যার তৎকালীন কোন অস্তিত্বই ছিল না…। নিজের জন্যে আমি মধ্যবিত্ত নির্জনতা প্রস্তুত করেছিলাম, যার কোন প্রতিকার নেই: যা শিল্পীর নিজস্ব। এই বাঁধন-পরিবর্তনকে নিঃশ্চই কোন অকৃত্রিম বিদ্রোহ বলে গন্য করা হবে না। আমি ওদের অপকর্মের সহচর ছিলাম বহুকাল। সর্বপরি ওরাই আমায় মিতব্যয়িতার উপহার স্বরূপ খৃষ্টান করেছিল। আমি আমার পরিচালনায় অস্ত্রগুলো সীমান্তের অপর দিকে ব্যবহার করছিলাম।

"গত শতাব্দীর বুর্জোয়ারা তাদের থিয়েটারে প্রথম সন্ধ্যেটা ভুলে যায় নি, এবং ওদের লেখকরা প্রাসঙ্গিক কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যবসা করেছিল। পর্দা যখন উঠতো, বাচ্চারা ভাবতো ওরা কোন আদালতে রয়েছে।… মঞ্চে ওরা দেখতো মহত্বের পুর্ণজন্ম যাতে ওদের ঠাকুর্দা-দাদামশাইরা জীবন দিতো। বিশ্রামের সময়ে, ব্যালকনির তাকগুলো ওদের উপহার দিত সমাজের এক চিত্র; বক্সে ওরা পর্যবেক্ষণ করতে পারতো খোলা কাঁধ এবং জীবন্ত মহৎদের।

"পবিত্রতার দিকে দুর্গম হলেও ইন্দ্রজাল আমি গভীরভাবে ভালবাসতাম: চলচ্চিত্র ছিল এক সন্দিগ্ধ ঘটনা যা আমি বিকৃতভাবে ভালবাসতাম, যার অভাব এখনও রয়ে গেছে। আলোর বন্যাই ছিল সবকিছু, কিছুই না, আর সবকিছুই

কিছুনাতে বদলে যায় : ...। এমনকি দ্বি-মাত্রিক গুণাগুণ সত্ত্বেও চলচ্চিত্রকে আমি ভালবেসেছিলাম।

"সময়টা এরকম—১৯১২ কি ১৯১৩—যখন আমি 'মাইকেল ষ্ট্রাগফ্'* পড়ি। আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম : কি আদর্শ জীবন!... ...তিনমাস পরে, ঐ একই উপন্যাস একই উত্তেজনায় পড়ি। তখন আর মাইকেলকে আমার ভাল লাগলো না; ওকে বড়ো বেশী ভাল মনে হলো : এ ওর নিয়তি যাকে আমি ঈর্ষা করেছিলাম।

"আমার আরেকটা বাস্তব সত্তা ছিল। লুক্সেমবুর্গ বাগানের সমতল ছাদে খেলা করত। আমি ওদের কাছে যেতাম, কিন্তু ওরা আমার দিকে না তাকিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে আমায় এড়িয়ে যেত যখন আমি এদের দিকে একটা ভিখিরির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম।...। ... : আমি আমার যথার্থ বিচারকদের দেখা পেয়েছিলাম : আমার সমসাময়িকেরা, আমার সমকক্ষেরা ; এবং ওদের ঔদাসীন্য আমায় দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

"আমায় বাঁচিয়েছিলেন আমার দাদামশাই। উনি আমায় তিরস্কার করেছিলেন, কোন অর্থ ছাড়াই, এক তাজা প্রতারণার মধ্যে, যা আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছিল।

* মাইকেল ষ্ট্রাগফ—জুল ভার্নের লেখা উপন্যাস।

॥ লেখা ॥

"মা যখন আমায় জিজ্ঞেস করত, তাঁর সংগীত থেকে চোখ না সরিয়ে : 'পাওলো, কি করছো তুমি?' কখনো আমার মৌনতার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলতাম এবং উত্তর দিতাম : 'আমি 'ফিল্ম' তৈরী করছি।' ঘটনা হচ্ছে, আমি আমার মন থেকে ধারণাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে আমার বাইরে আনতে চাইছিলাম, আসল আসবাব এবং আসল দেওয়ালগুলোর মাঝে,......।

"লিখতে শুরু করেই অমনি উল্লাসে পেনটা সরিয়ে রাখতাম। ...একটা এক্সারসাইজ খাতা আর এক বোতল বেগুনি কালি আমি চেয়ে নিয়েছিলাম এবং মলাটে লিখেছিলাম : 'উপন্যাসের খাতা।'

"স্বয়ংক্রিয় লেখাকে আমি কোনদিনই ঠিক মতো গ্রহণ করিনি। কিন্তু

খেলার খাতিরেই খেলাটা উপভোগ করেছিলাম মাত্র : একমাত্র সন্তান আমি, খেলাটা একাই খেলতে পারতাম। যখন তখন, তা থামিয়ে দিতাম এবং ইতস্ততঃতার ভান করতাম যাতে আমার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে একজন লেখক বলে অনুভব করতে পারি।

"বিগত বছরে, যখন আমি ফিল্ম তৈরী করছিলাম, আমি স্বয়ং অভিনয় করছিলাম...! একজন লেখক হিসেবে, নায়কও তখনো আমিই, আমার মহাকাব্যিক স্বপ্নগুলোকে ওর মধ্যে দিয়েই প্রক্ষিপ্ত করছিলাম।

"তখন আমার কলম থেকে কি প্রবাহিত হতো—অনন্ত চোখের একটা অক্টোপাস, বিশ টনের কোনও কাঁকড়া, অথবা কোনও প্রকাণ্ড কথা-কইয়ে মাকড়সা—আমিই, এক খুদে দৈত্য ; জীবনের প্রতি আমার বিরক্তি, আমার মরণাতঙ্ক, আমার ভাব-প্রবণতা এবং বিকৃতি। আমি আমাকে চিনে উঠতে পারিনি : ..

"নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করে দিলাম। আমি কার্যতঃ কিছুই ছিলাম না। শুধু বিষয়হীন কিছু একটা, কিন্তু সেটাই ছিল যথেষ্ট। আমি কমেডি থেকে পালাতে চাইতাম : করছিলাম না কিছুই কিন্তু খেলা বন্ধ করেছিলাম ইতিপূর্বে : মিথ্যুক তার আসল সত্তাকে খুঁজে পেতে চাইছিল মিথ্যে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। লেখার মধ্যেই আমার জন্ম : ইতিপূর্বে, আয়নায় কেবল প্রতিফলন ছিল মাত্র। আমার প্রথম উপন্যাস থেকেই আমি জানতাম যে, একজন শিশু আয়নার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল। লিখে, আমি অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলাম, বড়দের কাছ থেকে পালিয়েছিলাম ; কিন্তু আমার অস্তিত্ব ছিল শুধু লেখার জন্যে এবং যদি বলতাম : আমি—তার মানে আমি—যে আমি লিখি। এটা কোন ব্যাপারই নয় : আনন্দকে আমি চিনেছিলাম।

লিখবো, সেটা বোঝা গেল। আমার যথেষ্ট জানা দরকার যাতে আমার ইচ্ছা-পথে দাঁড়ালে বাধা না পাই। কিন্তু বস্তুসকল যেমন ছিল আমায় তেমনই দেখতে হলো, পরিষ্কারভাবে। একজন মানুষ সাহিত্য দিয়ে বেঁচে থাকতে পারতো না। আমি কি জেনেছিলাম যে প্রসিদ্ধ লেখকরা ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে মারা গেছিলেন ? অন্যেরা খাওয়ার জন্যেই নিজেদের বেচে দিয়েছিলেন ?

তোমরা হয়তো ভালভাবেই বিশ্বাস করবে যে আমার শুভ ভাগ্যকে আমি মূল্য দিয়েছিলাম। মুশকিলটা হলো যে আমি তা উপভোগই করিনি।

"মূড যখন ভালো থাকতো, সবকিছুই আমার ভেতর থেকে আসতো। আমার নিজস্ব শক্তি দিয়ে আমি নিজেকে হিঁচড়ে বার করে আনতাম শূন্যতা থেকে। মানুষকে তার প্রয়োজন মতো পুস্তক সরবরাহের জন্যে : এক বাধ্য শিশু, আমি আমরণ বাধ্য হয়ে থাকতাম, কিন্তু নিজেও নিজের কাছে বাধ্য থাকতাম।

"আমি ছিলাম এক লেখক-নাইট, আমি কেটে দু টুকরো হচ্ছিলাম এবং প্রত্যেকটা টুকরো এক একটা সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হচ্ছিলো, একে অপরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছিলো এবং তার অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলছিল। 'ফিল্ম তৈরী'র সময়ে আমাকে এক কেতাবী 'ডন কুইকসোত' দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু পাতা পঞ্চাশের বেশী পড়িনি : জনতার সামনে আমার অসাধারণ কর্মের ঠাট্টা চলতো। ...বিশ্বস্ত কে ছিল? বাস্তবিক, আমি ছিলাম ভবঘুরে, এক সৈনিকের মেয়েছেলে : আমার হৃদয়, আমার ভটস্থ হৃদয়, আমায় দুঃসাহসী থেকে বুদ্ধিবাদী করে তুলেছিল; আমার শুধুমাত্র সারভেন্তিস বলতে লজ্জা করতো।

"অসহিষ্ণুতা লেগেই থাকতো অন্য আকারে : আমি আমার প্রতিভা শান দিয়ে নিচ্ছিলাম, আর কিছু নয়। কিন্তু এর প্রয়োজনটাই বা কি? মানুষের আমায় প্রয়োজন : কিসের জন্যে? আমার লক্ষ এবং ভূমিকা সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করে আমি অখুশী হতাম। জিজ্ঞেস করতাম : 'সত্যি সত্যি এ সমস্ত কি?' এবং তৎক্ষণাৎ, ভাবতাম সব কিছু হারিয়ে গেছে। এ সমস্তই শূন্যতা।

"..., ধীরে ধীরে লেখক-নাইট লেখক-শহীদে পরিণত হলো।...গোটা মানবজাতিকে তার পাশবিকতা থেকে ছিঁড়ে আনতে, দুটো মাত্র সর্তের প্রয়োজন : যেমন যাজকীয় পবিত্র কোন বস্তু—পেন্টিং, বই, স্ট্যাচু—তদারকির মাধ্যমে সুসংরক্ষিত স্থানে রাখা উচিৎ। এবং তা অন্ততঃ একজনও যাজক যে চালিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতের পবিত্র বস্তু উৎপাদন করে যাবে।

নোংরা অর্থহীন কথা : যা আমি গিলে নিয়েছিলাম সত্যি সত্যি তা কি না বুঝেই। এবং কুড়ি বছর অবধি আমি তাই বিশ্বাস করতাম। এ'কারণেই, আমি কোন এক শিল্পকর্ম গ্রহণ করতাম, আধিবিত্তক ঘটনায় যার জন্ম, ব্রহ্মাণ্ডকে যা উৎসাহিত করে তুলতো।... : আত্মকটুতা এবং আক্রোশ আমি সম্পূর্ণ শুষে নিয়েছিলাম যা আমারও ছিল না, না ছিল আমার দাদামশায়ের। ফ্লবেয়েরের, গোঁকুরদের এবং গতিয়ের পুরনো খিটখিটেমি আমায় বিষাক্ত করে দিয়েছিল, মানুষের প্রতি তাদের বস্তুনিরপেক্ষ বিদ্বেষ আমার মধ্যে উপক্রমিত হয়েছিল

ভালবাসার ছদ্মবেশে। তাজা ভনিতায় সংক্রামিত করেছিল। আমি এক প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী হয়ে উঠেছিলাম। সাহিত্যকে প্রার্থনা আর মানবিক আত্মত্যাগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আমার ক্ষেত্রে এমন কখনো ঘটেনি যে কেউ না পড়ার জন্যে লিখেছে।

একজন মানুষ লেখে হয় তার প্রতিবেশীদের জন্যে, নয় ভগবানের জন্যে।

"আমার দুর্বোধ্যতা থেকে আমি আনন্দ গ্রহণ করতাম; তা চালিয়ে যেতে চাইতাম এবং এর এএক যোগ্যতা নির্ণয় করে নিয়েছিলাম। যে সব বিখ্যাত কারাবাসী তাদের ঘোর অন্ধকার কারগারে মোমের পাতায় লিখে গেছিলো তাদের আমি ঈর্ষা করতাম।

"তাতে রীতিমতো এক জয় নিষ্পন্ন হতো: দশ হাজার কপি দুদিনে উবে গেল। জনতার মনস্তাপের ঘটা কি! হাজার খানেক সাংবাদিক বেরিয়ে পড়লো আমার সন্ধানে কিন্তু আমায় খুঁজে পেল না।

"...১৯১৩'র শেষের দিকে আবিষ্কার করেছিলাম নিক্ কার্টার, বাফেলো বিল, টেক্সাস জ্যাক, আর সিটিং বুল।

"সমান্তরালভাবে আমি ভুলেছিলাম যুদ্ধ আর আদেশ। যখন আমায় জিজ্ঞাসা করা হতো: 'বড় হয়ে কি হবে?' আমি নম্রভাবে এবং উৎফুল্ল হয়ে বলতাম যে আমি লিখবো, কিন্তু গৌরবের স্বপ্নগুলো আর আত্মিক ব্যায়াম-কৌশল ত্যাগ করেছিলাম।

"আমার শ্রেষ্ঠ বই হলো যেটা লিখতে আমি ব্যস্ত; সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিণত হতো যেটা সবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমি প্রস্তুত হচ্ছি, শান্তভাবে, শীঘ্রই তা ঘৃণা করতে।

"স্বতঃসিদ্ধ সার-সংক্ষেপ হলো যে আমি প্রয়োজনীয়। এবং আমার অস্তিত্বের অপরিণত সংজ্ঞাও থাকে পাশাপাশি, না চতুর করে তোলে না মিশে যায়। আমি দৌড়ানো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না এবং সেই নিস্তেজ গতিকে পুনরুদ্ধার করতে করতে যা আমায় বিরক্ত করে তুলতো; নিষ্ফল ভাবে: সেই যাদু ভেঙে যেত।

"যুদ্ধরত আমি কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছিলাম: একজন অতীন্দ্রিয়বাদী, আমি অস্তিত্বের ঘোমটার জড়তা কাটাতে চেয়েছিলাম এক বিপরীত কার্যকরী শব্দের বিড়বিড়ানির মধ্যে দিয়ে এবং সর্বোপরি, আমি

বস্তুগুলো গুলিয়ে ফেলেছিলাম তাদের নামের সঙ্গে : তা হলো বিশ্বাস।...আমার দৃষ্টি কিছু অসচ্ছ ছিল। যতদিন ছিল আমি ঝঞ্ঝাটমুক্ত ছিলাম।

"আমার অতীত-সংক্রান্ত মোহগুলো সব ভেঙে খান খান। শহীদী যন্ত্রণা, মুক্তি, চিরস্থায়িত্ব সমস্ত ক্ষয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে : অট্টালিকার মতো অতীতের মোহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।... পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি মোহমুক্ত, আমার আসল কাজ সম্পর্কে আমি সচেতন এবং একজন নাগরিক হিসেবে আমি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য : প্রায় দশ বছর ধরে আমি জেগে উঠছিলাম, এক তিক্ত-মধুর উন্মাদনা, যে এ'থেকে পালাতে পারে না, যে তার দেখে আসা পথকে না হেসে স্মরণ করতে পারে না এবং যার জীবন নিয়ে কিছু করার ধারণা আর নেই।

"আমি আমার পেশা পরিত্যাগ করেছি, তবু আমি লিখি। এছাড়া আর কিইবা করতে পারি ? এ আমার অভ্যেস এবং পেশাও। দীর্ঘদিন ধরে আমার কলমকে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এসেছি। এখন অনুভব করি আমরা কতো অসহায়। আমি বই লিখছি বা লিখে যাবো এটা কোনো ব্যাপারই নয়। তার প্রয়োজন আছে ; তাদের যা হোক একটা ব্যবহার আছে।

"সংস্কৃতি কাউকে বা কোনকিছুকে রক্ষা করে না, না রাখে কোন ন্যায়-সংগত প্রমাণ। এ কিন্তু মানুষেরই উৎপাদন যার দ্বারা সে নিজেকে পরিচালনা করতে এবং চিনতে পারে। এই ভয়ংকর আয়নাই একমাত্র তাকে তার প্রতিমূর্তি দেখায়।

"আমার উন্মত্ততা সম্পর্কে পছন্দ আমায় রক্ষা করেছে 'সমাজের উচ্চ মার্গের লোকেদের' তোষামোদ করা থেকে। আমি নিজেকে কোনদিন 'প্রতিভা'র সুখী মালিকরূপে দেখিনি। নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার এক উদ্বেগ ছিল—কোনো কিছুই হাতে নেই, কোনো কিছুই পকেটে নেই—কাজ আর বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শুধু নিজেকে রক্ষা করা। এখন, সবশেষে আমার অবিমিশ্র পছন্দ আমাকে কারো ওপরেই তুলে বসালোনা। আমি আমার গোটা নিজস্বতাকে দিয়ে ছিলাম আমার নিজস্বতাকে রক্ষা করতে।

অঙ্গীকারবদ্ধতা সম্পর্কে সার্ত্রের সংজ্ঞা

ম্যাক্স এ্যাডারেথ

মিঃ ম্যাণ্ডারের মত অনুযায়ী আমরা ইংলণ্ডে 'সার্ত্রের পদগুলি (term) গ্রহণ করলেও তার তত্ত্বগত ভিত্তিকে খুব বেশী ক'রে অবহেলা করেছি।' যখন তিনি একথা বলেন যে আমাদের এই অবহেলা করার বিষয়টি 'শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে'—তখন তাঁর বক্তব্যের সাথে আমি একমত হব কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। যদিও সার্ত্রের তত্ত্বগুলি প্রায়ই বিতর্কের বিষয়, এবং যদিও তার কথামত এই তত্ত্বে ভিত্তিটা ততটা দৃঢ় নয়—কারণ সবসময়ই সার্ত্রে এই তত্ত্বগুলির সংস্কার করেছেন এবং কখনো কখনো তা করেছেন অত্যন্ত নাটকীয় কায়দায়—তাই ম্যাণ্ডার যাকে 'এ্যাংলো-স্যাক্সন অভিজ্ঞতাবাদ' বলেছেন, সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাটা আমাদের পক্ষে মোটেই ভাল হবে না। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, অঙ্গীকারবদ্ধতা কোন এলোমেলো বা সহজাত প্রতিক্রিয়া নয় এবং শিল্পসৃষ্টিতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একটি যথার্থ ও সাহসী পদ্ধতি এবং এবিষয়ে আমরা ফরাসী উদাহরণগুলি থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারি। এই ফরাসী উদাহরণগুলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু হল তাদের মূল্যানুযায়ী সাহিত্যিক তত্ত্বগুলি এবং সেইসব রচনা, যেগুলি এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

সার্ত্রের মতে, অঙ্গীকারবদ্ধতা লেখন প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত। তিনি বলেন, লেখার অর্থই হ'ল কিছু বলা এবং কিছু বলার অর্থ হ'ল জগতের কোন একটি বিষয়কে পরিবর্তিত করার জন্য সেই বিষয়টির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। সুতরাং সাহিত্য হ'ল দুনিয়ার প্রতি সচেতন বা অচেতন কোন দৃষ্টিভঙ্গির ফল। অন্যদের থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ লেখকদের পার্থক্য হ'ল এই নয় যে তিনি দুনিয়ার সাথে বিজড়িত, বরং তিনি এই বিষয়ে সতর্ক, কারণ তিনি এই বিজড়িত থাকার বিষয়ে সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সচেতনতা অর্জন করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর অঙ্গীকারবদ্ধতাকে তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ততার স্তর থেকে সচেতনতার স্তরে উন্নীত করতে চান।

অন্যদিক থেকে চমৎকার এই সংজ্ঞাটির এমন দুর্বলতা হল বিজড়িত থাকা (যেটা কোন লেখকই এড়িয়ে যেতে পারেন না) এবং সঠিক অর্থে অঙ্গীকারবদ্ধতা

(যেটা হল এই বিজড়িত থাকার বিষয়টির সচেতন স্বীকৃতি)—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানে নি। এই পার্থক্যটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই বিষয়টিই সার্ত্রে ও অন্যান্যরা অঙ্গীকারবদ্ধতার স্বপক্ষে যে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছেন, তার থেকে উদ্ভূত একটা আপাত-অদ্ভুত দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। এই দ্বন্দ্বটি হল যদি অঙ্গীকারবদ্ধতা এত সাধারণ, এত 'অনিবার্য'ই হয়, তবে তা প্রচার করার জন্য এত কালি ও শক্তি অপচয় করার প্রয়োজন কি? অবশ্যই এর উত্তর হল—অঙ্গীকারবদ্ধতা নয়, বিজড়িত থাকাই হ'ল অনিবার্য এবং লেখকেরা আপনা থেকেই তাদের বিজড়িত থাকার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন নন (অতএব তাদের বিষয়টি মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়)। সার্ত্রে লেখকদেরই দোষ দেন এবং 'মানসিক আলস্য,' ঘটনার মুখোমুখী হতে অস্বীকার করা ইত্যাদি বলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সত্যি হতেও পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি সম্পর্কে বিভ্রান্তির পিছনে কতকগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সমালোচনামূলক চরিত্রের উপর যে আক্রমণ সূচিত হয়েছিল এটা তারই অঙ্গ। যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন, এবং বহুজনে যত আন্তরিকভাবেই তা গ্রহণ করুক না কেন, এর ভিত্তি ছিল এই ভ্রান্ত ধারণা যে শিক্ষা হচ্ছে 'বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার' (a thing apart)। যারা বাস্তব অবস্থার একটি সত্যনিষ্ঠ অঙ্কনের প্রভাবকে ভয় করে, তারা 'শিল্প তার নিজস্ব একটি জগতে গতিশীল'—এই ধারণা প্রচার করতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। অঙ্গীকারবদ্ধ ধারণার প্রকৃত মূল্য এখানেই যে তা এই নমনীয় ও পলায়নী মনোবৃত্তিমূলক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং লেখকদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা এই পৃথিবীর মানুষ না হয়ে পারেন না। এই ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধতার তাৎপর্য দাঁড়ায় একটি কপট মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচন করা, এবং একটি স্পষ্ট সত্যকে মেনে নেওয়া, যাকে কোন কোন সামাজিক শক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঝাপসা ক'রে রাখে। এর বাস্তব ফলাফল দাঁড়ায় যে লেখক 'নাগরিক হিসাবে' তার কার্যকলাপকে দেখেন 'লেখক হিসাবে' তার কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে। এবং তার লেখার প্রভাব কার্যকরী হওয়াকে সুযোগের অপেক্ষায় ছেড়ে না রেখে বরং তাকে নিজের ইচ্ছার অধীন করার পক্ষে একটা ভাল অবস্থানে থাকেন। অবশ্য এ কথার অর্থ নয় যে তিনি সফল হবেনই; এটা তাঁর অঙ্গীকারবদ্ধতার স্তর ও গুনের মাত্রার ওপর নির্ভর করবে। ফলে লেখার প্রকল্প হয়ে ওঠে সাবলীল।

অঙ্গীকারবদ্ধতা সম্পর্কে সার্ত্রে ধারণার মৌলিকত্ব এটা নয় যে তিনি সাহিত্যের একটা নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বরং তার ধারণার মৌলিকত্ব সেখানেই যখন তা দাবী করে যে আত্ম-প্রতারণাকে পরিহার করে এটাই সাহিত্যের একমাত্র রূপ। এটা একটা…চ্যালেঞ্জ। লেখকের কাছে এই চ্যালেঞ্জের তাৎপর্য হ'ল তাঁর দায়িত্বের প্রতি ও স্বাধীনতার প্রশ্নটির প্রতি একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। সার্ত্রে বিশ্বাস করেন যে অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিহিত দুটো মৌলিক প্রশ্নের সরাসরি মুখোমুখী হন—কেন লিখি? কার জন্য লিখি? ঘটনাক্রমে সাহিত্য কি?—এই প্রবন্ধটির দুটি অংশের নামকরণ করা হয়েছে ঐ ভাবেই। তাছাড়াও সার্ত্রে মতানুযায়ী, যেহেতু অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক মুক্ত মানুষের কাছে তার বক্তব্য পেশ করছেন, সেহেতু তাঁর একটি মাত্র বিষয়বস্তুই থাকতে পারে—স্বাধীনতা। সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা নয় (যেটা আসলে একটা অর্থহীন বিমূর্ততা), কিন্তু মূর্ত স্বাধীনতা, যা মানুষ তাদের প্রতিটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশের স্তরে অর্জন করতে ও তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। তাঁর এই সংজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্রে একটা উদাহরণ দিয়েছেন, সেটা যখন তিনি প্রথম উদাহরণটি ব্যবহার করেছিলেন তখনকার চেয়ে আজকের দিনে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন যে স্বাধীনতার অভাবকে সমর্থন করার লক্ষ্য নিয়ে একটা ভাল বই লেখা যায় না এবং সে কারণেই ইহুদী বা নিগ্রোদের বিরুদ্ধে একটা ভাল উপন্যাস লেখাও অসম্ভব। আইরিস্ মার্ডক এই উক্তির জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। মিস্ মার্ডক মনে করেন যে সার্ত্রে যখন ধরে নেন কেবল মাত্র একজন 'প্রগতিশীল' লেখকই ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, তখন তিনি নিজের উৎসাহের জোয়ারে ভেসে যান। একথা সত্য যে সার্ত্রে প্রায়ই তাঁর নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়টির উপর বেশী জোর দেবার দিকে ঝুঁকেছেন এবং মিস্ মার্ডক সার্ত্রের ওপর যে দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেছেন, একসময় সেই চরম দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর ছিল। তার মানে একথা সবসময় ঠিক নয় যে একটা স্পষ্ট সেমিটিক বিরোধী ও নিগ্রো বিরোধী উপন্যাস কখনই একটা বড় শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে না সার্ত্রে বিশ্লেষণের তত্ত্বগত মূল্য যাই হোক না কেন, তাঁর বাস্তব চ্যালেঞ্জ (ইহুদীদের বিরুদ্ধে লিখিত একটা ভাল উপন্যাসের নজির দেখাও ইত্যাদি) কখনই সফলভাবে গ্রহণ করা হয় নি। তাছাড়াও, যদি একজন লেখক চরম-প্রতিক্রিয়াশীল হন, তবে তাঁর একপেশে ব্যক্তিগত ধারণাগুলি তাঁর শিল্পকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একজন ঔপন্যাসিক, যিনি নিগ্রো

বা ইহুদীদের শুধুমাত্র ভিলেন হিসাবে চিত্রিত করেন, তবে তাঁর সৃষ্টি নন্দনতত্ত্বের দিক দিয়ে ব্যর্থ হবে। কারণ তাঁর চরিত্রগুলি হয়ে দাঁড়াবে স্থূলভাবে ব্যাঙ্গাত্মক এবং যার কোন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না; অন্যদিকে যদি তিনি তাদের দোষ-গুণ সমেত বাস্তব মানুষ হিসাবে চিত্রিত করেন, তবে তিনি আপনা থেকেই বর্ণবৈষম্য প্রথার বিষয়টিকে ধ্বংস করছেন; কারণ ঐ প্রথা এই অযৌক্তিক বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে 'হীন' জাতিগুলির কোন গুণই নেই।

যাই হোক, আইরিশ মার্ডকের সমালোচনা আমাদের মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করে যে 'অঙ্গীকারবদ্ধ সাহিত্যকে' ('literature engagee') ব্যাখ্যা করার দুটি পথ আছে: একটি সঙ্কীর্ণ পথ এবং সেই পথে এটা অস্বীকৃত হয় যে 'মহৎ আদর্শ' প্রচার না করলে শিল্পের প্রকৃত কোন মূল্য নেই। এবং অপরটি হল ব্যাপকতর পথ, সেখানে জোর দিয়ে বলা হয় যে শিল্পের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারেই, আমাদের চিন্তা করতে শেখানোর ক্ষেত্রে এবং বাস্তবকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখতে শেখার ক্ষেত্রে আর একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে! অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তা সচেতনভাবে সমস্ত শিল্পের কার্যকলাপ সম্পাদন করে। সার্ত্রে নিজে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং আমার মতে অত্যন্ত বরণীয় পরিবর্তন এসেছে। অঙ্গীকারবদ্ধতাকে সমস্ত লেখককেই যে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে—এভাবে বিষয়টিকে আজকাল আর দেখা হয় না। বরং এটিকে দেখা হয় একটা গুণ হিসাবে যা সাহিত্যে সচেতনতা ও প্রাঞ্জলতা সঞ্চারিত করে।

[মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচক ম্যাক্স এ্যাডারেথে'র দীর্ঘ প্রবন্ধ 'কমিটমেন্ট ইন মডার্ণ লিটারেচারের' নির্বাচিত অধ্যায়। অনুবাদ: সুচিক্কন দাস।]

সার্ত্র্ / রাজনীতি : বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ত্র্ একাধিকবার তাঁর যে বাল্য কৈশোর বর্ণনা করেছেন, তাতে পারিপার্শ্বিক যেন অনিবার্যভাবে তাঁকে চিন্তাগভীর এক নৈঃসঙ্গে নির্বাসিত করেছে। একটার পর একটা এমন সব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা তাঁর সমস্ত সত্তাকে আঘাত করে দূরে ঠেলেছে। মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ, দ্বিতীয় পিতার বিজ্ঞানশিক্ষার চাপ, লা রোশেল নামে বন্দরনগরীতে স্কুলে পড়তে গিয়ে সহপাঠীদের যৌন কৌতূহল বা আগ্রহের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কিংবদন্তি রচনা ও তার অবশ্যম্ভাবী সত্যোদ্ঘাটন, অনীহা ও অনাগ্রহ সত্ত্বেও শিক্ষকজীবনে প্রবেশ, সবই জীবনধারণের বাস্তব থেকে তাঁর বিচ্ছেদ বাড়িয়েছে। নিঃসঙ্গ চিন্তাবিলাস, বই পড়া, বাছাই করা বন্ধুসংসর্গ, এই নিয়ে যে জীবন তা স্বভাবতই পৌঁছে গেছল কর্মহীন দার্শনিকতায়। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকের রাজনৈতিক টালমাটালও তেমন ভাবে তাঁকে স্পর্শ করেনি, পোল নিজঁ-র সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও। তাই হিটলারের ছায়ায় আচ্ছন্ন বের্লিনে হুসের্ল চর্চা কালে সার্ত্র্ লক্ষই করেননি ফ্যাশিবাদের অমোঘ অভ্যুদয়। ফ্রান্স্-এ ফিরেও সার্ত্র্ সমানই উদাসীন। সিমোন দ্য বোভোয়া পরে লিখেছেন, 'আজ ভাবতে অবাক লাগে আমরা কি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে এই সব দেখেছিলাম।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতই সার্ত্র্ ও সিমোন দ্য বোভোয়াকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে সিমোন দ্য বোভোয়া লেখেন : 'সার্ত্র্ আমাকে বুঝিয়ে দিল, যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু এমন পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হল? তা নিয়ে নালিশ করার অধিকার আমার নেই, কারণ এই পরিস্থিতি আটকাবার জন্য আমি তো আমার কড়ে আঙুলটিও নাড়াইনি।...নিজঁ ঠিকই বলেছিল, রাজনীতি থেকে পালিয়ে থাকা যায় না। রাজনীতি থেকে সরে থাকাও এক রাজনৈতিক মনোভাব। আমি অনুশোচনায় বিদ্ধ হলাম। এই সময় নাগাদ আমার মানসিকতার যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়, তার দিন ক্ষণ, এমনকি সপ্তাহ বা মাসও নির্দেশ করা যাবে না। কিন্তু ১৯৩৯-এর বসন্তকালই যে আমার জীবনে পর্বান্তর তাতে সন্দেহ নেই। আমি আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, মানবিকবাদ-বিরোধী জীবনধারা পরিহার করলাম। মানবসৌহার্দ্যের মূল্য নতুন করে শিখলাম।...১৯৩৯ সালে...

ইতিহাস আমাকে আঁকড়ে ধরল, আর ছাড়ল না কখনও।' সিমোন দ্য বোভোয়ার বিবরণেই প্রকাশ, জর্মন ফ্যাশিবাদকে প্রতিরোধ করার দায়বোধেই সার্ত্র্-এরও চিন্তাধারার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। এই মুহূর্তে অবশ্য নিঃসঙ্গ বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বস্তির বিঘ্ন ঘটায় ভয়ই মুখ্য ছিল। তাই সার্ত্র্ সিমোন দ্য বোভেয়াকে বলেন, 'আমার মুখে কেউই আমার পাণ্ডুলিপি পুরে দিয়ে আমাকে তা খেতে বাধ্য করবে, আমি চাই না। আমি চাই না কেউ চামচ দিয়ে নিজ-র চোখ দুটো উপড়ে ফেলবে।'

যুদ্ধের শুরুতেই মবিলাইজেশন-এর ফলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হন সার্ত্র্, তারপর ঘটে কারাবাস জর্মন বন্দীশিবিরে। বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসে সার্ত্র্ প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু তখনও ব্যক্তির স্বতন্ত্র কর্ম বা ভূমিকাই তাঁর লক্ষ্য। ইতিহাসকে মেনেও ব্যক্তির স্বতন্ত্র আচরণই হবে ইতিহাসের কাছে মানুষের অঙ্গীকার। সংগঠিত আন্দোলনের সামূহিক প্রয়াসে ব্যক্তির আত্মসমর্পণকে সার্ত্র্ তখনও মানেন না। ১৯৪৩ সালে 'দ ফ্লাইজ' নাটকে ওরেসতেস ইজিস্‌থস্ ও ক্লাইতেমনেস্ত্রাকে হত্যা করে দেশ ছেড়ে চলে যায়, সমাজের অপরাধবোধের ক্লীবতা থেকে সমাজকে মুক্ত করে দিয়ে যায়, এক নতুন অপরাধকে সগর্বে একার অমোঘ দায় রূপে ধারণে করে নিয়ে যায়। নাটক লিখতে লিখতে তিনি সিমোন দ্য বোভোয়াকে একদিন বলেছিলেন, পুরাণ কাহিনীকে 'তিনি এমন এক অস্ত্রে পরিণত করবেন যা দিয়ে তিনি সরকারি নীতিবোধকে আঘাত করতে পারবেন, যে অপরাধবোধে ভিশি ও জর্মনি আমাদের বিষিয়ে তুলছে, সেই অপরাধবোধ বিতাড়িত করে স্বাধীনতার পুনরুচ্চারণ ঘটাবেন।' নাটকের বিন্যাসে সার্ত্র ক্রমেই ওরেস্‌তেস্-কে একা করেছেন। ওরেস্‌তেস্-এর সিদ্ধান্ত একার সিদ্ধান্ত। এবং নাটকের সমাপ্তিও ওরেস্‌তেস্-এর মহানিষ্ক্রমণে। সার্ত্র্-ব্যাখ্যাতা ফ্রাঁসিস জঁস প্রশ্ন তোলেন: প্রতিরোধ আন্দোলনকে সার্ত্র্ প্রত্যেক প্রতিরোধীর ব্যক্তিগত অ্যাডভেনচার রূপেই মুখ্যত বিবেচনা করেছিলেন বলেই কি তিনি 'বিবেকের বীর্য' ছাড়া আর কিছু দেখেননি এই আন্দোলনে? সার্ত্র্-এর অস্তিত্ববাদী সাহিত্য এই ওরেসতেস মানস যে সমর্থন ও শ্রদ্ধা লাভ করেছে, তার পরিণতি, সার্ত্র্-এর রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সার্ত্র্-এর সাহিত্য বর্জন।

ওরেসতেস-মানসের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরেকটি অভিনেতা। সার্ত্র্-এর আদি এলীটিজ্‌ম্-এর সামাজিক রূপান্তর ঘটেছিল প্রতিরোধের অভিজ্ঞতায়।

স্বল্পস্থায়ী বন্দীজীবনে একদিকে প্রকাশ্যে সহবন্দীদের উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনেই দৈনন্দিন জৈবিক ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতায় তাঁর এলীটিজ্‌ম্ ধাক্কা খেলেও অন্যদিকে তা আরেক এলীটিজ্‌ম্-এর জন্ম দেয়—এই অভিজ্ঞতার মাহাত্ম্যেই যেন তিনি এক ধরনের মহত্ত্ব আরোপ করেন নিজের উপর, নিজের ভূমিকার ওপর। ১৯৭২-এর এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র স্বীকার করেছেন, কারাশিবিরেও তাঁর নৈকট্য ছিল বন্দী খৃষ্টীয় পুরোহিতদের সঙ্গেই বিশেষভাবে। 'কারণ এলীট শব্দটির বুর্জোয়া তাৎপর্যে এই পুরোহিতেরা ছিলেন এলীট শ্রেণী। তাঁদের কারবার মানুষের "আধ্যাত্মিক সত্তা" নিয়ে। তাই তাঁরা সংঘবদ্ধ থাকতেন, শিবিরে যাঁরা ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁদের উপরেও পুরোহিতদের প্রভাব ছিল। তাই শিবিরের পুরোহিতদের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁরাই ছিলেন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' বন্দীশিবিরে যে-সব দায়িত্ব সার্ত্র্-এর উপর ন্যস্ত হয়, তাও এলীট পর্যায়ের। 'আমার যে শিবিরের এলীট শ্রেণীর মধ্যেই আমার স্থান করে নিয়েছিলাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

প্রতিরোধ আন্দোলনে সার্ত্র্-এর ভূমিকা যে খুব কর্মিষ্ঠ ছিল, এমন কোন প্রমাণ মেলে না। প্রচারপুস্তিকা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদিতেই তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। ঝুঁকি ছিল তাতে। কিন্তু সার্ত্র্-এর সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি। এই ঝুঁকি নেওয়া এবং ঝুঁকি নিয়েই নিজেকে রাজনৈতিক দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করা, ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যেই রাজনৈতিক সততার প্রমাণ রাখা, সার্ত্র্-এর পরবর্তী রাজনীতিচেতনার অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছিল। একটি অসাধারণ নাটকীয় মুহূর্তে একটি নাটকীয় জেস্‌চার-এ, প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে সদর্পে অস্বীকৃতি জানিয়েই যেন রাজনৈতিক ভূমিকা পূর্ণতা লাভ করে। জর্মন অধিকৃত ফ্রান্স্‌-এ শাসকদের অত্যাচার সহ্য করেও আন্দোলনের গোপন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করাই মুখ্য রাজনৈতিক জেস্‌চার গণ্য হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন এবং শরীরমনের সমস্ত শক্তি সংহত করে সেই নির্যাতন সহ্য করে নিজের রাজনৈতিক নিষ্ঠায় অটল থাকার দায়ই মুখ্য রাজনৈতিক দায় গণ্য হয়। যুদ্ধান্তে ১৯৪৪-এ বি. বি. সি. প্রচারিত এক ভাষণে সার্ত্র্ বলেন : 'আমরা জর্মনদের অধীনে যতটা স্বাধীন ছিলাম ততটা আর কখনও থাকিনি। আমরা আমাদের সমস্ত অধিকার হারিয়েছিলাম ; মুখ্যত এবং প্রথমত, আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম। আমরা প্রতিদিন প্রাকাশ্যে অপমানিত হতাম, তবু আমাদের নীরব থাকতে হত।…এই সমস্ত কিছুর কারণেই আমরা ছিলাম স্বাধীন। যেহেতু

নাৎসি বিষ চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমাদের চিন্তায় অনুপ্রবেশ করছিল, প্রতিটি সঠিক চিন্তাই ছিল এক একটি জয়। যেহেতু এক সর্বশক্তিমান পুলিশবাহিনী আমাদের নীরব থাকতে বাধ্য করেছিল, প্রতিটি শব্দোচ্চারণই নীতিঘোষণার মত মহার্ঘ হয়ে উঠত! যেহেতু ওরা আমাদের হন্যে হয়ে শিকার করে বেড়াচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গিই অঙ্গীকারের মত ভারী হয়ে উঠত। আমাদের প্রত্যেকেই ...নিজেকে তখন সেই যন্ত্রণাময় প্রশ্নে তাড়িত করেছে: ওরা আমাকে নির্যাতন করলে, আমি সহ্য করে নিরুত্তর থাকতে পারব তো? এইভাবেই স্বাধীনতার মূল প্রশ্ন উঠেছিল, মানুষ নিজের সম্পর্কে যে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে আমরা তারই খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ মানুষের গোপন রহস্য বলতে তার ইডিপাস কমপ্লেক্স্ বা ইনফিরিঅরিটি কমপ্লেক্স্ বোঝায় না; বোঝায় তার স্বাধীনতার পরিসর, নির্যাতন ও মৃত্যু প্রতিরোধে তার ক্ষমতা।'

এই ভাষণেই সার্ত্র যখন এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির আরেকটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন সার্ত্র-এর প্রাক্‌রাজনৈতিক জীবনদৃষ্টি ও পরবর্তীকালের জীবনদৃষ্টির মধ্যে এক যোগসেতু আবিষ্কার করা যায়। এই ভাষণে সার্ত্র বলেন: 'যাঁরা প্রতিরোধ আন্দোলনে লড়াই করেছিলেন...তাঁরা প্রকাশ্যে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেননি; তাঁরা সর্ব পরিস্থিতিতেই ছিলেন একা; তাঁদের শিকার করা হত, বন্দী করা হত একা, এক এক জন করে। তাঁদের যখন বন্দী করা হত, তখন তাঁরা নির্যাতনের মুখে নগ্ন ও একা। অথচ সেই নৈঃসঙ্গ্যের গভীরে অন্যরাও উপস্থিত, অন্য সকলে যে প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁরা অঙ্গীকার-বদ্ধ তার সমস্ত কমরেড। একটি শব্দের উচ্চারণে কারারুদ্ধ হতে পারে দশজন কিংবা একশো জন। এইই কি সার্বিক দায়িত্বের রূপ নয়, সম্পূর্ণ একাকিত্বে আমাদের স্বাধীনতার উদ্‌ঘাটন নয়?...প্রত্যেক নাগরিক জানতেন তিনি অন্য প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল, আবার এও জানতেন যে তিনি কেবল নিজের উপরই ভরসা রাখতে পারেন। প্রত্যেকই নিজের সম্পূর্ণ একাকিত্বে নিজের ভূমিকা ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। প্রত্যেকেই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে নিজের সত্তায় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন, স্বাধীনভাবে, অব্যর্থভাবে।'

অভিজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্রে আত্মাবিষ্কারের এই দায় একদিকে যেমন অবরুদ্ধ ফ্রান্স্-এর জীবনধারার অন্তর্গত, অন্যদিকে আবার সার্ত্র-এর প্রথম জীবনের গল্প থেকে শুরু করে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের উপন্যাস ও নাটকেরও অন্যতম

প্রধান উপজীব্য। অবরোধের মধ্যেই স্বাধীনতার সত্যকে চিনে নিতে হয়, এই ধারণা সার্ত্র-এর একাধিক সাহিত্য-রচনার নামের মধ্যে, কেন্দ্র পরিস্থিতির মধ্যে আভাসিত—তাঁর গল্পের নাম 'দেয়াল' ('লে ম্যুর'), নাটকের নাম 'নিষ্ক্রমণ নেই' ('উঈ ক্লো')। সার্ত্র্ 'সিচুয়েশন্‌স্'-এ সংকলিত এক প্রবন্ধে লেখেন, প্রত্যেক পরিস্থিতিই এক একটি ফাঁদ, সর্বত্রই দেয়াল।' 'নিষ্ক্রমণ নেই' নাটকের একটি চরিত্র বলে, 'ইঁদুরের মত ফাঁদে বাঁধা পড়েছি।' 'দেয়াল' গল্পে বা, 'ছায়াবিহীন মানুষ' নাটকে কারাগারই পটভূমি। 'শ্রদ্ধাবতী বারাঙ্গনা' এবং 'আলতোনার দণ্ডিত' নাটকেও অবরোধের পটভূমি। 'শ্রদ্ধাবতী বারাঙ্গনা' নাটকে বারাঙ্গনার ঘরে পলাতক নিগ্রো যতক্ষণ আশ্রিত ততক্ষণ আবার বন্দীও বটে। 'আল-তোনা'য় বন্ধ দরজা ও দেয়াল তুলে আটকানো জানালার আড়ালে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ফ্রান্‌ৎস্ অনুরূপ পটভূমি রচনা করে। 'নোংরা হাত' নাটকেও উগো ওলগার আশ্রয়ে তিন ঘণ্টার তিন কড়ারে একাধারে আশ্রিত ও অবরুদ্ধ। প্রথম দিকের গল্পে এই অবরোধের রূপকে ছিল বুর্জোয়া এলীটের ফাঁপা সংস্কারের আত্মরতি, অন্যদের দৃষ্টিতে নিজের ইমেজ তৈরি করে তাকে প্রাণপণে বাঁচাবার চেষ্টায় নিজেকে ঘিরে ভয়, ভাবনা, সংকোচের দেয়াল তুলে তার আত্মনির্বাসনের কলঙ্ক 'অন্যেরাই নরক', অন্যদের বিচারপ্রেরণ দৃষ্টির তাড়নাই সেই নরক যার মধ্যে বুর্জোয়া এলীট স্বেচ্ছানির্বাসিত। জর্মনশাসিত ফ্রানস্-এর প্রতিরোধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় অবরোধের পরিস্থিতি অন্য তাৎপর্য পায়, আমাদের যুগের সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ক্ষমতার মুখে ব্যক্তিচেতনার প্রাণান্ত প্রতিরোধ তথা স্বাধীন আত্মঘোষণার রূপক হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের একাকিত্বের যে সুতীব্র চেতনা এই রূপকান্তরেও কেন্দ্রিত থাকে, তা যে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া এলীটিজম্-এরই রূপান্তর, সে-বোধ সার্ত্র্-কে স্পর্শ করে অনেক পরে। পঞ্চাশের দশকে একাকিত্বের তীব্রতম বোধের মধ্যেই সর্বজনীন সামাজিকবোধের উৎস আবিষ্কার করেই সার্ত্র্ ক্ষান্ত। ১৯৬০-এর 'দি প্রব্‌লেম অফ মেথড্' (ইংরেজি অনুবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩)-এ সার্ত্র্ লেখেন, মানুষ নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ; যে-সব দেয়াল তাকে ঘিরে থাকে তা থেকে সে মুক্তও হয় না, সে যে অবরুদ্ধ সেই বোধও তাকে মুক্তি দেয় না। এই সব দেয়াল মিলে একটি বন্দীশালা তৈরী করে, একটি একক ক্রিয়া হয়ে ওঠে। তার প্রত্যেকটি আত্ম-প্রকাশই রূপান্তরিত হয়, রূপান্তরিত হয়ে চলে, এবং তার রূপান্তরের অভিঘাত পড়ে অন্য সকলের উপরে। ক্রিয়াবিশেষের বহুমাত্রিক এককত্বকে আবিষ্কার

কথাই ক্রিয়ার বহুত্বায়ন ('টোটালাইজেশন') (পৃঃ ১১০-১১)।

১৯৪৫ সালে সার্ত্র্ যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'লে তেঁ মোদার্ন্' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন, পত্রিকার নামকরণ ও উদ্দেশ্য ঘোষণায় সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল্যায়ন ও সেই রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবির ভূমিকা নির্ধারণের লক্ষ্য বোঝা যায়। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতেই সিমোন দ্য বোভোয়া লেখেন, 'রাজনৈতিক স্তরে নিজেকে স্থাপন করার অর্থই হল নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অবস্থান পরিহার করা ; তার অর্থ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাওয়া, ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে পেরিয়ে যাওয়া।' ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে 'তেঁ মোদার্ন্' স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই পত্রিকা ইন্দোচীন যুদ্ধে ফরাসী ভূমিকার প্রতিবাদে মুখর হয়। উপনিবেশবাদবিরোধী, ফরাসী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বিরোধী যে দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, তা এই পত্রিকার পরবর্তী ইতিহাসে অব্যাহত থাকে। কোরিয়ার যুদ্ধ ও আলজিরিয়ার যুদ্ধের সময়ে এই পত্রিকার বামপন্থী ভূমিকা স্পষ্টতর হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিজের দূরত্ব রক্ষায় সার্ত্র্ সচেষ্ট থাকেন। সিমোন দ্য বোভোয়া লেখেন, কমিউনিস্ট পার্টি যে ধরনের মার্কসবাদে বিশ্বাসী, তিনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের মানবিক মাত্রা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। তিনি আশা করেছিলেন কমিউনিস্টরা মানবিকবাদের মূল্যবোধের জন্য খানিকটা সুযোগ রাখবে। তাদেরই কাছ থেকে সংগৃহীত অস্ত্র নিয়ে তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে মানবিকবাদকে ছিনিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, রাজনৈতিক স্তরে কমিউ-নিষ্টদের সমর্থকেরা পার্টির বাইরে থেকে সেই ভূমিকা পালন করবেন যা অন্য যে-কোন পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষ করেন, সমর্থন ও সমালোচনার সমন্বয়ে নির্ধারিত সেই ভূমিকা।' আবার সেই সময়েই সার্ত্র্ সংশয়বিদ্ধ হয়ে লেখেন : 'আমি জানি শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিই মানবমুক্তির একমাত্র পথ : আমি কি শেষ পর্যন্ত সেই অগ্রহণীয় দ্বিধায় এসে পড়লাম : হয় আমি সত্যের নামে নিবিত্ত শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব, নয়তো নিবিত্ত শ্রেণীর নামে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব ?'

এই দ্বিধাসংশয়ই ১৯৪৮ সালে সার্ত্র্‌কে লা রাসঁবল্‌ম দেমোক্রাতিক রেভল্যুশনেয়ার সংগঠনে যোগদানে প্ররোচিত করে। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারিত এক ইশ্‌তেহারে আর ডি আর ঘোষণা করে : 'পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের

জঘন্য জীর্ণদশা, সোশাল ডেমক্রাসির এবং স্তালিনীয় ধাঁচের কমিউনিজম্ এর সীমাবদ্ধতা আমরা মনে করি এর বাইরে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বাধীন মানুষের এক দল স্বাধীনতা ও মানবমর্যাদাকে নতুন প্রাণ দিতে পারে সমাজ-বিপ্লবের আন্দোলনের সঙ্গে ঐ মূল্যগুলির যোগ স্থাপন করে।' নিরপেক্ষ, নীতিবাদী অবস্থান থেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শকে রক্ষা করার যে-কোন প্রয়াস অবধারিত ভাবেই যে পরিণতিকে পৌঁছয়, এই দলটির কার্যকলাপও সেইখানেই পৌঁছে যায়, অর্থাৎ কমিউনিষ্টবিদ্বেষের প্রতিক্রিয়াশীলতার। অকমিউনিস্ট বামপন্থার সঙ্গে এই কামাবাদেরি সার্ত্র্-র-এর বেশিদিন সহ্য হয়নি। বস্তুত আর. ডি. আর-এর বুদ্ধিজীবিচালিত কর্মপদ্ধতির মধ্যেই সার্ত্র্ দেখেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সেই কুট চাল যা গণতন্ত্রের সুবিশাল আদর্শের নির্বস্তুক মায়ায় আচ্ছন্ন করে বামপন্থী আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবীকে আহ্বান করে টেনে আনে, মাকড়সার জালের মধ্যে তারপর তাঁকে ব্যবহার করে বঞ্চিত মানুষের জঙ্গী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অন্তঃসারশূন্য ফর্ম মাত্র। অথচ সেই ফর্মের অচলায়তনের প্রতি অন্ধ অপ্রশ্ন আনুগত্যই এই ধরনের রাজনীতির ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এক বছরের মধ্যেই দেখা যায়, আর. ডি. আর-এর কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ শাণিত হয়ে উঠেছে, মার্কিন রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বছর না ঘুরতেই সার্ত্র্ এই দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৯৫২ সালে 'কমিউনিষ্টরা ও শান্তি' নামে প্রবন্ধে সার্ত্র্ কমিউনিষ্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর অবধার্য ও যথার্থ আত্মপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেন, এবং অংশতও পার্টির বিরোধিতা করাকে নির্বিত্ত শ্রেণীর প্রতি শত্রুতা, মানবিকবাদের প্রতি শত্রুতা, এবং যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদের দালালীর নামান্তর বলে চিহ্নিত করেন। ঐ বছর নভেম্বর মাসে ভিয়েনায় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন।

এক একটি ঘটনায় প্রতিবাদের অভিযান চালানো বা সেই অভিযানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ, এবং এইভাবে প্রতিবাদে প্রতিবাদে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে আহত করার কর্মপন্থা সার্ত্র্-এর রাজনৈতিক কর্মপন্থা হয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশের দশকে। বুদ্ধিজীবীর অস্ত্র বলতে কলমের শক্তি, প্রবন্ধ, বিবৃতি বা 'লে তেঁ মোদার্ন্'-এর সম্পাদকীয় রচনায় উচ্চারিত প্রতিবাদ, সভায় শোভাযাত্রায় যোগদান কিংবা সমবেত বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান। পরে ভিয়েতনামের প্রশ্নে প্রকাশ্য বিচার বা তদন্তও আরেকটি পন্থা গণ্য হয়। আলজিরিয়ার যুদ্ধে ফরাসী ভূমিকার প্রতিবাদে

ইশতেহারে বিলির অপরাধে কারারুদ্ধ সৈনিক অঁরি মারতাঁার মুক্তির দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোজেনবার্গ দম্পতির 'লিগাল লিনচিঙ'-এর তীব্র নিন্দায়, অরি আলেগ নামে ফরাসী সাংবাদিকের উপর ফরাসী সৈনিকদের বর্বর পীড়নের উদ্‌ঘাটন ও নিন্দায়, জামিলা বুপাশা নামে এক আলজিরীয় কিশোরীর উপর অসভ্য নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী ফরাসী অফিসারদের শাস্তিদানের দাবিতে, আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষার অপরাধে ফ্রাঁসিস জঁসঁ-র কারাদণ্ডের প্রতিবাদে যে আন্দোলনগুলির পুরোভাগে সাত্র্‌-কে দেখা যায়, তাতে তাঁর ভূমিকা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া এলীটিজম্‌-এর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই নির্ধারিত। লেখক ও দার্শনিকরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁকে যে সম্মানের স্থান দিয়েছে, তারই সুযোগ গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রশ্নে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, জনমত গঠনে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। ১৯৫৭ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের সমালোচনায় সাত্র্‌ অগ্রণী হলে বুর্জোয়া প্রচার বাহনগুলি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেও ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলেও ১৯৬০ সালে '১২১ জনের ইশতেহারে' তাঁর স্বাক্ষরদান ও স্বাক্ষর সংগ্রহে উদ্যোগ তাঁকে এসট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এলীটিস্ট প্রতিবাদী ভূমিকায় এনে দাঁড় করায়। এই বিখ্যাত ইশতেহারে স্বদেশের সরকারের অন্যায় এবং বিশেষত উপনিবেশবাদী ভূমিকার প্রতিবাদে 'দেশদ্রোহই কর্তব্য' বলে ঘোষণা করে সাত্র্‌ ও তাঁর সহযোগীরা বুর্জোয়া রাজনৈতিক মূল্যবোধ তথা তার দেশানুগ্যকে আঘাত করেন। অন্যায় বিশেষের প্রতিবাদ বা গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতির সমালোচনায় সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে এই প্রথম সাত্র্‌ অন্য এক রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে যান। বুর্জোয়া শ্রেণী প্রভাবিত জনমতও দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের নামে তাঁর বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়। সিমোন দ্য বোভোয়া নিজেকে প্রশ্ন করেন: 'আমি কি আবার কোনদিন এই দেশকে ভালোবাসতে পারব?' প্রচারবাহন ও সংবাদপত্রে এই আন্দোলনের যাবতীয় খবর চেপে দেবার ষড়যন্ত্র, বুর্জোয়া শিক্ষায় সুনিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি থেকে আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে ফরাসী জনসাধারণের উদাসীনতা ও অসমর্থন আন্দোলনকে যখন দুর্বল করে দিতে থাকে, তখন সাত্র্‌ আবার বামপন্থী ঐক্যের চেষ্টায় সচেষ্ট হন এবং যুক্তফ্রন্টে-এর রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্বে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসেন। আলজিরিয়ার যুদ্ধশেষে বা এই আন্দোলনের সময়েই সাত্র্‌ 'ক্ল্যাসিকাল'

বুদ্ধিজীবীদের 'যৌন নিবীর্যতা' সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন (দ্র নিজাঁ-র 'এডেন আরাবি'-র মরণোত্তর প্রকাশের সার্ত্র্ রচিত মুখবন্ধ)। ১৯৬৯ সালের এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র্ বলেন, 'বেল্জিস্টানস আন্দোলন বা আলজিরিয়া যুদ্ধের হিংসাত্মকতার মতো রোম্যানটিক হিংসাত্মকতা নয় অবশ্য। আমাদের খুঁজতে হবে এক র‍্যাশনল ভায়োলেন্স্।'

এই র‍্যাশনল ভায়োলেন্স সার্ত্র্ খুঁকে পান ১৯৬৯ সালের ছাত্র বিদ্রোহে। ততদিন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের আপাত স্বাধীন প্রতিবাদী কলমচির ভূমিকার মূল্যে তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। ১৯৬৯-এর ২৫ ফেব্রুয়ারী ব্রাসেল্স্ ভাষণে সার্ত্র্ বলেন, 'অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে শিক্ষিত বুর্জোয়া-সন্তান। তাঁদের এই সংস্কৃতিরই পোষক ও বাহক গণ্য করা যায়। বস্তুত "জ্ঞানের প্রয়োগবিদদের" মধ্যে অনেকেই নিজাঁ-র বর্ণনামত বুর্জোয়া স্বার্থের প্রহরী কুকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বাকি যাঁরা বৈপ্লবিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত বলে দাবি করেন তাঁরাও এলীট শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ তাঁরা ঐ ভূমিকার জন্যই মনোনীত। এই ব্যক্তিদের প্রতিবাদ করবার অধিকার মেনে নেওয়া হয়, কারণ তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাষাতেই কথা বলেন। ফরাসী আকা-তেমিতে সদস্যপদ বা একটি নোবেল পুরস্কার দিয়ে কিংবা অন্য কোনো কায়দায় এদের সুকৌশলে দলে ফিরিয়ে আনা যায়। তাই আজ দেখা যায়, কমিউনিস্ট লেখক জাতীয় গ্রন্থাগারে স্ত্রীর সঙ্গে পত্রবিনিময়ের প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন, শিক্ষামন্ত্রী সেই প্রদর্শনী উদবোধন করছেন।' ১৯৬৯ সাল থেকে সার্ত্র্ নিজেকে বিবেচনা করেছেন এক বিশেষ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্যতম রূপে—'এই বুদ্ধিজীবীরা বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে কোনো সংলাপ বা সম্পর্কে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন।'

সার্ত্র্ এই বিশ্বাসেই নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন, একাধিক মাওবাদী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছেন, নিষিদ্ধ পত্রিকা রাস্তায় ফেরি করে বেচতে গিয়ে কারাবরণ করেছেন। কিন্তু কার্যত সাহিত্য বর্জন করে ('যদিও আমি চিরকাল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধিতা করেছি, আমার সব রচনাই লেখা হয়েছে এই শ্রেণীরই জন্য এই শ্রেণীরই ভাষায়') গণ-আন্দোলনের কর্মীর ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করেও কি সার্ত্র্ শেষ পর্যন্ত তাঁর এলীটিজ্ম্-এর স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন? ব্রাসেল্স্ ভাষণে মাওবাদী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণকে সার্ত্র্ 'সরকারকে চ্যালেন্জ্' বলে বর্ণনা করেন। ঐ পত্রিকার আর দুজন সম্পাদক তখন কারারুদ্ধ

—'আমি তৃতীয় সম্পাদক। তাই আমাকেও বন্দী করা উচিত। কর্তৃপক্ষ আমাকে বন্দী করলে সেটা হবে রাজনৈতিক মামলা। আমাকে বন্দী না করলে প্রমাণ হয়ে যাবে, বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতী ও শ্রেণী প্রভাবিত।' সার্ত্র্ বন্দী হননি। একবারই এক দিনের জন্য বন্দী হন, দ্য গল তাঁর মুক্তির আদেশ ঘোষণার সময় বলেন, 'ভোলতেয়রকে কেউ বন্দী করে রাখে না।' বুর্জোয়া এলীটিস্‌মকে সার্ত্র্ ভাঙতে পারেননি। রাজনৈতিক জেলচারের রোমান্টিকতা ভাঙার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সার্ত্র্ এলীটিজ্‌ম্‌-এর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যান। এই অন্ত-বিরোধের চেতনাই শেষ পর্যন্ত সার্ত্র্-এর সততার চূড়ান্ত প্রমাণ: 'আমার মধ্যে রয়ে গেছে এক গভীর অন্তর্বিরোধ। আমি এখনও বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যই বই লিখি, আবার ১৯১৯ সালে যে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল এবং আজ যারা আরো ভয়ংকর নিপীড়নের শিকার, তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য অনুভব করি। ...অন্য দিকে আমি যখন ফ্লোবেয়র সম্পর্কে গবেষণা করি, তখন বুর্জোয়া শ্রেণী আমাকে পথভ্রষ্ট মেষশাবক বিবেচনা করে সস্নেহে ঘরে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়।'

প্রথম প্রকাশ—প্রমা / সংখ্যা ৪র্থ / বর্ষ ২য়

জাঁ পল সার্ত্র : অস্তিবাদ ও মার্কসবাদ

ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার

মানুষ হিসেবে সার্ত্র ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তি। অজস্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে নানাধরনের গরমিল সত্ত্বেও তিনি সারাজীবন শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের প্রীতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, নানাভাবে চেষ্টা করেছেন তাদের জীবন সংগ্রামের অংশীদার হতে। ধনিক বণিকের প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন ঘৃণা এবং অবিশ্বাস, শ্রমজীবী মানুষদের অগ্রগতি সম্বন্ধে পোষণ করেছেন সুগভীর আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বাস। এই জাতীয় মানসিকতাই তাঁকে বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও সহানুভূতিশীল করে তুলেছে সাম্যবাদী আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্পর্কে। এই প্রক্রিয়াই তাঁকে ধীরে ধীরে মার্কসবাদ সম্পর্কেও আগ্রহী করে তুলেছে ; এবং 1960 সালে তিনি ঘোষণা করেছেন—আমাদের যুগে মার্কসবাদ এমন একটি দর্শন যার বাইরে আমরা যেতে পারি না, এবং অস্তিবাদ তারই অধীনস্থ একটি মতাদর্শ (ideology)।[১]

কিন্তু এই ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি কোনো দিনই মার্কসবাদকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেন নি। বস্তুত, তিনি চেয়েছেন মার্কসবাদের মধ্যে 'নতুন প্রাণ এবং গতি' সঞ্চারিত করতে। আমরাও বিশ্বাস করি যে মার্কসবাদ চিরকালের মতো সম্পূর্ণ (finished) কোনো একটি 'বেদ' নয় ; বিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণার আলোকে মার্কসবাদকে ক্রম-পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হবে ; তার মৌল গতিশীলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কিন্তু আমরা মনে করি না যে, সার্ত্র তাঁর অস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কসবাদকে কোনোভাবে পূর্ণতর করে তুলতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে,—মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক হৃৎপিণ্ড, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে খণ্ডিত করে তিনি তার প্রাণশক্তিকেই স্তব্ধ করার কাজে হাত লাগিয়েছেন। তিনি ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ববাদকে 'স্বীকার' করে নিয়েছেন ; কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির, দ্বান্দ্বিকতাকে তিনি মেনে নেননি।[২] কেন তাঁর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সেকথা বুঝতে হলে তাঁর মৌল জীবনদর্শন, অস্তিবাদ সম্পর্কে কিছুটা বিশ্লেষণ আগে করে নেওয়া প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

অস্তিবাদী ধ্যানধারণার একেবারে মূলে রয়েছে যুক্তি বুদ্ধি এবং জ্ঞানের বিরুদ্ধে আবেগ এবং অনুভূতির বিদ্রোহ। আমরা দেখতে পাই— যখনই সমাজ জীবনে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি হয়, তখনই একদল আবেগপ্রবণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ বিচ্ছিন্নতা (alienation) এবং হতাশার শিকার হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার গভীরে তলিয়ে যান। তাঁরা সমাজজীবনে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসার কথা চিন্তা করেন না, বরং সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নটিই তাঁদের বেশি আকুল করে তোলে। প্রাচীন গ্রীসের সিনিক এবং সাইরেনাইক দার্শনিকেরা এই জাতীয় মানসিকতার ফলেই গড়ে তুলেছিলেন সংশয় এবং নিঃসঙ্গতার জীবনদর্শন। পরবর্তীকালের রোমান্টিক দার্শনিক এবং শিল্পীসাহিত্যিকেরাও ঐ একই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে—মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন একদিকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এবং আরেকদিকে হেগেলীয় ভাববাদ থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোকে সম্মিলিত করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তি রচনা করছেন অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির আলোকে যখন দুনিয়ার নিছক ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁরা দুনিয়াকে বদলে দেওয়ার সঠিক পথ খুঁজে চলেছেন, ঠিক সেই যুগেই ডেনিস ধর্মীয় দার্শনিক কীর্কেগার্ড হেগেলীয় পরমব্রহ্মবাদের আঁটসাঁট বাঁধুনির মধ্যে দম আটকিয়ে আসছে বলে একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মীয় আবেগ এবং উপলব্ধির জগতে আশ্রয় নিয়েছেন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং অনন্য নির্বাচন (unique choice) ক্ষমতার দাবী তুলে। অস্তিবাদের ইনি এক প্রধান হোতা।

আধুনিক যুগে, হুসার্ল-এর মূলত অতীন্দ্রিয়বাদী (transcendental) অবভাসতত্ত্ব (phenomenology) কে আশ্রয় করে তাঁর শিষ্য মার্টিন হাই-ডেগার অস্তিবাদী ধ্যানধারণাকে তার আধুনিক রূপ দিয়েছেন। সেখানে আমরা পাই নৃ-কেন্দ্রিক (anthrocentric) প্রয়োগবাদ (pragmatism) এর সঙ্গে কান্টির অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এর এক অপূর্ব সম্মেলন। এবং তার পরিণতি—অনন্য ব্যক্তিতা (unique individuality) নিছক ব্যক্তিগত দায়িত্ব (individual responsibility) এবং ব্যক্তির চরম নিঃসঙ্গতা (utter solitariness) সম্পর্কীয় বিচিত্র বক্তব্য। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্তিত্বের

চারিদিক দিয়ে পরম শূন্যতা (nothingness) সম্বন্ধীয় বেদনাদায়ক উপলব্ধি এবং মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতার চেতনা থেকে উৎপন্ন পরম-যন্ত্রণা (anguish)।

জ'াঁ পল সার্ত্র-এর অস্তিবাদ মূলত উপরোক্ত আবেগপ্রবণ যুক্তিবিরোধী মানসিকতা এবং প্রতিন্যাস (attitude) থেকেই গড়ে উঠেছিল অবশ্য তাঁর ধ্যানধারণার ওপর কীর্কেগার্ডের চেয়ে হাইডেগারের প্রভাবই পড়েছে বেশি, যদিও হেগেলীয় প্রভাবও নগণ্য নয়।

॥ ৩ ॥

সমস্ত রকমের 'বিশেষ' অস্তিত্বের সাময়িকতা, অনাবশ্যিকতা (contingency), যুক্তিহীনতা (irrationlity) এবং অতিরিক্ততা (superfinity) সার্ত্র-এর মৌল জীবনদর্শনের একেবারে গোড়ার কথা। এই সব অস্তিত্বের অনাবশ্যিকতা এবং অযৌক্তিকতা (absurdity) সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে উৎপন্ন করেছে বিবমিষা (nausea)। এবং এই বিবমিষা জাতীয় প্রক্ষোভ তাঁর সমগ্র জীবন-দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'বিশেষ'কে তিনি কখনোই সময়ের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি। তাই, নিরীশ্বরবাদী হয়েও, চেতনার বিশ্লেষণে তিনি বহুলাংশে ভাববাদী।[৩]

তাঁর জটিল দর্শনের পরিভাষায় তিনি 'স্ব-মধ্যস্থসত্তা' (being in itself) এবং স্ব জন্য সত্তা' (being for itself)—এই দুধরনের সত্তার মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিক পার্থক্য রচনা করেছেন। আমরা যে রকম বুঝেছি তাতে—স্ব-মধ্যস্থ সত্তাই হল বস্তু এবং স্ব-জন্য সত্তা হল চৈতন্য (consciousness)। তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে—স্ব-মধ্যস্থ সত্তার মধ্যে স্ব-জন্য সত্তা নিহিত নয়; (অর্থাৎ সোজা কথায়—চেতনা বস্তু থেকে আসে না)। তাঁর ভাষায় চেতনা আসে নেতি বা negation-এর মাধ্যমে; সচেতন হওয়ার অর্থই হল নিজের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকে দূরে অবস্থিত থাকা। এই দূরত্ব কোনো সত্তা (being) নয়; এ হল সত্তার নেতিকরণ। সুতরাং, সার্ত্র-এর দর্শনে চেতনা হল একটি মৌলিক (original) এবং অনাবশ্যিক (contingent) ঘটনা।

এই 'চেতনা' যে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দর্শনের 'চেতনা' নয়, তার আরও প্রমাণ

৩। Sartre, Being and Nothingness (Methuen) pp. 92, 112, 120, 271, 521.

আমরা সার্ত্র-এর দর্শনে পেয়ে যাই তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপে : তাঁর মতে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে আমরা সত্তাকে ডিঙিয়ে উল্লম্ফন করি এবং এই প্রক্রিয়ায় আমরা "কিছুই না"-তে পর্যবসিত হই। চেতনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়ে এই 'নেতি'র হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমরা চেষ্টা করি—"স্ব-মধ্যস্থ স্ব-জন্য সত্তা" (being in and for itself) হয়ে ওঠার। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই স্ববিরোধী। তাই আমরা এক অনন্ত অন্বেষণের গোলক-ধাঁধায় পড়ে থাকতে বাধ্য। এবং সেজন্যেই আমাদের চেতনা সব সময়েই ভুগতে থাকে এক চূড়ান্ত বিবমিষায়।

এই বিবমিষা যে আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণারই ফলশ্রুতি তার প্রমাণ পাওয়া যায়—অন্যান্য মানুষের চেতনা সম্পর্কে সার্ত্র-এর বিচিত্র বিশ্লেষণ থেকে : অন্যান্য ব্যক্তিদের ব্যক্তি হিসেবে অনুধাবন করতে হলে তাদের নিছক আমার জ্ঞানের বিষয় (object) বলে গ্রহণ করলে চলে না, তাদের বিষয়ী (subject) হিসেবেও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাদের কাছে বিষয়ে পরিণত হই। আর তার ফলে আমার বিষয়িতা (subjectivity) সীমাবদ্ধ এবং গতিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং অপরের বিষয়িতা (অর্থাৎ তার চৈতন্য) আমার বিষয়িতার (অর্থাৎ আমার চেতনার) কাছে ভীতিপ্রদ হয়েই দেখা দেয়। তাছাড়াও আমার জ্ঞানের বিষয়গুলো যখন অপরের কাছেও জ্ঞানের বিষয় বলে আমি বুঝতে পারি তখন সেই অপর ব্যক্তি হয়ে ওঠে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরোধী। সুতরাং একথা অত্যন্ত স্পষ্ট বলেই মনে হয় যে সার্ত্র-এর মৌল জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তিতে যথার্থ যোগাযোগ এবং সহযোগিতা আদৌ সম্ভব নয়।......

মার্কসীয় দর্শনে চেতনায় এই অস্তিবাদী সংকট এবং ব্যক্তি সত্তার বিচিত্র বিবমিষার কোনো স্থান নেই। কারণ সেই দর্শনে বস্তুজগৎ এবং চেতনার মধ্যে নেই কোনা যান্ত্রিক ব্যবধান : অজৈব জড়বস্তু পরমাণুসমূহের বিশেষ বিশেষ ধরনের সংগঠনের মাধ্যমেই উৎপন্ন হয় জৈববস্তুর বিভিন্ন প্রকার অণু। আর এই সমস্ত জৈব অণুর বিশিষ্ট সংগঠনই উৎপাদন করেছে প্রাণ ; প্রাণ কোনো অতীন্দ্রিয় অতি প্রাকৃত শক্তির প্রকাশ নয়। প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশ নয়। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে একদিকে যেমন রয়েছে বিরোধ, তেমনি আর একদিকে আছে অভিযোজন। প্রাণীবিদ্যা আরও প্রমাণ করেছে—যে প্রাণী যতো বেশি যূথবদ্ধ সেই প্রাণী উত্তরোত্তর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ততো বেশি টিকে থাকতে পেরেছে,

আর যে সমস্ত প্রাণী যতো নিঃসঙ্গ এবং যূথবিরোধী তারা ততো দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অভিব্যক্তির এই বাস্তব ধারাতেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছে ; অভিযোজন প্রক্রিয়ার জটিল দ্বন্দ্বসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো বানর-মানুষের গুরুমস্তিষ্ক পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হয়েছে ; স্বরযন্ত্রের ক্রমবিকাশ তাকে এনে দিয়েছে অনেক বেশি সংখ্যক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা। যেদিন থেকে মানুষ মনুষ্য পদবাচ্য হয়েছে তারও বহু আগে থেকেই মানুষের পূর্ব-পুরুষেরা ছিল যূথবদ্ধ এবং মানুষ তার যূথবদ্ধতা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে। তাই মানবিক চেতনা যেমন ব্যক্তি মানুষের গুরুমস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত, তেমনি তার বিকাশে যূথজীবনের সম্মিলিত জ্ঞানার্জন, যৌথ কর্মোদ্যোগ এবং তারই মাধ্যমে গড়ে ওঠা ভাষার প্রভাবও সুস্পষ্ট। সুতরাং একের চেতনার সঙ্গে অপরের চেতনার কোনো মৌলিক এবং আবশ্যিক বিরোধ নেই। বাস্তবজীবনে যে বিরোধ আসে সে বিরোধ হয় স্থানিক না হয় ঐতিহাসিক।

মার্কসবাদ হল গতিশীল এবং ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমূহের সমন্বয় প্রচেষ্টা আর অস্তিবাদ হল একধরনের অধিবিদ্যা (metaphysics)। সার্ত্র-এর মতো মনীষীর পক্ষেও এই দুয়ের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধানকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। বাস্তব প্রয়োজনে, প্রয়োগবাদী (pragmatic) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি মার্কসবাদ এবং অস্তিবাদের মধ্যে এক ধরনের জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে আধুনিক মার্কসবাদী বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিতে হবে। শরীর বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পাভলভ মানবিক চেতনার যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাখ্যা মার্কস-এঙ্গেলস লেনিনের ব্যাখ্যার বিরোধী আদৌ নয়, বরং তারই ওপর নির্ভর করে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। চেতনা উৎপাদনে গুরুমস্তিষ্কের সংশ্লেষণী বিশ্লেষণী কার্যকলাপের বিশদ ব্যাপারটি মার্কস-এঙ্গেলস-এর সময়ে অজ্ঞাত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা চেতনার ব্যাখ্যায় নিছক সংবেদনবাদী (sensationalist) ছিলেন না। পরবর্তীকালে লেনিন যখন চেতনাকে 'বাস্তবের প্রতিফলন' বলেছিলেন, তখনও তিনি কোনো যান্ত্রিক অর্থে চেতনাকে আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো প্রতিফলিত বলে গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু সার্ত্র-এর কাছে এঙ্গেলস্ বা লেনিন ততোখানি গ্রাহ্য নন, পাভলভ তো

আদৌ নন।[৪] তার চেয়ে মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব (psycho-analysis) সম্পর্কে তিনি বরাবরই বেশী আগ্রহী। অবশ্য তাঁর Being and Nothingness নামক বিশাল গ্রন্থে তিনি অস্তিবাদী মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের ধ্যান-ধারণাই তুলে ধরেছেন। Problem of Method গ্রন্থে তিনি দাবী করেছেন (তাঁর) মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব আদৌ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদবিরোধী নয়।[৫] কিন্তু তিনি যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি—সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি।

॥ ৪ ॥

মার্কসবাদের সঙ্গে সার্ত্রের-এর অস্তিবাদের একমাত্র সাদৃশ্য—নিরীশ্বরবাদের স্বীকৃতি বিষয়ে। কিন্তু সেখানেও নিরীশ্বরবাদ থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা সম্পূর্ণভাবে অস্তিবাদী এবং স্বরূপতঃই মার্কসবাদবিরোধী।

সার্ত্র এর মতে: মানুষ যেহেতু নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন এবং 'বাস্তবে সে যা' তা সে নিজেই সৃষ্টি করেছে, সেহেতু তার ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। অনেকে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেও শাশ্বত ধারণাসমূহের কিংবা বাস্তব মূল্য (objective value) সমূহের একটি জগৎ কল্পনা করে নিয়েছেন। কিন্তু ঐশ্বরিক চেতনা বলে যদি কিছু না থাকে, তাহলে এই জগৎকে ধারণ করার উপযোগী কোনো শক্তিই নেই। সুতরাং স্ববিরোধহীন নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাস করতে হলে বাস্তব মূল্যের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হবে। তাই সার্ত্র বলেছেন—আমাকে গ্রহণ করতেই হবে এমন কোনো বাস্তব মূল্যের অস্তিত্ব জগতে নেই ঠিক যেভাবে আমি নিজেকে গড়ে তুলি, ঠিক সেইভাবেই আমার স্বাধীন নির্বাচন (free choice)-এর মাধ্যমে আমি আমার নিজস্ব মূল্যসমূহ সৃষ্টি করি।

মার্কসবাদের নিরীশ্বরবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং মূলত প্রকৃতিবাদী। মানুষের আত্মচেতনার বিচিত্র বিশ্লেষণের নেতিবাদের মাধ্যমে নিরীশ্বরবাদে পৌঁছানোর কোনো প্রচেষ্টা সেখানে নেই। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও মার্কসবাদ বাস্তব জগৎ এবং মানব সমাজের প্রাক্ অস্তিত্বে সাচ্ছন্দ্যভাবে বিশ্বাসী। তাছাড়াও

৪ "...to fill in the gaps it (contemporary Marxism) has only the absurd psychology of Pavlov."—Problem of Method, p. 83.

৫ Ibid, p. 60.

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—মানুষ কোনো নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার অধীকারী নয়। আবশ্যিকতা সম্পর্কে সচেতনতাই মানবিক স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি (Freedom is the consciousness of necessity)—এই মৌলিক হেগেলীয় বক্তব্য মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং মার্কসবাদীরা বাস্তব মূল্যসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই সমস্ত বাস্তব মূল্য (values) বাস্তব জগতের পরিবেশে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়েছে। কোনো মানুষই একক-ভাবে সমস্ত মানবিক মূল্যকে নিছক চিন্তার সাহায্যে বাতিল করে দিতে পারে না। সামাজিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পরিবর্তন আসে অবশ্যই। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পরিবর্তিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ জীবনের পরিবর্তন বহু মানুষের সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সার্থক হয়ে ওঠে।

সার্ত্র নিজের অস্তিবাদকে মানবতাবাদ (humanism) বলেও দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদ মানুষকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি ; কারণ, তাঁর মতে, মানুষের কোনো সুনির্দিষ্ট স্বরূপ নেই। তিনি যে অর্থে অস্তিবাদ থেকে মানবতাবাদে পদার্পণ করতে চেয়েছেন, সেই অর্থ তাঁর মূল্য সংক্রান্ত বক্তব্যের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত : যেহেতু তিনি স্বীকার করেছেন যে মানুষই সমস্ত মূল্যের স্রষ্টা, সেহেতু তাঁর মতবাদ মানবতাবাদ।[৬]

পক্ষান্তরে, মার্কসীয় মানবতাবাদে মানুষ এবং তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও অগ্রগতি একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। একথা ঠিক—যতোদিন সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে, যতোদিন অনিবার্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমাজকে বারবার আলোড়িত করবে, ততোদিন কোনো অশ্রেণিক বা অতিশ্রেণিক (supra-class) মানবতাবাদের তত্ত্ব মার্কসবাদী চিন্তায় স্থান পেতে পারে না। কিন্তু মার্কস এঙ্গেলস্ একথা বারবার জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে কমিউনিজম্-এর ধারণা ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীর ভেতরকার বিচ্ছেদের ঊর্ধ্বেই অবস্থান করে ; সাম্যবাদী সমাজ যেহেতু শ্রেণীহীন সমাজ হবে সেহেতু সেখানে মানবতাবাদ হবে সর্বজনীন।

॥ ৫ ॥

সার্ত্র-এর অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে কিছুটা বিশ্লেষণ করে এবং পাশাপাশি মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর অস্তিবাদের মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে

৬ Sartre : Existentialism and Humanism, pp 50-51, 54-55.

আলোচনা করে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে—সার্ত্রের-এর পক্ষে মার্কসবাদকে একটা সাধারণ কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করার দাবীও নিতান্তই অর্থহীন। বস্তুত বার্ট্রাণ্ড রাসেল মার্কস্‌বাদ বিরোধী হয়েও তাঁর সুবিখ্যাত History of Western Philosophy গ্রন্থ রচনায় মার্কসীয় ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাকে যেটুকু কাজে লাগিয়েছেন, সার্ত্রের তাঁর শেষ দিকের রচনাগুলিতে তার বেশি কিছু করেছেন বলে আমাদের মনে হয় নি। তিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যার বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসীয় ইতিহাস তত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন, বহু সমালোচনার জালে জড়িয়ে; কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে তিনি সরাসরি বর্জন করেছেন অধিবিদ্যা (metaphysics) আখ্যা দিয়ে। অথচ আমরা জানি—দ্বা ক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদের প্রাণকেন্দ্র এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তারই সম্প্রসারণ মাত্র।

সার্ত্রের-এর মূল বক্তব্য হল : ইতিহাস এবং মানবিক জ্ঞানের বিশ্লেষণে দ্বন্দ্ববাদ প্রয়োগ করা চলতে পারে, কারণ তারা মানুষের দ্বারা উৎপন্ন এবং তাদের বিকাশের সঙ্গে মানুষেরাই জড়িয়ে আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রাহ্য, কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নয়। দ্বন্দ্ববাদ (dialectics) ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্য, কিন্তু মানবিক ক্রিয়াকর্মের বাইরে দ্বন্দ্ববাদের কোনো পদক্ষেপ চলতে পারে না। অনৈতিহাসিক এবং অ-মানবিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক নিয়মকানুনের প্রয়োগ অযৌক্তিক এবং বেআইনি (illegitimate)। সার্ত্রের তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন।

প্রথমত, দ্বন্দ্ববাদ এমন সমস্ত ব স্তব সামগ্রিকতা নিয়ে কাজ করতে পারে, যেগুলো মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তোলে। কিন্তু প্রকৃতি একটি সুশৃঙ্খল সামগ্রিক ব্যাপার নয়। প্রকৃতির মধ্যে আমরা শুধু পাই এমন সব বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা যাদের মধ্যে কোনো আভ্যন্তরীণ ঐক্য নেই, নেই কোনো সার্বিক এবং আবশ্যিক পারস্পরিক যোগাযোগ। সুতরাং প্রকৃতির অনৈক্যই আমাদের বাধা দেয় তার ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে কোনো সার্বিক (universal) দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে।

দ্বিতীয়ত, সার্ত্র-এর মতে—যে সমস্ত বিরোধ (contradiction) ইতিহাসের অভ্যন্তরে কাজ করে, তারা প্রকৃতির ভেতরকার বিভিন্ন প্রকার বিরোধের সঙ্গে মেলে না। সামাজিক বিরোধগুলির ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যস্থতা (mediation)-এর মাধ্যমে বিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে পারস্পরিক আরোপণ (conditioning) এবং আঙ্গিক মিথস্ক্রিয়া (organic interaction) দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু,

ভৌত রাসায়নিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে এ ধরনের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিছক বস্তু (practico-inert) হল বিচ্ছিন্ন আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা। সুতরাং সেখানে কোনো দ্বন্দ্বমূলক গতির সম্ভাবনা নেই।

তৃতীয়ত, সার্ত্র-এর বিশ্লেষণে—সমাজ এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, এবং তারা সত্যিই যেরকম তাদের আমরা সে রকম ভাবেই জানতে পারি। কারণ—তারা মানুষেরই কাজের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্যাপার, মানুষের সিদ্ধান্ত এবং কর্মেরই তারা ফলশ্রুতি। এক্ষেত্রে জ্ঞাতা এবং পরিস্থিতির ভেতরকার বিরুদ্ধতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া (contradictory interplay)-এর মাধ্যমেই সমাজ ও ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক সংযোগগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভৌত (physical) ঘটনাপ্রবাহ আমদের বাইরের ব্যাপার। আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে তারা অস্বচ্ছ (opaque)। তাই আমরা তাদের যথার্থ আন্তরস্বরূপে প্রবেশ করতে পারি না এবং তাদের সারমর্ম অনুধাবন করতে আমরা অক্ষম।

অর্থাৎ, সার্ত্র-এর মোদ্দা কথা হল : প্রকৃতির মধ্যে যেহেতু কোনো ঐক্য নেই, যেহেতু তার মধ্যে কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য বিরোধ নেই (!), যেহেতু প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয়ভাবে আমাদের বহিঃস্থ সত্তা—সুতরাং প্রকৃতি অবশ্যই অদ্বান্দ্বিক। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অস্তিবাদী সার্ত্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ সম্পর্কে তার শেষ কথা বলতে গিয়ে প্রত্যক্ষবাদ (positivism)-এর খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।

অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে আদৌ দ্বন্দ্বমুক্ত নন। তিনি মানব-সমাজ এবং মানুষের ইতিহাসের মধ্যে দ্বান্দ্বিক চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেও শেষ পর্যন্ত সজীব বস্তু বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বিকাশ স্বীকার করেছেন।[৭] কিন্তু তিনি একথা খেয়াল করেন নি যে—প্রাক্ মানুষ পর্যায়ে বিরোধী শক্তিসমূহের ঐক্য (unity of opposites), নেতির নেতি (negation of the negation) এবং পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব (change of quantity into quality)-এর মাধ্যমে সমগ্রীকরণ (totalization)-এর তত্ত্ব মেনে নিলে, তাকে আর জীববিদ্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায়

৭. Sartre : Search for a Method (Quoted by W. F. Warcle. op. cit.)

না; শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির অন্যান্য অংশের দ্বান্দ্বিক বিকাশের কথাও স্বীকার করতে হয়।

॥ ৬ ॥

মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—বিশ্ব-প্রকৃতি একটি সমগ্র সত্তা, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বিভাগ বা খণ্ড। বিশ্বসত্তা বাস্তব, এবং দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে বিধৃত। বিভিন্ন অস্তিত্ব-স্তরের অসীম প্রবাহের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সামগ্রিক ঐক্যই প্রকাশিত হচ্ছে। যে সমস্ত বিশিষ্ট সত্তার এলাকা মহাবিশ্বকে 'গড়ে তুলেছে', তারা সকলেই সসীম এবং তারা বিশ্বসমগ্রের এক একটি সীমাবদ্ধ দিকই প্রকাশ করে মাত্র। স্বরূপত, প্রকৃতি অন্তহীন এবং নিঃশেষ। বিশ্বপ্রকৃতি ক্রমাগত নতুন নতুন অস্তিত্বের ক্ষেত্র, নতুন নতুন গুণাবলী এবং নিত্য নতুন 'প্রকার' (modes) অভিব্যক্ত করে চলেছে। প্রকৃতি যা ছিল যে অবস্থায় আছে এবং যা হয়ে উঠতে পারে—এদের কোনোটির ক্ষেত্রেই কোনো সীমারেখা নেই। নীতিগতভাবে, প্রকৃতির মধ্যে নেই কোনো অবিভাজ্য বা অপরিবর্তনীয় মৌলের অস্তিত্ব। বিজ্ঞানের বহুমুখী অভিযান বারে বারে সেই কথাই প্রমাণ করে চলেছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এবং চলমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কৃতি একথা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে—প্রকৃতির মধ্যে আর তারই অধীনস্থ মানবিক ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের সমগ্রতা (totalities)। এরা প্রত্যেকেই সসীম এবং সাপেক্ষ (relative)। কিন্তু তারা কেউই প্রকৃতির সামগ্রিক ঐক্যকে বাতিল করে না, বরং তারা সেই নিঃসীম সমগ্রতাকেই সপ্রমাণ করে বিভিন্নভাবে।

প্রকৃতির বাস্তব ঐক্য শুধু তার সাংগঠনিক উপাদানগুলির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না; প্রাকৃতিক বিকাশের বিভিন্ন ধারা এবং বিভিন্ন 'প্রকারের' মধ্যে দিয়েও এই বাস্তব ঐক্যই প্রকাশমান। বিকাশের এই ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়াই দ্বান্দ্বিক ব্যখ্যার সার্বিকতার প্রকৃত ভিত্তি। কারণ এই ব্যখ্যায় একথাই বলা হয় যে—বিশ্বের সমস্ত কিছুই কোনো না কোনো ভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত এবং অন্যোন্য-ক্রিয়াশীল (interactive); বিশ্বের সমস্ত অস্তিত্বই নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল; এবং প্রকৃতির ভেতরকার বিরোধী শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বই সকল গতি এবং পরিবর্তনের জনক।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সব কিছুই অন্য সব কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত—একথা দাবী করার অর্থ এই নয় যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট সংগঠনের এবং বহুবিধ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রীর

কোনো আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বয়ংক্রিয়তা অনস্তিত্বশীল। কিন্তু, একটি বিশেষ অস্তিত্বের 'বিচ্ছিন্নতা' ও স্বাতন্ত্র্য এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিষ থেকে তার গুণগত পার্থক্য স্থান-কালের একটি 'বিশেষ' জায়গায় এসে ভেঙে পড়ে : যতোক্ষণ পর্যন্ত তার ভেতরকার বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার সমগ্রতা স্থিতিশীল এবং তার গতিপ্রকৃতির মধ্যে একটা ঐক্যতান অস্তিত্বশীল। কিন্তু এই অবস্থা অপরিবর্তনীয় নয়। বিশেষ সমগ্রটির স্বরূপগত চরিত্র অনুসারে, দ্রুত কিংবা বিলম্বিত লয়ে—সমগ্র অস্তিত্বটির আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন এবং পারিপার্শ্বিকের অপরাপর প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের মিথষ্ক্রিয়া (interaction) অস্তিত্বশীল ভারসাম্যকে বিচলিত করে এবং উৎপাদন করে অস্থিতিশীলতা। তার ফলে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জোরালো সংগঠনও ভেঙে পড়ে নতুন নতুন সামগ্রিকতার জন্ম দেয়। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার সার্বিক আন্তঃসম্পর্ক (interconnection)—এর মধ্যে দিয়ে তাদের বিকাশের সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে যে সুবিপুল পরিবর্তনের 'খেলা' চলেছে নিরন্তর—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মূলত সেই পরিবর্তনকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করার উপযোগী সবচেয়ে সুশৃঙ্খল চিন্তাপ্রণালী।…

জাঁ পল সার্তর্ যে শুধু প্রকৃতির ঐক্যকেই মানতে অস্বীকার করেছেন তাই নয়; তিনি প্রকৃতি এবং মানবীয় ইতিহাসের মধ্যে খাড়া করেছেন এক অভেদ্য প্রাচীর। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহকে সম্মিলিত করলে দেখা যাবে যে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানব সমাজের ইতিহাসের মধ্যে কোনো যান্ত্রিক ব্যবধান বা বিচ্ছিন্নতা নেই। নৃকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা, ভাববাদী চৈতন্যবাদ এবং আবেগপ্রসূত বিহ্বলতার ভিত্তিতেই সার্তর্ এবং তাঁর সমগোত্রীয় দার্শনিকেরা প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনা করেছেন!

মার্কসবাদ বিশ্বাস করে যে প্রকৃতির মধ্যে অস্তিত্ব (being) এবং বিকাশ (becoming)-এর এমন কতকগুলি সার্বিক সূত্র আছে, যেগুলি বাস্তব জগতের বিভিন্ন অভেদ (indentity) এবং প্রভেদ (difference)-কে গড়ে তোলে, যাদের মাধ্যমেই একদিকে স্থিতিশীলতা এবং আর একদিকে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই সূত্রগুলি প্রকৃতির সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—মানুষ এবং তার সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের সমাজ বিবর্তন এবং তার চিন্তার ধারায় মূলত একই দ্বন্দ্বমূলক প্রাকৃত নিয়মাবলী কার্যকর। এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল : বিপরীত শক্তিসমূহের পারস্পরিক

অন্তঃপ্রবেশ (interpenetation of opposites), পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব (change of quantity into quality)। নেতির নেতি (negation of the negation), আধার এবং আধেয়ের দ্বন্দ্ব (conflict of form and content) প্রভৃতি। যেহেতু এরা বাস্তব জগতের স্বরূপে নিহিত, সেহেতু—যেমন প্রকৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনি মানব সমাজের ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবেই প্রযোজ্য।

বিশ্বের প্রতিটি 'সমগ্রতার মধ্যেই রয়েছে বিরোধ (contradiction)-এর অস্তিত্ব : প্রতিটি সত্তার ভেতরেই রয়েছে এমন সব বিরোধী শক্তি যারা আবশ্যিক-ভাবেই বিপরীত দিকাভিমুখে বিবর্তিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট স্থান-কালের গণ্ডির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সমগ্রতার অস্তিত্ব সম্ভব হয় এই কারণেই যে সাময়িক-ভাবে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের ঐক্য সংস্থাপিত হয়ে থাকে। এই ঐক্যের আসল রহস্য হল (সাধারণত) একটি শক্তির দ্বারা তার বিরোধী শক্তির নেতিকরণ (negation)। কিন্তু সামগ্রিক বিকাশ এবং পরিবর্তনের ধারায় এই নেতিকরণ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। অন্যান্য শক্তির অনুপ্রবেশে এবং নিজস্ব বিকাশের মাধ্যমে 'নাকচ হয়ে যাওয়া' শক্তিটি পরিমাণগতভাবে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ঘটে একটা আকস্মিক পরিবর্তন গুণগতভাবে নতুন পরিস্থিতির অভ্যুদয়। এইভাবেই প্রাক্তন নেতিকরণেরও নেতিকরণ ঘটে। অবশ্য এই প্রক্রিয়ার যে নতুন সমগ্রতা বা 'ব্যাপার (phenamenon)-এর উদ্ভব হয়—তার মধ্যেও থাকে নতুন ধরনের বিরোধ। সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সরলীকৃত আকারে এই হল দ্বান্দ্বিক বিকাশের গতিপথ।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি বিশ্লেষিত নানা ব্যবস্থা বা অবস্থার স্ববিরোধী গুণাবলী প্রমাণ করেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একই সময়ে একই সঙ্গে—সরলতা এবং জটিলতা, (স্থিতির) জাড্য (inertia) এবং প্রচণ্ড গতির অবস্থান দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যে টেবিলটির ওপর আমি লিখছি সেটি অবশ্যই 'সমগ্রতা' এবং আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল এবং সুস্থির। কিন্তু ভৌত রাসায়নিক বিশ্লেষণ অনুসারে তার মধ্যে রয়েছে এমন সমস্ত অণু (molecule) যারা অত্যন্ত জটিল এবং প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। বিশ্লেষণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে যে, এই সমস্ত অণুর গঠনে রয়েছে আরও জটিল এবং আরও গতিশীল অজস্র পরমাণু (atom)। পরমাণুগুলোকে ভাঙলে পাওয়া যাবে ইলেকট্রন,

প্রোটন প্রভৃতি তথাকথিত 'মৌল কণা' (elementary particle)। কিন্তু আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে যে, এদের মধ্যেও রয়েছে অত্যন্ত জটিল এবং গতিশীল অভ্যন্তরীণ সংগঠন।

জীবনবিজ্ঞানসমূহের আধুনিকতম গবেষণাও প্রকৃতির ভেতরকার দ্বান্দ্বিকতাকে প্রমাণিত করে চলেছে। সেখানেও আমরা দেখতে পাই : বিরোধের মাধ্যমেই পুরাতন থেকে নবীনের অভিব্যক্তি—প্রাক্তন সত্তার অপরিহার্য গুণাবলীকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নাকচ করে এবং তার পুনর্গঠিত মৌলগুলিতে উচ্চতর (synthesis)-এর মধ্যে আত্মীকরণ করেই জন্ম নেয় নতুন সত্তা, নবতর অবস্থা। অভিব্যক্তির ধারায় এক একটি সীমা-পরিস্থিতিতে এসে একটি গুণগত অবস্থা থেকে উল্লম্ফন ঘটে আর একটি গুণগত অবস্থায়, কিন্তু তার আগে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে পরিমাণগত পরিবর্তন। জৈব-রসায়নবিদেরা আজকে দিনে তাঁদের তত্ত্ব এবং কর্মের মাধ্যমে সেই দ্বন্দ্ব সমন্বয় পরম্পরা খুঁজে চলেছেন, যার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রথম সপ্রাণ জৈব রাসায়নিক সমগ্রতা উৎপন্ন করেছিল। এবং এ কাজে তাঁরা বহুলাংশে সফলও হয়েছেন।

তাঁদের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলোকে সমন্বিত করে আমরা দাবী করতে পারি যে, মার্কস্ এঙ্গেলস্ তৎকালীন বিধানের ওপর নির্ভর করে দ্বান্দ্বিক চিন্তার প্রয়োগে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত আজকের দিনে আরও বিস্তারিত, আরও উন্নত আকারে সপ্রমাণ হয়েছে : অজৈব থেকেই জৈবের উৎপত্তি এবং জৈব সংগঠনের বিশেষ পর্যায়ে প্রাণের উদ্ভবের কথা আজ আর আধিবিদ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রেও দ্বান্দ্বিক বলিষ্ঠতাই প্রমাণিত হয়।

সার্ত্র বহুলাংশে আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান (formal logic)-এর গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই বিশ্বব্যাপী দ্বান্দ্বিকতার এই উজ্জ্বলতম নিদর্শনও তাঁর 'নজর এড়িয়ে গিয়েছে।' মূলত আজও অ্যারিস্টটলপন্থী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল বিমূর্ত এবং সরল "অভেদ সংক্রান্ত সূত্র" : ক=ক। স্থিতিশীল পর্যায়ে এ সূত্রের মূল্য আছে; কিন্তু এই একপেশে সূত্র এবং তৎসহ "বিরোধ সংক্রান্ত সূত্র" ('ক' কখনোই একই সঙ্গে 'খ' এবং 'না-খ' হতে পারে না) বাস্তব জগতের গতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম : নেতিকরণের মাধ্যমে বস্তুর একটি অবস্থা থেকে তার বিপরীত অবস্থার পরিবর্তন (এ ক্ষেত্রে প্রাণহীন বস্তু থেকে প্রাণের উদ্ভব) আকারগত যুক্তিবিদ্যার গণ্ডী ব্যাখ্যার অতীত। কারণ বাস্তব পার্থক্য এবং তারই চূড়ান্ত রূপ, 'বিরোধ', এই যুক্তিবিদ্যার সূত্র-

বহির্ভূত ! কিন্তু 'বিরোধী শক্তিসমূহের সমন্বয়ের সূত্র' (ক=না-ক) বাস্তব প্রকৃতির বিরোধকে পরিষ্কারভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে দেয়। মূর্ত বিরোধিতার সূত্র (law of concrete contradiction) দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিজ্ঞানের একটি জবরদস্ত খুঁটি। এবং অপ্রাণী থেকে প্রাণের উদ্ভব এই সূত্রকে প্রাকৃতিক বিকাশের বাস্তব ক্ষেত্রেই সপ্রমাণ করে।

॥ ৭ ॥

সার্ত্র্ আপত্তি তুলেছেন যে প্রকৃতি যেহেতু মানুষের হাতের কাজ নয়, সেজন্যে আমরা তার অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করতে অক্ষম। এ আপত্তি যে বিজ্ঞানীবিরোধী রহস্যবাদী বক্তব্য তা বলাই বাহুল্য মাত্র। ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগ, প্রকৃতির ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নিশ্চয়ই সে ধরনের নয়। কিন্তু তাই বলে কান্টির অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)-কে নতুন পোষাকে সাজিয়ে দর্শনের জগতে আমদানি করার কি সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে ? আমরা তা মনে করি না।

বিজ্ঞানের সমূহ অগ্রগতি প্রমাণ করেছে যে মানুষের জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টা হাত ধরাধরি করে চলতে চলতে প্রকৃতির বহু ঘটনার প্রকৃত গুণাবলী এবং তাদের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন সম্পর্কের ব্যাপারে প্রচুর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। একথা অস্বীকার করার অর্থ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব সমাজের অগ্রগতির বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা। সার্ত্র্ মানব সমাজের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্ববাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন ; কিন্তু সমাজ বিকাশের ধারায় বিজ্ঞানের অবদানের কথা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। যে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার মধ্যে দিয়েই মানব সমাজ এগিয়েছে, সেই প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়মকানুন আমরা, মানুষেরা, যদি নাই জানতে পেরে থাকি, তাহলে তার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা কি করে সম্ভব হল ? সার্ত্র্ এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি।

পক্ষান্তরে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন প্রকৃত স্বরূপত (in itself) যা তার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণাগুলো যে মিলছে, সে সম্পর্কে আমরা কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারি ? এ প্রশ্ন দর্শনের জগতে আদৌ নতুন নয়। কান্টের মতোই সার্ত্র্ আগে থেকে ধরে নিয়েছেন যে প্রকৃত জগৎ আমাদের জ্ঞানের কাছে অভেদ্য (impenetrable)। তাই তিনি মার্কসবাদকে খণ্ডিত করতে এক আবেগবিহ্বল অজ্ঞেয়বাদের সৃষ্টি করেছেন।

মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ওপর সার্তর-এর খুব বেশি আস্থা না থাকলেও আমরা সেই জ্ঞানতত্ত্বকে যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত এবং গতিশীল (dynamic) বলে মনে করি। তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি : জ্ঞাতা (subject) এবং জ্ঞেয় (object)-এর মধ্যে, মানবিক জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টা এবং বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে, যে সম্পর্ক তা কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বচ্ছ (opaque) থাকতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব এবং কর্মের সম্মিলিত প্রয়াসে সেই অস্বচ্ছতা ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গিয়ে প্রাকৃত রহস্যের মর্ম আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাস্তব জগতের বিভিন্ন বস্তু আসলে যা তা যে আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সব বস্তুর সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে সৌর-রশ্মি পর্যন্ত বিভিন্ন বাস্তব জিনিষকে আমরা নাড়াচাড়া করি—গবেষণাগারে এবং তারও বাইরে ; সামাজিক প্রয়োজনে, অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যাপারকে পরিচালনাও করি সার্থকভাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কর্মের মাধ্যমে যখন আমরা প্রকৃতির কোনো ব্যাপার সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (hypothesis) রচনা করে আবার কর্মের মাধ্যমে তাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাই, তখন আমরা—হয় ইতিবাচক না হয় নেতিবাচক যে কোনো একটা সাড়া পাই প্রকৃতির কাছ থেকে। হয় আমাদের ধারণা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে, না হয় মেলে না। কিন্তু এই দুরকমের প্রতিক্রিয়াই প্রকৃতির গঠন এবং কর্মপ্রণালী বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তারা শুধু বাস্তব জগতের গতিবিধি নয়, তার অভ্যন্তরীণ সংগঠনকেও আমাদের সামনে তুলে ধরে।...

মার্কসবাদ বিশ্বাস করে যে, মানবিক জ্ঞান বাস্তব সত্তারই প্রতিফলন। সার্তর একথা মানতে অস্বীকার করেছেন। বস্তুত 'প্রতিফলন' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। মার্কসীয় চিন্তাধারায়—ঐ 'প্রতিফলন' শব্দটির অর্থ এই নয় যে, জ্ঞান ব্যাপারটি একটি নিষ্ক্রিয় ঘটনা ; আয়নায় বস্তুর যেরকম প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে, জ্ঞান বাস্তব জগতের সে জাতীয় নিশ্চল এক নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্ব নয়। জ্ঞাতবস্তু সম্পর্কে ধারণা বা প্রত্যয় (conception) গঠনের প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি জটিল এবং সক্রিয়। জীবন যাত্রার প্রয়োজনে, বহুবিধ কর্মের মাধ্যমে মানুষেরা বিভিন্ন ধারণা এবং প্রকল্প গঠন করে। তারপর সেগুলোকে যাচাই করে নেওয়ার জন্যে আবার বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাছাড়াও, মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব 'বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদ' বা

ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ (emprícism) নয়। তার কাছে মানুষের জ্ঞান, বাস্তব জগতের সঙ্গে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি মানুষের সাংবেদনিক প্রতিক্রিয়া এবং সংযোগের ওপরেই শুধু নির্ভর করে না। মানবিক জ্ঞানসম্ভার অপরিহার্যভাবেই ঐতিহাসিক, সমাজবিকাশের ধারায়—বহু পরীক্ষা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে মানবিক জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। একদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষ নিজেকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে, আর এক দিকে প্রকৃতির মধ্যেও নিয়ে এসেছে অজস্র পরিবর্তন।

প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেই একই ব্যাপার আমরা দেখতে পাই। সার্ত্র-এর অভিযোগ মাফিক দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যাকে একটি প্রাক্ শর্ত হিসেবে জোর করে প্রকৃতির ওপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। প্রকৃতিকে জানার প্রচেষ্টায় যুগ যুগ ধরে গড়ে-ওঠা প্রামান্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহকে সমন্বিত করে, অজস্র বাস্তব অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল-সুসমঞ্জস বর্ণনার ওপর নির্ভর করেই প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা উৎপাদিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মার্কস্-এঙ্গেলস্—হেরাক্লিটাস থেকে আরম্ভ করে হেগেল পর্যন্ত সমস্ত সমালোচনামূলক চিন্তার সার সংকলন করেছেন। তাই অন্যান্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বও চিন্তার গতিশীল হাতিয়ার। প্রকৃতি থেকেই তার জন্ম, প্রকৃতির নিত্য নূতন ক্ষেত্রকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করাই তার কাজ।

প্রথম প্রকাশ—মানবমন / অক্টোবর / ১৯৮০

অস্তিত্ববাদের ভূমিকা ঃ সার্ত্র

ডঃ তুষার নিয়োগী

[প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে সার্ত্র এবং অস্তিত্ববাদ প্রায় সমার্থক। নিঃসন্দেহে সার্ত্র অস্তিত্ববাদী চিন্তাজীবীদের অন্যতম প্রবক্তা কিন্তু একমাত্র নন। সার্ত্র-র বহুল পরিচিতির অন্যতম কারণ তিনি একাধারে তাত্ত্বিক ও রূপকার এবং রাজনীতির, যা প্রচারের সুযোগ্য মাধ্যম, পাদপ্রদীপে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বর্তমান সংকলনের কেন্দ্রভূমিতে সার্ত্র-ই যেহেতু একচ্ছত্র, সে হিসাবে সমস্ত লেখাই সার্ত্র-কেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বক্ষমাণ প্রবন্ধে লেখক সার্ত্র-কে নিয়ে ভাবতে গিয়ে অস্তিত্ববাদ দর্শনের 'সামান্য ধারণা' সম্পর্কে পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কারণ লেখকের চিন্তায় অস্তিত্ববাদের ভূমিকায় সার্ত্র অনেক বেশী অর্থবহ এবং অস্তিত্ববাদ-ই মুখ্য বিষয় হওয়ায় সার্ত্র-র পাশাপাশি অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদেরও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে। স্থান-অসংকুলানের আশংকায় বারান্তরে কেবল-সার্ত্র বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

আলোচ্য প্রবন্ধটি কোনোভাবেই লেখকের মৌলিক চিন্তার ফসল নয়। অস্তিত্ববাদ এবং সার্ত্র সম্পর্কিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন লেখা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যে তথ্য, চিন্তা ও যুক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলিকে পারস্পরিক সম্পর্কে সন্নিবিষ্ট করার সচেতন প্রয়াস মাত্র এই লেখায় প্রতিফলিত। ন্যূনকল্পে, দুটি গ্রন্থের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করতেই হয়,

দার্শনিক চিন্তার বিবর্তনের ধারায় অস্তিত্ববাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের ঘটনাবর্তের মধ্যেই অস্তিত্ববাদী ভাবনার বীজ উপ্ত। ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখা যায় :

(ক) বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং দার্শনিক জগতে কান্ট-হেগেলের চিন্তা-ভাবনার প্রতিপত্তি (খ) খ্রীষ্টধর্ম সংশ্লিষ্ট ভাবপরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে ভাবজাগরণের আভাস (গ) উন্নয়নমুখী সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংকট—সমষ্টির জটিলতায় ব্যক্তির সংশয়, অসহায়ত্ব ও একাকীত্ব।

সাধারণভাবে বলা চলে যে কান্ট-হেগেলীয় ভাবনার ঐতিহ্যে একদিকে ছিল জ্ঞান-বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞেয় সম্পর্কের সন্ধান এবং অন্যদিকে ছিল পরম সত্তার (absolute) সঙ্গে জ্ঞান-বিষয়ের একীকরণের ঝোঁক—কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই জ্ঞাতার পক্ষে অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধি ছিল না। পক্ষান্তরে দৃষ্টবাদীরা (positivist) বাস্তব-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর-ই (empirical knowledge) সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—অধিবিদ্যা (metaphysics) সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলিকে প্রায় তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁরা নিজেদের ধারণাগুলিকে ব্যক্ত করতেন ; চিন্তন ও মানসের প্রক্রিয়া ও মনোজগতকে তাঁরা বস্তুজগতের নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতেন। যুগের এই জাতীয় বৈপরীত্যমূলক চিন্তাধারা থেকে নিষ্ক্রমণের দায় অনুভব করা গিয়েছিল—প্রয়োজন হয়েছিল অতীন্দ্রিয় অরূপতা থেকে অস্তিত্বমুখী বাস্তবতায় মুখ ফেরানর যা চেতনা ও বাস্তবের মধ্যে গ্রহণযোগ্য সমন্বয় সাধন করতে পারে। মানবিক পরিমণ্ডলের দিকে তাকাতে গেলে ধর্মীয় ভাবপরিমণ্ডলের দিকে নজর রাখতে হয়। খ্রীষ্টধর্ম সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসের ভিতে লাগল নানা প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাত। কট্টর খ্রীষ্টবাদীদের একগুঁয়েমীর জবাবে ঘোষিত হতে থাকে সংশয়, সন্দেহের প্রশ্নবাণ—ছিদ্রান্বেষী দর্শন, বাইবেলীয় সমালোচনা এবং ক্রমাগ্রসরমাণ বিজ্ঞান-চিন্তার মধ্যেই ছিল এই সংশয়-সন্দেহের বীজ। যে ভাবেই হোক না কেন, ধর্মভীরুদের আত্ম-সান্ত্বনা ও ধর্মবিরোধীদের ফরিয়াদী উচ্ছ্বাসের মধ্যে গোটা খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারটা এক ধরনের কুজ্ঝটিকায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যার মধ্য থেকে চিন্তাশীল মন মননের

খোরাক পাচ্ছিল না, পাচ্ছিল না যুক্তি-প্রত্যয়ের সূত্রাবলীর যোগাযোগ-গ্রন্থি। বিশ্বাসের অনড় ভিতে ধাক্কা লেগে ধর্মীয় পরিস্থিতিতে সৃষ্ট হয়েছিল এক ধরনের শূন্যতা, যার থেকে অব্যাহতির উপায় খোঁজার দায়কে স্বীকৃতি জানাতে এক শ্রেণীর চিন্তাজীবীরা অন্যতর দার্শনিক প্রত্যয়ের সন্ধানে তৎপর হলেন যা ক্রমে অস্তিত্ববাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচনা করল।

অস্তিত্বের সংকট থেকে উৎসারিত প্রশ্নগুলি চিন্তন ও মনন প্রক্রিয়ায় অর্থময় সামঞ্জস্য লাভ ক'রে অস্তিত্ববাদী দর্শনে পরিণত হয়েছে। ভাবনায় সূত্রগুলি ব্যাপকতর পরিমণ্ডল থেকে সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। কোনো একটি বিশেষ ভাবনার মধ্যে যেমন অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, অস্তিত্ববাদকেও তেমনি কোনো একটি বিশেষ ভাবনার বা চিন্তার ঋজুরেখায় চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বিচিত্র ভাবানুষঙ্গের আশ্চর্য সহাবস্থান—সাদৃশ্যের সামান্য লক্ষণ আপাত-দৃষ্টিতে প্রায় নেই বললেই চলে, তবু যেন কোথায় একটা অন্তর্নিহিত প্রশ্নের যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে এদের সাদৃশ্য বোঝা যায়। সেই যোগসূত্র হচ্ছে : মানুষের প্রশ্নাকুল সত্তার অন্বেষণ প্রবণতা ; অন্বেষণ মানবিক অস্তিত্বের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে। ঐতিহ্যলালিত মূল্যবোধগুলি ক্রমিক অবক্ষয়ের মধ্যে একদিকে অনু-শাসনের বোঝা ঘাড়ে তুলে নেওয়ার প্রবণতা অন্যদিকে বিকল্প সন্ধানের পাথেয় হিসাবে সাম্যভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া, একদিকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান চেতনাকে সর্বোত্তম প্রায়োগিক সাফল্যে নিয়োগ করার স্বপ্ন অন্যদিকে যন্ত্র-দানবের দুর্বার উন্মত্ত অভিযানে মানসিক শংকা ও অস্বস্তি, একদিকে শ্রমবিভাজনের যৌক্তিক মূল্যায়নে শ্রমজীবীদের অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ অন্যদিকে মূল্যবোধ তুচ্ছকারী শ্রমাপহারকদের সম্পদবৃদ্ধি—এবংবিধ স্বতবিরোধীতার প্রশ্নাকীর্ণ আবর্তের জটিল ঘূর্ণিতে চিন্তাজীবীর ব্যক্তিত্ব হ'ল ক্ষুব্ধ, অবনমিত, ত্রস্ত ও শংকিত। আদর্শ ও কর্তব্যের সূত্রগ্রন্থি হ'ল ছিন্ন—মননশীল শূন্যতাকে ভরলেন ভাবনারই সীমাবৃত্ত থেকে সংগৃহীত আপাত-অনর্থক অথচ অর্থময় চেতনা-প্রবাহের ধারাবাহিকতায়।

দর্শন, ধর্ম ও সমাজ পরিস্থিতির যে সময়-নির্ভর গতি-প্রকৃতি উপযুক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ দৃষ্ট হয় : অস্তিত্ববাদী ভাবনার মূলে রয়েছে এতাবৎ প্রচারিত দার্শনিক মতবাদগুলি সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা, শুধু অমুচ্চার অনীহা-ই নয়—সোচ্চার প্রত্যাখ্যানের তির্যক দৃষ্টিকোণ। যে কোন দার্শনিক ভাবনাই হোক, ভাববাদ (idealism), দৃষ্টবাদ (positivism) অথবা বস্তুবাদ (materialism),

বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে তা যুক্তি-প্রত্যয় অবসিত প্রথাবদ্ধতায় পর্যবসিত হয়—এই বাহ্য আশ্রয় বাক্যের মানবিক সম্ভাবনা তথা-সম্পৃক্ত সমস্যা সিদ্ধান্ত তত্ত্বের প্রাকল্পিক ধারণায় নৈর্ব্যক্তিক তথা জীবন-ব্যতিরেকী সমাধানের ইঙ্গিত বহন ক'রে আনে। যুক্তিবাদ (rationalism), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) অথবা সমষ্টিবাদ (collectivism)—সমস্ত চিন্তা ধারণাগুলি-ই যেন অন্তিম পর্যায়ে নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে। সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করা হ'য়েছে নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তিতে অথবা আসক্তির হৃদয়োত্তাপে, যার কোনটিই জাগতিক অবস্থার চাপে রুদ্ধ মানবিক সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, অথবা চায় না ; অন্যভাবে বলা যায় যে জাগতিক অবস্থার তাৎক্ষণিক চাপের প্রকৃতি নিরূপণ করা যায় না যেহেতু তাৎক্ষণিকতা নিরবচ্ছিন্ন গতি-প্রবাহের এমন কোন বিশেষ মুহূর্ত নয় যা কিনা পূর্বাপর মুহূর্ত-পর্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বাস্তবে প্রতিটি ক্ষণ-ই স্বতন্ত্র, অপিচ পরিস্থিতি-নির্ভর যে পরিস্থিতি,তার রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অথবা আর্থ সামাজিক যে ভূমিকা-ই থাক, ব্যষ্টি বা সমষ্টির আয়ত্ত নয়, পক্ষান্তরে ব্যষ্টি বা সমষ্টি বাস্তব ঘটনা প্রবাহের অধীন অথবা শিকার অথবা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি-শক্তির দাস। ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকলেও সমষ্টি-স্বার্থের তকমা আঁটা সামাজিক দায়কে নীরবে স্বীকার করে নিতে হয়, শক্তি থাকলে সরব প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি-ও নিতে পারে ; সমষ্টিকে-ও নতি স্বীকার করতে হয় পরিস্থিতি-শক্তির সহায়ক কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার শক্ত বেদীমূলে। তথাকথিত 'স্বাধীন' বিশেষণযুক্ত প্রত্যয়গুলির, যা নিয়ে মানুষের অনেক অহংকার এবং যা অনেক মহৎ কর্তব্যের পরিমাপক, বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ প্রশ্নাতীত নয়। বহু প্রশ্নের ব্যাখ্যাতা ও সমাধানকর্তা মানুষ নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নটাকে হয়ত বা সজ্ঞানে বা অচেতন ভাবে এড়িয়েই গেছে—নিজের জন্ম, জীবনধারা ও পরিণতি সম্পর্কিত সমস্ত আলাপ-ই প্রাকল্পিক অবরোহের (hypothetico-deductive) সূত্রসার, যা যতটা তাত্ত্বিক বা ধারণাসিদ্ধ ততটা বাস্তবিক বা বস্তুনিষ্ঠ নয়। অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদরা প্রচলিত দার্শনিক ধারণাগুলিকে যে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার কারণ এই নয় যে উক্ত দার্শনিক চিন্তাগুলি পারস্পরিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে একদেশদর্শী এবং চরম প্রথাসিদ্ধ, বরং প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে উক্ত দর্শন-চিন্তাবলী যে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে তা বহু ক্ষেত্রেই অস্তিত্বে কার্যকারণ বাস্তবতাকে এড়িয়ে এক ধরনের তাত্ত্বিক সমাধান অন্বেষণে তৎপর। বিমূর্ত-নিষ্ঠ তাত্ত্বিকতা-সৃষ্ট সমাধান সূত্রাবলীর অস্তিত্ব বহুক্ষেত্রেই অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ। বিমূর্ত তত্ত্বাবধিনী

দ্বারা অস্তিত্ব-জনিত সমস্যা সংকটের মীমাংসা হয় না, অথচ মূর্ত সমস্যাগুলি-ই মানবিক অস্তিত্বের শর্ত। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে একথা-ই কি প্রতীত হয় না যে প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক প্রত্যয় অথবা নীতিশাস্ত্রোক্ত সমাধান-সূত্রাবলী বিশেষ বিশেষ ঘটনা-পর্যায় সৃষ্ট সমস্যাবলীর অনুষঙ্গ হ'তে পারে না—যেমন ধরা যাক, যীশুর ক্রুশারোহনের পর তাঁর সহচরদের যে মানসিক ও বাস্তব পরিপার্শ্বের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল, তা থেকে উত্তরণের উপায় নিশ্চয়ই প্রথাসিদ্ধ সূত্রের মধ্যে ছিল না। অথবা বলা যায়, তাত্ত্বিকসূত্র কোনো সংগ্রামের প্রেরণা স্বরূপ হ'লেও সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় অথবা আকস্মিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে সংগ্রামীদের দলগত বা ব্যক্তিগত যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয় তা এত বেশী পরিমাণে তাৎক্ষণিকতা-সংশ্লিষ্ট ঘটনাক্রমের অন্বয়-সম্বন্ধবিস্তারী হয় যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তার কোন সমাধান বা তার থেকে পরিত্রাণের পথ পাওয়া দুরূহ হ'য়ে ওঠে। ঘটনাক্রমের প্রবল চাপে দ্রুতান্বয়ী ঘটনাযুগলের কাকতালীয় সম্পর্ক সমগ্র পরিস্থিতিকে এমনভাবে আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যায় যার জন্য ব্যক্তির সততা রূপ নেয় বিশ্বাসঘাতকতায়—কৃতজ্ঞতা হ'য়ে যায় কৃতঘ্নতা। আসলে, পরিপার্শ্বশক্তি থেকে উত্থিত সমস্যার সমাধান পরিপার্শ্বশক্তির মধ্যে নিহিত। অস্তিত্ববাদীদের বিশ্বাস : দর্শন সঞ্জাত সমস্যা আর বিজ্ঞান-আলোচ্য সমস্যা সমচরিত্রের নয়—পর্যায় ক্রমিক যুক্তি ও বিশ্লেষণে সমস্যার সমাধান ঘটে বিজ্ঞানের রাজ্যে এবং তা ঘটে বরাবরের জন্য-ই, পক্ষান্তরে যে সমস্যার কেন্দ্রে মানুষ, প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি, তার সমস্যা ধরাবাঁধা নয় সমাধানও তেমনি বরাবরের জন্য নয়। অস্তিত্বের প্রশ্নে প্রচলিত ধর্মসংস্কার ও সামাজিক মূল্যবোধগুলির মধ্যে যে সমাধান-চিন্তা রয়েছে অস্তিত্ববাদীদের কাছে যে চিন্তা হ'ল চিন্তাশক্তির একধরনের অপব্যবহার।

অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত যে কোন আলোচনাতে স্বরূপ (being) ব্যাখ্যায় বিধেয় বা জ্ঞেয়কে আতিশয্য-বর্জিত বস্তু-নিরপেক্ষ কতগুলি মৌল-ধারণার (categories) সমষ্টি মনে করা হয়। ধারণাগুলি যেন নির্মীয়মাণ কোন যন্ত্রস্বরূপের প্রতিলিপি (blueprint)। কিন্তু যন্ত্র যেমন আমাদের নিজেদের প্রয়োজন-সৃষ্ট এবং এর সঙ্গে আমরা বাস্তব প্রয়োজনে-ই সম্পর্কান্বিত, ধারণাগুলি সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না কারণ, অস্তিত্বের প্রশ্ন অথবা অস্তিত্বের দায় অস্তিত্বের স্বরূপ-সংশ্লিষ্ট ধারণার সঙ্গে কোন ভাবে-ই যুক্ত নয়, কোনো বাস্তব প্রয়োজন বা সিদ্ধান্তের ঘটনাক্রমিকতা 'ধারণা'-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। মানুষের অস্তিত্ব ঘটনা-প্রবাহের ক্রমপর্যায়, এর সঙ্গে ধারণা (concept category), দৃষ্টিভঙ্গী (view-points) ইত্যাদির

যোগ নেই। আমাদের জাগতিক অস্তিত্বে আমাদের চিন্তাবলী অথবা কার্যসমূহের সিদ্ধান্ত ঘটনাক্রমের বিশিষ্ট কিংবা বিবর্তিত পর্যায়ের সঙ্গে-ই অন্বিত। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় আবভাসিক (phenomenalistic) ও অতীন্দ্রিয় (transcendental) জগৎ সংশ্লিষ্ট বিস্তৃত তর্ক-প্রবন্ধে স্বরূপের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চিত বক্তব্যে উপনীত হওয়া যায় না, বরং চেতনা সম্পর্কিত তত্ত্ববাদ এ কথাই বলে যে স্বরূপ অজ্ঞেয়, অব্যাখ্যাতব্য। সুতরাং জাগতিক তথা আবভাসিক অস্তিত্বের সমস্যা আলোচনায় নিবৃত্ত না হ'লেও সমস্যার অস্তিত্ব নিরালম্ব হ'তে পারে না। আমরা তাই স্বরূপ কি তা জানার চেয়ে বরং ভাবতে পারি স্বরূপকে কি ভাবে দেখলে অস্তিত্ব অর্থময় হ'তে পারে, অস্তিত্ব আমাদের চিন্তা ও কর্মের সীমারেখায় আসতে পারে। অস্তিত্ব-জনিত প্রশ্নাবলীকে তাই দেখতে হবে সংস্কার-বর্জিত, নির্মোহ দৃষ্টিকোণে।

অস্তিত্ববাদীদের কাছে জগৎ-ব্যাপারটা অনেকটা 'বোকার বলা আষাঢ়ে গল্পে'র মত। এই গল্পের আদি অস্পষ্ট এবং অন্ত্য অর্থহীন, কিন্তু আদি-অন্ত্যের মাঝামাঝি একটা অবস্থা রয়েছে যার মধ্যে গল্পটা জটিল সূত্রের গ্রন্থবন্ধনে বিন্যস্ত। এই গল্পের অস্তিত্ব আছে এবং নেই, এই দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। জগৎ আছে এবং আমি এই জগতের ঘটনাক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, আবার আমি চেতনার বৃত্তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে-ও পারি। মানুষের অস্তিত্ব তাই ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন—অপিচ, আমার জাগতিক অস্তিত্বের সব দায়-ই আমার কারণ আমার জগৎ-প্রপঞ্চের আমিই নির্মাতা এবং আমার চেতনা ও পরিকল্পনা দ্বারা-ই আমি এই জগতকে আমার কাছে অর্থময় করে তুলি। আমার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে আমাকেই গ্রহণ করতে হয় যদিও আমার অস্তিত্ব জাগতিক ঘটনাক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন না, তাই আমার অস্তিত্বের সিদ্ধান্তও আমাকে-ই নিতে হয়, আমি ছাড়া আর কেউ সেই সিদ্ধান্তের দায় বহন করে না, করতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের সংকট—ব্যক্তিত্বের শ্লাঘা, ব্যক্তিত্বের অহংকার, ব্যক্তিত্বের বিভ্রম, ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতি, সব-ই এই সিদ্ধান্ত-সংকটের ফলস্বরূপ।

অস্তিত্বের তাগিদে ঘটনাক্রমে যে জগতের মধ্যে এসে পড়েছি তাও এক ধরনের তৈরী জগৎ—নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ যা আমাকে খুঁটি থেকে থামের মধ্যে বসাচ্ছে আবার ওঠাচ্ছে-ও। সব-ই যেন নিখুঁত ছকে বাঁধা ব্যাপার, কিন্তু কোনটাই আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের বিধেয় নয়। ঘটনাক্রমিক উত্থান-প্রস্থান

আমাকে ভাগ্য-নির্ভর করে তোলে। ভাগ্যই যেন আমার গতিপথ নির্দিষ্ট করে রেখেছে বহুধা-বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় প্রাতিষ্ঠানিক সংসার প্রবাহে। প্রতিটি খুঁটিনাটি বস্তু, ছোটবড় ঘটনা, মূল্যবান, মূল্যহীন এবং অমূল্য জড় ও ভাবের চঞ্চল প্রবাহ, যার প্রত্যেকটাই আমার অস্তিত্বের সহায়ক হ'লেও কোনো ভাবেই আমার অস্তিত্বের নিরাপত্তার শর্ত নয়। অথচ এই প্রবাহ-কে স্বজ্ঞানে অস্বীকার করার-ও উপায় নেই। অস্তিত্ববাদী লেখকদের রচনা তাই ভরে উঠেছে তাবৎ ঘটনা প্রবাহের অনুপুঙ্খ বর্ণনায়—যাপিত জীবনকে ঘটনা-চক্রের বৃত্তে এমনভাবে ঘূর্ণিত হ'তে দেখান হ'য়েছে যা ইঙ্গিত করেছে অপার মানবিক সম্ভাবনার হারিয়ে যাওয়ার অথবা ঘটনা-প্রবাহ থেকে পালিয়ে থাকার প্রবৃত্তি। মানবিক অস্তিত্ব তাই, অন্তত অস্তিত্ববাদী ভাবধারায় যা পাওয়া যায়, এক ধরনের চেতনা-প্রত্যয় যার দ্বারা মানুষ (যে মানুষ চিন্তা করে) নিজেকে ঘটমান বস্তু (জড় ও ভাব) প্রবাহথেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে, প্রবাহের উর্ধ্বে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল রচনা করতে পারে।

যাপিত জীবনের আমি আমার প্রকৃত 'আমি' নয়, অথবা আমিত্বের পূর্ণতা যথাযথ ঘটনাক্রমের সীমাবৃত্তে উপলব্ধ হয় না; কারণ, বস্তুগত অস্তিত্বের সংগ্রামে ক্লান্ত যে আমি সেই 'খণ্ড আমি'-র চেয়ে ঘটনা-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন অপার সম্ভাবনাময় আমি হ'ল 'আমার আমি', পূর্ণ আমি, আমার পরম। কিন্তু প্রশ্ন—অভিজ্ঞতার অনায়ত্ত এই স্বরূপের অর্থ কি? অস্তিত্ববাদী দর্শন তথা সাহিত্যের প্রবক্তারা এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দেন নি, এবং আলোচ্য প্রসঙ্গে এঁরা যা আলোচনা করেছেন তা একান্তভাবেই মন্ময় ভাবনার অভিব্যক্তি; ফলতঃ বিষয়ে—ব্যক্তিভেদে, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের চিহ্ন এবং দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত। অভিজ্ঞতার অনায়ত্ত এই আত্ম-স্বরূপ, সার্ত্র-র কাছে,—এক ধরনের অনুত্তর নেতিচেতনা যা কিনা কোন বস্তু বা ভাবনা-র মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না, কারণ, আমার 'আমি' নিরালম্ব—আমি বস্তু নই, ভাব নই, এমন কি 'আমি' আমার প্রজ্ঞা-ও নই যেহেতু আমার প্রজ্ঞাধৃত তথ্য ঘটনাক্রমের প্রপঞ্চ মাত্র, অব্যয় কিছু নয়, কালক্ষত অবসিত বস্তু মাত্র। মার্সেলের ভাবনায়: সত্যস্বরূপ বা আত্মস্বরূপকে যার মধ্যে আমি নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজি, কোন বিমূর্ত চেতন-স্বভাব অথবা দার্শনিক প্রত্যয়-ধৃত কোন ভাবগত যুক্তি-বিন্যাসের সঙ্গে একাত্ম করা যায় না; পক্ষান্তরে আত্মস্বরূপকে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-র সম্পর্ক নিষ্ঠ সক্রিয়, প্রাণদ ও সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের উপলব্ধির আধার হিসাবে ভাবা যায়। আত্মস্বরূপের পরম বিকাশ আত্মাভিমান ও আত্মসংকল্পের মধ্যে রয়েছে।

সংকল্প হ'ল স্বীকারোক্তি, আত্মোপলব্ধির অভিভাষণ যার মধ্যে থাকে আত্ম-সংশ্লিষ্ট দায় ও দায়িত্বের ঝুঁকিকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি। ব্যক্তিগত সংকল্প তথা সিদ্ধান্ত নির্মম—জৈবিক এবং নান্দনিক বাসনা-ভাবনা বৃত্তের সীমা-অসীমের সীমান্তে নৈতিক অভিভাষণের মঞ্চঃ আমি সপ্রাণ, তাই সক্রিয় ; আমার জগতে আমি একক, নির্মম, পরিত্যাজ্য এই 'মুক্ত-আমি' আমার জগতের অধিশ্বর। অস্তিত্বের বিষম অবস্থা,—একদিকে নিঃসীম মুক্তির স্বপ্ন অন্যদিকে 'আমার আমি' তথা 'মুক্ত-আমি' দুঃসহ একাকীত্বের দুঃস্বপ্ন,—'আমার আমি' ব্যথিত, জর্জরিত, যন্ত্রনাগ্রস্থ এবং ক্ষুব্ধ-ও ; অপ্রমেয় অজ্ঞতার শ্বাসরোধকর পরিমণ্ডলে 'আমি' অসহায়, 'আমি' ক্লান্ত, শ্রান্ত ও বমনেচ্ছু। স্বপ্নায়ত্ব জগতের একক অধীশ্বর হ'য়ে আমি' প্রবাহ বিচ্ছিন্ন নয়, যে কোন মানবিক সত্তা-র কাছে বাঁচার শর্ত একান্ত জরুরী, কিন্তু নির্বিকল্প এই অস্তিত্বের কোন নিরাপত্তা নেই ; ঘটনা-ক্রমের বোঝার ওপর অসহায় মুক্তির শাকের আঁটি চাপিয়ে আত্মার স্বরূপ সন্ধান চল'ছে মাত্র!

আমার দায় থেকে আমার মুক্তি নেই—মুক্তি পিয়াসীর মুক্তিস্বপ্ন দুঃস্বপ্নের আকস্মিকতায় ভগ্ন, চূর্ণ। আজকের শিরোভূষণ আগামীকাল ধূলি-লুন্ঠিত, আজকের নেতৃত্ব আগামী দিনে অস্বীকৃত এবং অবহেলিত, বিশ্বস্ততা প্রশ্নবাণে জর্জরিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলার অক্টোপাশের বন্ধনে ব্যক্তিমন ও মনন হ'য়ে যায় নির্জীব, যান্ত্রিক অনুকারী। যে শুভকামনা, নৈতিক মূল্যবোধ থেকে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শুরু হয় সংগ্রামোত্তর দিনগুলিতে সেই গণতন্ত্রের শাবলের ঘায়ে গণতন্ত্রীয় সমাধি খননের দুর্বোধ্য অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় গণতন্ত্রের-ই শপথ বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। এসব ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী—মূল্যবোধের মূল্য দিতে গিয়ে ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনকে মেনে নিতে পারে না, মূল্যবোধ-কে আঁকড়ে বাঁচতে গেলে হ'তে হয় বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত। মুক্তির দুর্বোধ্য দেওয়াল-লিপির প্রতীকী বিন্যাসে অস্তিত্বের নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি থাকে না।

অস্তিত্ববাদী ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জ্ঞাতার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের যাবতীয় প্রশ্ন। সংশয় সম্ভাবনার টানাপোড়োন ব্যক্তিগত চেতনা কখনো অস্থির, কখনো প্রশান্ত আবার কখনো অসহায়। কারণ, কোন প্রশ্ন-ই জ্ঞাতার ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে সাধারণীকৃত বিমূর্ত সমাধানসূত্রের অন্বেষণ করে না। 'মানুষ মরণশীল', দার্শনিকের প্রজ্ঞাধৃত এই সাধারণ তত্ত্বে অস্তিত্ববাদীর স্বস্তি নেই ; অস্তিত্ববাদীর

বেদনাকরুণ উপলব্ধি,—আমাকে-ও মরতে হবে,'—নির্মম এবং একান্ত ব্যক্তিগত জ্ঞান যাকে সে কোন তত্ত্বে, সূত্রে বা ব্যাখ্যায় অস্বীকার করতে পারে না ! এই কেন্দ্র বিষয়,—'অস্তিত্ব ভঙ্গুর',—নিয়ে অস্তিত্ববাদীরা, পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্যে আপাত পার্থক্য সত্বেও, তাঁদের রচনা শৈলীর রূপ দিয়েছেন। জেসপারের ভাবনায়—অস্তিত্বের ভঙ্গুরতা অথবা বেঁচে থাকার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা ; হেইডগারের চিন্তায়—মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার ঘটনাক্রমিক অভিজ্ঞতা অথবা যাপিত জীবন নিয়ে স্বস্তি বোধ না করা এবং সার্ত্র-র ভাষায়—জীবন ব্যাপারে সর্বাত্মক বিতৃষ্ণা যা পরিণামে বিবমিষার জন্ম দেয়।

জেসপার ও হেইডগারের ভাবনায় ধরা পড়েছে স্ব-বিরোধী অভিজ্ঞতা—অস্তিত্ব হারানোর আতঙ্ক এবং অস্তিত্ব রক্ষার দুর্ভাবনা। সার্ত্র-র অভিভাষণ—দুঃসহ বোঝায় ক্লান্ত শ্বাসরোধকর এই অস্তিত্ব নিষ্ঠুর বাস্তবের কাছে ব্যক্তি অসহায়, অস্তিত্ব অর্থহীন। কিয়ের্কেগার্ড লিখেছেন—'বাস্তব আমাকে পীড়িত করে, আতঙ্কিত করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব সত্তা থেকে রহস্যালোকের অশরীরী সত্তা, সবই। জগৎ ব্যাপারের সব কিছুই আমার কাছে দুর্বোধ্য, সব চেয়ে দুর্বোধ্য আমার নিজের সত্তা। সমগ্র অস্তিত্বই-গরল-প্রবাহ, আমার জীবন যন্ত্রণাময়।' যে কোন জীবের পক্ষেই অস্তিত্বের শর্তকে এড়ান সম্ভব নয়, অস্তিত্বের সংকট থেকে নিবৃত্তির পথ-ও সহজপ্রাপ্য নয়। কিয়ের্কেগার্ডের হতাশা ততখানি জীবন যন্ত্রণার জন্য নয় যতখানি যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করবার অসুবিধার জন্য। জীবন দুর্বিষহ, কিন্তু মৃত্যু-ই কি করায়ত্ব, স্বেচ্ছাধীন ? হয়ত নয়, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই নয়।

সার্ত্র-র জীবন জিজ্ঞাসায় যে প্রশ্ন দুটি সবথেকে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হ'য়েছে তা হ'ল 'মৃত্যু' ও 'স্বাধীনতা' সম্পর্কিত ভাবনা। সার্ত্র-র ধারণা—জীবন এক ধরনের দুর্বোধ্য সংলাপ, অস্বস্তিকর বোঝা। এই জীবনের প্রতি মাঝে মাঝে-ই জেগেছে বীতশ্রদ্ধা। কিন্তু জীবনের দায়িত্বকে তিনি বারে বারে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিজের কার্যধারা,যা তাঁর কাছে ঘটনাক্রমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যার উপর নিজের কোন সচেতন অধীকার নেই তার দায়িত্বকে তিনি এড়াতে চান নি। অস্তিত্বের দায়, যার থেকে আমরা কেউই পালাতে পারি না, এমন কি মৃত্যুর স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন যাকে কোনো ভাবেই অর্থময় অথবা অর্থহীন করে দিতে পারে না, ঘটনা-প্রবাহের বিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের সঙ্গে বাঁধা ; ফলতঃ তা দুর্বহ, অভিশপ্ত। মৃত্যু সেই প্রবাহে ছেদ টানতে পারে কিন্তু কোন সমাধান-সূত্র যোগায় না।

অস্তিত্বের দায়িত্ব চেতনায় ব্যক্তি ঘটনা-প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের স্বকীয় জগতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। এই জগতে সে স্বাধীন, সে আপোষহীন সংগ্রামী। মৃত্যু এই জগৎ-কে দিতে পারে না। সার্ত্র-র কাছে মৃত্যু আদৌ মহিমাদীপ্ত, কাংক্ষিত সমাপ্তি নয়—মৃত্যু মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অতিরিক্ত এক আকস্মিক ক্ষণ; বুদ্ধি বা জ্ঞান, বাসনা বা আবেগ দিয়ে তাকে গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না, এক হিসাবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যা মানুষের আয়ত্বের উর্ধ্বে, ধারণাবৃত্তের বহির্ভাগে তাকে নিয়ে ভাববিলাস সার্ত্র-র যুক্তি-প্রত্যয়ে প্রশ্রয় পায় না। মৃত্যু, সার্ত্র-র কাছে, জীবন প্রবাহের আকস্মিক সমাপ্তি, সফল সমাপ্তি নয়, কোন মহান পারগতির ইঙ্গিত নয় কিন্তু জীবন বৃত্তের অস্তিত্ব-প্রবাহে সার্ত্র দায়িত্বশীল, সবিশেষ আগ্রহী। এইখানেই সার্ত্র-র চিন্তাগত দ্বিমাত্রিকতা তথা চিন্তামাত্রার দ্বান্দ্বিক প্রবণতা। অস্তিত্ব সম্পর্কিত দ্বৈত ভাবনায় ধরা পড়েছে অস্তিত্বের স্বভাবক্রম (in itself) এবং অস্তিত্বের স্বরূপক্রম (for itself) সম্বন্ধে সার্ত্র-র চিন্তা। অস্তিত্বের স্বভাব নিম্নগ, অস্তিত্বের স্বরূপ উর্ধ্বগ। স্বভাব স্রোত-তাড়িত এবং পরিপার্শ্বের শাসনে স্পৃষ্ট, ঘটনাক্রমের বশ এবং মৃত্যুর আকস্মিকতায় প্রবাহ-পরিত্যক্ত শরীরী শব মাত্র। প্রাক্ মৃত্যুকালীন যাপিত জীবন দুঃসহ বোঝায় ন্যুব্জ, অভিশপ্ত। ফলতঃ অস্তিত্ব ব্যাপারটাই ক্রোধোৎপাদক। স্বরূপ সংগ্রাম-অন্বিষ্ঠ, আত্মবিকাশে পথে আপোষহীন; সচেতন স্বরূপ সন্ধানীর কাছে 'স্বাধীনতা'-ই অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত। স্বাধীনতার বিমূর্ত তত্ত্ব নয়, চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীন চেতনার শরীরী আত্মপ্রকাশ সার্ত্র-র জীবন সঞ্জাত কর্মপ্রচেষ্টাকে অর্থময় করে তুলেছে। ঘটনা-প্রবাহ-বিচ্ছিন্ন সচেতন ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়নিষ্ঠ—প্রত্যয়ের জন্য অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন ভাবনার জন্য সেই ব্যক্তিত্ব হেলায় স্বেচ্ছানির্বাসিত জগতে আরূঢ়, যে জগৎ থেকে তাকে নড়ান যায় না, মৃত্যুর সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব লোপ করা শীতল ছোঁয়ার অনেক উর্ধ্বে সেই জগতের অবস্থান। সেই জগতে ব্যক্তি স্বরূপে সপ্রতিষ্ঠ, স্বভাবতই সে স্বাধীন এবং সংগ্রামী। সেই জগতে ব্যক্তির নৈতিক স্বেচ্ছাচার সামাজিক সংস্কার তথা গোষ্ঠী রাজকতন্ত্রের প্রথাসিদ্ধ ভাবনা ও শাসন চক্ষুকে হেলায় অস্বীকার করে, তুচ্ছ করে এবং আত্মসিদ্ধান্তে অটুট থাকে। আত্মসিদ্ধান্তই আত্মবিকাশের মাধ্যম এবং এই সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প নেই, সংগ্রামটা যখন অস্তিত্বের স্বরূপের। প্রবাহ-বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব-স্বরূপ সন্ধানীর কাছে কোনো মত বা পথ-ই চূড়ান্ত নয়, চূড়ান্ত যা তা হ'ল ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম এবং এই সচেতন

সংগ্রামে রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক অথবা সামাজিক যে কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার না করা। ব্যক্তিত্বের অপার সম্ভাবনার কথা যিনি ভাবেন তাঁর কাছে দেশ, জাতি বা ভাষা কোনো খণ্ডিত সত্তা নয়; দেশ, জাতি, ভাষা বা বিশ্বাস ঘটনাক্রমের যোগাযোগ মাত্র, স্বাধীনতার প্রশ্নে, নীতি-যুক্তির প্রশ্নে তিনি ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধ্বে তাঁর বক্তব্যে সোচ্চার হ'তে পারেন। ব্যক্তিত্ব সচেতন অস্তিত্ববাদী সার্ত্র তাই সহজেই দৈশিক স্বার্থকে তুচ্ছ করে পরদেশী শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমর্থক হ'য়ে ওঠেন, সাম্যের গানে গলা মেলালেও তথাকথিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের আগামী ভূমিকাকে, যা অপরের স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা-কে অস্বীকার করতে চায় প্রথাসিদ্ধ বিপ্লবী বুলির সোচ্চার শ্লোগানে, নির্ভীক নিন্দাভাষণে ধিক্কার দেন। নরনারীর তথাকথিত সম্পর্ককে অস্তিত্ববাদীরা, বিশেষ করে সার্ত্র সহজভাবে মেনে নেননি। সামাজিক অনুশাসনে নরনারীর সম্পর্ককে নানা বিধিনিষেধের সূত্রগ্রন্থিতে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। বিবাহ নামক অনুষ্ঠান, যা সামাজিক অনুশাসনের একধরনের স্বীকৃতি, অনেকক্ষেত্রেই নরনারীর সম্পর্ক নির্বাচনের স্বাধীনতা-কে খর্ব করে; কারণ, সংস্কারের শাসনকে মানুষ, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, আপোষে মেনে নেয় অথবা জৈববৃত্তির প্রকোপে অসামাজিক হয়। এর কোনোটার মধ্যেই স্বাধীন চেতনা অভিব্যক্ত হয় না। সার্ত্র-র স্বাধীনতা-অন্বিষ্ঠ মন সংস্কারকে হেলায় অস্বীকার করে এবং নরনারীর জৈব-সম্পর্ককে এমন এক ধরনের সুস্থ অথচ সহজ-স্বাধীন সম্পর্কে পরিণত করে যা আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও, সার্ত্র-র জীবন-দর্শনের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এই জাতীয় সম্পর্কে বিবাহ ব্যাপারটা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়, যা প্রয়োজন তার নাম ভালবাসা এবং স্বাধীন রুচি অনুযায়ী নির্বাচন প্রবণতা।

প্রবাহ-বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব-স্বরূপ, সার্ত্র বলেছেন, স্বাধীনতা মোহে অভিশপ্ত। স্বাধীনতা-ই অস্তিত্বের চূড়ান্ত শর্ত। এ প্রসঙ্গে সার্ত্র-র নঞর্থক অস্তিত্ব তত্ত্বের সম্পর্কে দু এক কথা বলা যেতে পারে। সার্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন, আবার অস্তিত্বের ভিতর নঞর্থক এক অবস্থার কথা-ও বলেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, অস্তিত্বের ভিতরকার এক ধরনের নঞর্থকতা যার ব্যাপ্তি অসীম এবং যা স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন, হ'ল সার্ত্র-র জীবন-দর্শনের গ্রন্থিভাবনা। সার্ত্র বলেছেন: স্বরূপ হ'ল একধরনের নাস্ত্যর্থক স্বভাব। নাস্ত্যর্থক স্বভাব অস্তির পূর্বে-ও নেই, অপিচ, অস্তিত্ব বহির্ভূত কোনো ব্যাপার-ও তা নয়। যে মানুষ হ'য়ে ওঠে, স্বরূপে

প্রতিষ্ঠীত হয় সেই সত্তা এক ধরনের নাস্ত্যর্থকতাকে প্রশ্রয় দেয়, যে নাস্ত্যর্থকতা অস্তিত্বের স্বতঃপ্রবাহের মধ্যে নেই। মানুষের মধ্যকার যে মানবতা যা মানুষের মরণশীলতাকে অবজ্ঞা করে সেই মানবতা অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ নাস্ত্যর্থকতার ধারক। তাহলে মানুষ কি শুধু নাস্ত্যর্থকতার-ই অভিব্যক্তি? তা নয়। মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব আছে, আছে তার বিবিধ সংস্কার, সর্বোপরি আছে তার অস্মিতা। নাস্ত্যর্থকতা হ'ল সেই ধরনের মানবিক ভাব যার মধ্যে রয়েছে অস্তিত্ব-নিরপেক্ষতা, প্রবাহ-অতিরিক্ত অস্তিত্ব ভাবনা। স্বাধীনতা হ'ল অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ স্বভাবের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। স্বাধীনতা নামক চেতনা শুধু স্বরূপেরই গুণ মাত্র নয়, স্বাধীনতা-ই স্বরূপের অভিব্যক্তি।

কামুর 'দি আউটসাইডার' : সার্ত্রর মূল্যায়ন

নয়নকুমার মিত্র

আলবেয়ার কামু (১৯১৩-৬০) যতই নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Outsider* লিখুন না কেন শেষ পর্যন্ত এবং অনিবার্যভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রতি তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আজও অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই কামু দুখানি বই সম্পূর্ণ করেন। প্রথমটি *The Outsider* এবং দ্বিতীয়টি *The Myth of Sisyphus*। উভয়ের প্রকাশকাল : ১৯৪২। প্রথমটি প্রকাশিত হবার অল্প কিছু দিন পরেই, ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাঁ পল সার্ত্র **Camus' "The Outsider"** প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। 'দি আউটসাইডার' প্রকাশিত হবার পর সার্ত্র লিখেছেন : 'People told each other that it was "the best book since the end of the war".' "Best" শব্দটি নিয়ে বিতর্ক শুরু করা যায়। কারণ কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে "best"? কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম অনুযায়ী আমি সে প্রশ্ন তুলছি না। দার্শনিক ও লেখক জাঁ পল সার্ত্র যেভাবে ও যে দৃষ্টিকোণ থেকে কামুর বইটির মূল্যায়ন করেছেন আমি তা পাঠকদের কাছে বর্ণনা করেছি মাত্র।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন কেরাণী। নাম মিউরসো। অবিবাহিত ও মধ্যবিত্ত। একটি ছোট বাড়িতে বিচিত্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে থাকে। নিজের হাতেই রান্নাবান্না করে। একজন মহিলার সঙ্গে গভীরতমভাবে মেলামেশা করে —সাঁতার কাটে, সিনেমায় যায়, ইত্যাদি প্রভৃতি। বইটিতে কথোপকথন অংশ প্রায়শ থাকলেও প্রধানত বর্ণনাত্মক। এবং সে কাজ অত্যন্ত শক্তিশালী ও শৈল্পিক হাতে সুসম্পন্ন। প্রতিটি বাক্য মনোরম। শব্দ চয়ন উপন্যাসের ক্ষেত্রে এত বিস্ময়করভাবে নিখুঁত যে প্রায় কবিতার মতো; এবং *The Outsider* বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা উপলব্ধি করা যায়। বইটির প্রথম লাইনগুলি আরম্ভ হয়েছে নায়কের মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে। কিন্তু এই সংবাদে নায়ক একটুও বিচলিত নয়। মাতৃ-বিয়োগের জন্য একটুও দুঃখ বা শোক নায়ককে স্পর্শ করে নি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাই সে বর্ণনা করেছে : **Mother died today. Or, maybe, yesterday; I can't be sure. The telegram from the Home says:** ***Your mother passed away. Funeral tomorrow.***

Deep sympathy. Which leaves the matter doubtful ; it could have been yesterday. যদিও একজন বাঙালী পাঠক এরকম কল্পনা কল্পনাতেও আনতে অক্ষম তবুও কামু সাবলীলভাবে প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্যটি পর্যন্ত এভাবেই লিখেছেন। আর সার্ত্র সামগ্রিকভাবে কামুর লিখন শৈলী সম্পর্কে বলেছেন :

১. *The Outsider* is not an explanatory book. The absurd man does not explain ; he describibies. Nor is it a book which proves anything.

২. Although the absurdity of the human condition is its sole theme, it is not a novel with a message ;...It is rather the product of thinking which is "limited, rebellious and mortal." It is a proof in itself of the futility of abstract reasoning.

৩. However, we are not concerned with honesty, but with art.

৪. There is not a single unnecessary detail, not one that is not returned to later on and used on the argument And when we close the book, we realize that it could not have had any other ending.

এভাবে সার্ত্র-র বহু মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায় যেখানে সার্ত্র শুধু বর্ণনার পদ্ধতি ও প্রকাশের ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কামুর মূল্যায়ন করেছেন। যদিও সার্ত্র স্বীকার করেছেন—কোন নতুন কথা কামু উচ্চারণ করেন নি—যা লিখেছেন তা সপ্তদশ শতাব্দীর 'classical pessimism' ; যার অবিচ্ছিন্ন সুর হল জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, 'বাঁচার মধ্যে যন্ত্রণা। কোন আনন্দ কোথাও নেই। শুধু শূণ্যতার বোধ। কামুর ভাষায় : Getting, up, tram, four hours of work, meal, sleep, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, in the same routine.. , এবং এভাবে প্রতিটি মুহূর্ত অর্থহীনতাকে প্রকট করে। অথচ এজন্য অজ্ঞানতা বা দারিদ্র দায়ী নয়। সার্ত্র লিখেছেন, যদি কেউ ধর্মীয় আকর্ষণ অথবা অস্তিবাদী দর্শনকে উপেক্ষা করতে পারেন তবে তিনি খুব স্বাভাবিক যা আবিষ্কার করবেন

তা হল : the world is chaos, a "divine equivalence born of anarchy" ; tomorrow does not exist, since we all die.

এরপর আমাদের কী করণীয় ?

মানুষের কী করণীয় ?

বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কামু 'দি আউটসাইডার' লেখেন নি এবং সার্ত্রও সমালোচনা করেন নি। যেহেতু কামু 'the scope of our reasoning power' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন তাই সার্ত্র *The Outsider* সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : This is not resignation, but the rebellius recognition of the limitations of human thought. It is true that he felt obliged to make a philosophical translation of his fictional message. তাই 'দি আউটসাইডার' পড়তে পড়তে কোন কিছুর প্রত্যাশা যদি কোন পাঠক করেন তবে সেজন্য লেখক দায়ী নন্। কিছু খোঁজার স্পৃহা কোন চরিত্র এই উপন্যাসে করে নি। লেখক কোন তাত্ত্বিক ইঙ্গিতের ভগ্নাংশও এখানে কোথাও উপস্থিত করেন নি ; যদিও কামু অন্যত্র তত্ত্বগত সূত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। তাই সার্ত্র মন্তব্য করেছেন : *The Myth of Sisyphus* teaches us how to accept our author's novel. In it we find the theory of the novel of absurdity. যে পৃথিবীতে আমরা বেঁচে আছি সেখানে কামুর মতে স্বপ্ন, মরীচিকা, আশা, স্মৃতি, অতীত, ভবিষ্যৎ কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এতো বেঁচে থাকা নয়—নির্বাসনের নামান্তর। তাই কামু লেখেন : In a universe suddenly deprived of light and illusions, man feels himself an outsider. This exile is irrevocable, since he has no memories of a lost homeland and no hope of a promised land. কামুর এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে গিয়ে সার্ত্র খুব সংক্ষেপে বলেছেন : The reason is that man *is not* the world. যেহেতু জগৎ ও প্রকৃতি মানুষের জন্য নির্মিত বা বিকশিত হয় নি এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের সীমাবদ্ধতার জন্য কামু প্রকৃতির থেকে নিজেকে বিযুক্ত মনে করেন তাই মানুষ হয়েও মনুষ্যেতর প্রাণীর তুলনায় অতিরিক্ত কিছু করতে তিনি অক্ষম।

এরপর অবধারিতভাবে কামু যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা হল মানুষ না হলে তাঁর চিন্তা ও চেতনার চেহারা কি হত। ধরা যাক, অনেক গাছের মধ্যে তিনি একটি

গাছ। তা হলে কামুর অনুভূতি, ইচ্ছা ও দায়িত্ববোধ যে স্রোতে যেত তা তাঁর নিজের ভাষায় : If I were a tree among other trees . the life would have a meaning, or rather this problem would have none, for I would be part of this world. I *would be* this world against which I set myself with my entire mind . It is preposterous reason which set me against creation.

সুতরাং কামুর দর্শন এখন এমন স্তরে এসেছে—পাঠক হয়ত ভাবছেন—সেখানে বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং এত জটিল ও গভীর সমস্যার থেকে মুক্ত হতে আত্মহত্যাই তো একমাত্র পথ। কিন্তু না তেমন কোন সিদ্ধান্ত কামুর দর্শনে অনুপস্থিত। তাই সার্ত্র লিখেছেন : The absurd man will not commit suicide ; he wants to live, without relinquishing any of his certainty, without a future, without hope, without illusion and without resignation either. He stares at death with passionate attention and this fascination liberates him. He experiences the "divine irresponsibility" of the condemned man.

আশা নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যতও নেই। তাহলে অ্যাবসার্ড মানুষ কী নিয়ে বেঁচে থাকবে ? "Divine irresponsibility"কে একমাত্র পাথেয় করলে অ্যাবসার্ড মানুষের কাছে মুহূর্তগুলি কি হয়ে উঠবে না দিনের মত দীর্ঘ ? তাই কামুর দর্শনকে সার্ত্র সহজভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, এইভাবে যে, যে কোন সময় যা খুশি তা ঘটতে পারে (everything is permissible) এবং একজন অ্যাবসার্ড মানুষের কাছে সব কিছুই আইনসম্মত (*everything* is lawful)। অথচ এই ঘটনাক্রমের মধ্যে কোন নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য নেই। সুতরাং সার্ত্র মন্তব্য করেন : One experience is as good as another : the important thing is simply to acquire as many is possible. কারণ বিপুল সময়স্রোতের মধ্যে আমাদের জীবন ভবিষ্যতহীন এবং অনেকগুলি বর্তমান মুহূর্তের সমষ্টি। সার্ত্রের ভাষায় : Our life has "no future", it is a series of present moments। সুতরাং একজন অ্যাবসার্ড মানুষের লক্ষ্য কী হতে পারে তা কামুর ভাষায় : The ideal of the absurd man is the present and the succession of present moment before an ever-

conscious spirit. এই চলমান বর্তমান মুহূর্তগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় সমস্ত ধরনের মূল্যবোধের অবসান হয় এবং অ্যাবসার্ড্ মানুষ হয়ে ওঠে একই সঙ্গে বিদ্রোহী ও দায়িত্বহীন। এসময় কোন ঘটনাকে justify করবার প্রয়োজনও সে অনুভব করে না কারণ সে তো আর কোন অপরাধ করে নি বরং পরিপূর্ণভাবে নিষ্পাপ। অ্যাবসার্ড মানুষের ক্ষেত্র এই নিষ্পাপের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে সার্ত্র যে উপমাটি ব্যবহার করেছেন তা এই রকম : He is *innocent*, innocent as Somerset Maugham's savages before the arrival of the clargyman who teaches them God and Evil, what is lawful and what is forbidden. এছাড়া নিষ্পাপ বা innocent শব্দটি অন্য কোন প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না কারণ—"Innocent in every sense of the word, he too is, if you like, an Idiot."

॥ ২ ॥

The Outsider উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিউর্‌সো-র চোখ দিয়ে কামু সভ্য মানুষের শিক্ষা, রুচি, যুক্তি, কর্তব্য, কল্পনা, স্বপ্ন, উদ্দেশ্য, অতীত, ভবিষ্যত এবং সমস্ত ধরনের মূল্যবোধ যে অর্থহীনতার নামান্তর তা ব্যক্ত করেছেন এবং সার্ত্র-র উপলব্ধিতে এ সবই "fictional message" এর সামগ্রিকভাবে philosophical translation"। যদিও শেষ বিচারে, সার্ত্র-র মতে *The Outsider*-কে গল্প বলা যায় না কারণ : It cannot be called a story, for a story explains and co-ordinates as it narrates. It substitutes the order of causality for chronological sequence. ঘটনার পারম্পর্যের কয়েক স্থানে পাঠক ভালবাসা নামক শব্দের উপস্থিতি ও আলোচনা লক্ষ্য করবেন যা মিউর্‌সো ও মারি-র কথোপকথনের মধ্যে পরিস্ফুট। একদিন মিউর্‌সো-র ঘরে মারি-র সঙ্গে তার কথাবার্তাকে কামু এভাবে বর্ণনা করেছেন : A moment later she asked me if I loved her. I said that sort of question had no meaning, really ; but I supposed I didn't. She looked sad for a bit, but when we were getting our lunch ready she brightened up and started laughing, and when she laughs I always want to kiss her. ভালবাসা শব্দটির অর্থশূন্যতাকে কামু এত স্পষ্ট ভাষায় ও নগ্নভাবে ব্যক্ত করেছেন যে পড়তে পড়তে বর্ণনায় ঐ অংশে পাঠক

থমকে দাঁড়াবেন। মিউর্‌সো এবং মারি-র মধ্যে যৌন সম্পর্ক আছে অথচ মিউর্‌সো মারিকে ভালবাসে না। একদিন সন্ধ্যায়, মারি মিউর্‌সোকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মিউর্‌সোর উত্তর, কামুর ভাষায় : I said I didn't mind; if she was keen on it, we'd get married। স্বভাবতই মারি ক্ষুব্ধ হয়ে পুরনো প্রশ্ন করল যা কামুর ভাষায় : Then she asked again if I loved her. I replied, much as before, that her question meant nothing or next to nothing—but I didn't. কেন মিউর্‌সো মারি-কে "ভালবাসি" এ শব্দটি বলতে পারে না? মারি চাইলে মিউর্‌সো তাকে বিয়ে করতে রাজী অথচ ভালবাসতে অক্ষম। কেন? কারণ মিথ্যে বলতে জানে না এবং "ভালবাসা" ধারণাটি সার্ত্র-র ভাষায় above all, the words, "to love" are meaningless. এরপর মারি সরাসরি প্রশ্ন করে : 'Why marry me?' এর উত্তরে মিউর্‌সো সেকথা যেভাবে বলেছিলেন তার বর্ণনা কামুর ভাষায় : I explained that it had no importance really but, if it would give her pleasure, we could get married right away. স্বাভাবিকভাবেই মারি মন্তব্য করে বিয়েটা কিন্তু সিরিয়াস ব্যাপার। মিউর্‌সো-র ছোট্ট উত্তর – না। এরপর মারি কিছুক্ষণ মৌন থেকে প্রশ্ন করল : 'Suppose another girl had asked you to marry her—I mean, a girl you liked in the same way as you like me—would you have said "Yes" to her too?' মিউর্‌সো-র খুব ছোট্ট উত্তর—'Naturally'। ভালবাসা ও বিয়ের প্রতি মিউর্‌সো-র এই ধরনের মন্তব্যকে মারিয়া মোটেই সহজভাবে গ্রহণ করে নি। এই ঘটনা দুটি তার জীবনে মোটেই ছেলেখেলার বিষয় নয়। সে কিছুক্ষণ মৌন থাকল। তারপর আহত মারি মিউর্‌সো-কে বলেছিল : 'A queer fellow'। নিরুত্তর মিউর্‌সো-র প্রতি তার আরো মন্তব্য : And I dare say that's why I love you. – But may be that's why one day I'll come to hate you.' এরপরেও মিউর্‌সো নিরুত্তর ছিল।

এদের ভালবাসা, ঘৃণা, বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তার মধ্যে কামু যে চিত্র তুলে ধরলেন তা আরো স্পষ্ট হয়েছে *The Myth of Sisyphus*-এ। সেখানে ভালবাসার পরিণতিকে তিনি যে ভাষায় লিখেছেন : There are days when···you find that the person you've loved has become a

stranger. এই সম্পর্ক ও পরিণতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্র মন্তব্য করেছেন : The stranger is, finally, myself in relation to myself, that is, natural man in relation to mind : The stranger who, at certain moments, confronts us in a mirror."

॥ ৩ ॥

সাহিত্যচর্চার মধ্যে কামুর এই দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলনকে সার্ত্র বিশদভাবে বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কামুর দর্শন কি সাহিত্যকে এগিয়ে দিতে পেরেছে? সাহিত্য যদি দর্শনের গভীর সমস্যা, বিতর্ক ও মতামতের মধ্য দিয়ে পথ করে নেয় এবং পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ ও আচ্ছন্ন করে তবে তা খুব সামান্য কথা নয়। (সার্ত্র তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে কামুর *The Outsider* সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন সেগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি না বলাই বাহুল্য, কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে সার্ত্র কামু-র *The Outsider* সম্পর্কে যা যা মন্তব্য করেছেন তাকে শুধু অবিকৃতভাবেই এই ছোট্ট প্রবন্ধে আমি বর্ণনা করেছি মাত্র।) কেন ও কীভাবে কামু সফল হলেন? সার্ত্র-র বিশ্বাস, কামু যা লিখেছেন তার ভিত্তি হল 'a certain kind of dry plain, contemplative rationalism' যা বিশেষভাবেই ফরাসী চিন্তা-চেতনার প্রতিচ্ছবি এবং সাধারণভাবে 'classical pessimism'-এর অভিমুখী। অর্থাৎ মানুষের চিরন্তন দুঃখ, হতাশা দারিদ্র্যের কারণ গভীরভাবে খুঁজলে এমন কি কোন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে যা আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারে? যদিও প্যাসকেল আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত তবুও কিন্তু তিনি কামুর উক্তি—'the world is neither (completely) rational, not quite irrational either'-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের যন্ত্রণা ও কষ্টের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী মানুষ নিজেরাই। এবং একথাই কামু the cool style of *The Myth of Sisyphus*'-এ বর্ণনা করেছেন যার ফলশ্রুতি সার্ত্র-র ভাষায় : M. Camus take his place in the great tradition of those French moralists whom Andler has rightly termed the precursors of Nietzsche. ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে থেকেও কামুর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি 'the scope of our reasoning powers'-এর প্রতি সন্দিগ্ধ হয়েছেন, যা ফরাসী জ্ঞানতত্ত্বের সর্বাধুনিক ট্রাডিশন।

পোয়ঁকারে, ডুহেম ও মেয়ারসন-এর 'scientific nominalism'-এর বিষয়বস্তুর কথা ভাবলেও কামুর বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়। *The Myth of Sisyphus*-এ কামু লিখেছেন : কেউ হয়ত তাঁকে অদৃশ্য গ্রহপুঞ্জের কথা বললেন যেখানে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে। কেউ হয়ত এই কল্পনার সাহায্যে তাঁর কাছে জগতকে ব্যাখ্যা করলেন। অথচ কামু শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করলেন যে তাঁকে যা বোঝান হল তা একটি কবিতা। এ ধরনের অনেক কথাই মরলো পান্টি লিখেছেন। যাই হোক, সার্ত্র-র ধারণায় কামু তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জ্যাসপার, হিডেগার, কিয়ের্কেগার্দ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি যে খুব দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছেন তা বলা যায় না।

সাহিত্যে কামুর এই দার্শনিক চেতনার প্রতিফলন হয়েছে তাঁর নিজস্ব technique-এর মাধ্যমে। কী এই technique-এর বৈশিষ্ট্য? অনেকের মতে—It's Kafka written by Hemingway। সার্ত্র এই মন্তব্যকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর ধারণায় কামুর টেকনিকের মধ্যে কোথাও কাফকা-র স্টাইলের কোন প্রভাব নেই। উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে সার্ত্র লিখেছেন : M. Camus' view are entirely of this earth and Kafka is the novelist of impossibie transcendence; for him, the universe is full of signs that we cannot understand; there is a reverse side to the decor. For M. Camus on the contrary, the tragedy of human existence lies in the absence of any transcendence. মানুষকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবী ও প্রকৃতির যে কোন অর্থ বুঝতে কামু তাই অসমর্থ। কারণ মানুষের অস্তিত্ব ও তাৎপর্যকে দূরে সরিয়ে অন্য কিছু উপলব্ধির চেষ্টা কামুর কাছে অর্থহীন। সুতরাং কামুর সঙ্গে কাফ্কা-র তুলনা সম্ভব নয়। বরং সার্ত্র-র ধারণায় কামুর লিখন শৈলী হেমিংওয়ে-র অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে সার্ত্র লিখেছেন : Both men write in the same short sentences. Each sentence refuses to exploit the momentum accumulated by preceding ones. Each is a new begining. Each is like a snapshot of a gesture or object. For each new gesture and word there is a new and corresponding sentence. ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে কামুর লিখন শৈলীর এই পদ্ধতিকে সার্ত্র নাম দিয়েছেন : "American" narrative technique। কিন্তু হেমিংওয়ে-র

সঙ্গে কামুর পার্থক্যও রয়েছে। *Death in the Afternoon* রচনায়, সার্ত্র লিখেছেন, হেমিংওয়ে-র মূল বৈশিষ্ট "abrupt style of narration." অথচ *The Outsider*-এ কামুর ভঙ্গি "ceremonious"। সার্ত্র লিখেছেন : ...in *The Outsider* he occasionaly hightens the tone. His sentence then take on a larger, more continuous, movement. সার্ত্র তাঁর এই মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত করতে *The Outside:* থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত সার্ত্র আলোচনার মধ্যে দেখিয়েছেন যে, যে কোন ধরনের ঘটনার পর্যবেক্ষণ অথবা পরীক্ষার মধ্যে আমরা কেবল 'isolated impressions' ছাড়া কিছুই খুঁজে পাই না। আমেরিকান নিও-রিয়ালিস্টরা যখন কোন ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক বা প্রভাবকে অস্বীকার করেন তখন তাঁরাও উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করেন। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে সমসাময়িক দর্শন যে কথা প্রতিষ্ঠিত করেছে তা হল : meaning are also of the immediate data। এই সূত্র আমাদের নিকটবর্তী পরিবেশের সুবিশাল রূপ দেয়। এইসব সমসাময়িক দার্শনিক চেতনার প্রেক্ষিতে সার্ত্র তাই লেখেন: We shall simply indicate that the universe of the absurd man is the analytic word of the neo-realist. সাহিত্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগের সাফল্য প্রমাণিত। তাই আলবেয়ার কামুও analytic world-কে বোঝাবার ও বুঝবার জন্য analytic process-কে অবলম্বন করেছেন এবং হেমিংওয়ে-র কাছে এজন্য তিনি ঋণী। এই analytic process-এর মূল বৈশিষ্ট্য হল ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা। এই বাক্যগুলির মধ্যে যে discontinuity থাকে তা discontinuty of time-এর প্রতীক। সময়স্রোত সম্পর্কে কামুর দার্শনিক প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্র লিখেছেন : Our life has "no future", it is a series of present moments What does this mean, if not that the absurd man is applying his analytical spirit of Time? Where Bergson saw an indestructible organization, he sees only a series of instants. It is the plurality of incommunicable moments that will finally account for the plurality of beings. সুতরাং কামুর লিখনশৈলীকে কেন এত গুরুত্ব দিয়ে সার্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন তা সম্ভবত পাঠকদের কাছে এখন স্পষ্ট। মানুষের উদ্দেশ্য এবং মানুষের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে চতুর্দিকে যে দ্বন্দ্ব তাকেই কামু দার্শনিক প্রত্যয়ের সাহায্যে নিজস্ব স্টাইলে প্রকাশ করেছেন।

জঁা পল সার্ত্রে ও মার্কসবাদ

মুরারি ঘোষ

সার্ত্রে'র প্রথম উপন্যাস Nausea (Les Nausea) বেরিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে, ১৯৩৮ সালে। নায়কের রোজনামচার আকারে লিখিত। নায়ক আঁতোয়াঁ রোকেঁতাঁ দুর্দশাগ্রস্থ, বিশৃংখল, যন্ত্রণাময় জগতের ঘটনাপ্রবাহে বিভ্রান্ত, বিবমিষায় আক্রান্ত। রোকেঁতাঁর কাছে সেই জগৎ কাম্য যা কঠোর শৃঙ্খলাময় অঙ্কের নিয়মে ব্যক্তি মানুষের চাহিদামত গড়ে তুলতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। বেনিয়ম, শৃঙ্খলাহীন জীবনপ্রবাহে রোকেঁতাঁ আক্ষেপে হাহাকারে শেষ পর্যন্ত শিল্পের জগতে মানুষের মুক্তির সংকেত খুঁজে পান। আসলে রোকেঁতাঁর আড়ালে আমরা তার স্রষ্টা সার্ত্রে'কেই খুঁজে পাই। যে সার্ত্রে' ইতিমধ্যে তাঁর অস্তিবাদী দর্শনের প্রাথমিক রচনা Imagination (1936) প্রকাশ করে ফেলেছেন।

বিশৃঙ্খল ও প্রতিকূল জগতের ব্যক্তির অস্তিত্বের মৌল চাহিদাকে সার্ত্রে' ভাববাদের জগতে বেঁধে রাখতে চাননি। শিল্পের কল্পনাময় জীবন বিচ্ছিন্ন অবাস্তবতার অলীক বিশ্বাসের আশা নিয়ে যে রোকেঁতাঁ ভাবময় জগতে বালুস্তূপের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ঝড়ঝড় এড়াতে সচেষ্ট হয়েছিল তার স্রষ্টা সার্ত্রে' শেষ পর্যন্ত এই ভাবালুতা ও স্বপ্নপ্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এবং ধীরে ধীরে জীবন সন্ধানীর তীব্র আকুলতায় মার্কসীয় মানবমুক্তির দর্শনে জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন—সবটা না হোক আংশিক স্বীকৃতি খুঁজে পান।

যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সার্ত্রে'র হাত দিয়ে যে সব নাটক রচিত হয় দি ফ্লাইজ (Les Mouches), নো এক্সিট্ (Huis clos), ক্রাইম প্যাসিওনেল (Les Mains Sales), লুসিফার অ্যাণ্ড দি লর্ড (Le Diable et le Bon Dieu), নেক্রাসভ (Nekrassov), দি কনডেমড্ অফ অ্যাল্টোনা (Les Sequestres d'Altona)—সমালোচকেরা এ-সমস্ত নাটকে বাস্তব পৃথিবীর মনুষ্য রাজনীতির আবর্তন দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন ব্যক্তিমানুষের অসহায়তা—এবং সার্ত্রে' শিল্পের অলীক জগত থেকে মাটির মানুষের কাছাকাছি চলে আসতে চেয়েছেন।

'নসিয়া'র পর সার্ত্রে আর একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন। চারখণ্ডে রচিত উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদের নাম 'পাথস্ অফ ফ্রিডম্' (Les chemins de la liberte)। প্রথম খণ্ড, 'দি এজ অফ রিজ্ন্' (L'Age de raison) ; দ্বিতীয় খণ্ড, 'দি রিপ্রীভ' (Le Suris), তৃতীয় খণ্ড, 'আয়রণ ইন দি সোল' (La Mort dans ame) ; চতুর্থ খণ্ড অসম্পূর্ণ, মাত্র দু' অধ্যায়ে প্রকাশিত 'স্ট্রেঞ্জ ফ্রেণ্ডশিপ' (Drola d'amitie)।

দ্বিতীয় উপন্যাসমালায় সার্ত্রে বাস্তব জগতে ফিরে আসতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম খণ্ডে তাঁর নায়ক ম্যাথিউ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মোহ থেকে মোহান্তরে ভ্রাম্যমান। দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব য়ুরোপে রাজনৈতিক সংকটের চিত্র। তৃতীয় খণ্ডে, বিশ্বযুদ্ধের পর্বে বিধ্বস্ত ফ্রান্সের পরিবেশ—ফ্রান্সের পতন। ঘটনাবর্তে প্রথম খণ্ডের নায়ক ম্যাথিউ-এর প্রত্যাবর্তন। স্বপ্নবিলাসী মোহাক্রান্ত, বিভ্রান্ত ম্যাথিউ যুদ্ধ-বাস্তবতা ও রাজনীতির চাপে যুযুধান নায়কে পরিণত। মাটির পৃথিবীর কঠিন ঘটনাবর্তে জীবনের আদর্শ ম্যাথিউ খুঁজে নিয়েছে পতিত ফ্রান্সের মুক্তি যুদ্ধের সেনানীর ভূমিকায়। এটি প্রায় সার্ত্রের আত্মজীবনীও। জার্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে প্রথমে সার্ত্রের বন্দীদশা (জুন, ১৯৪০), কিছুকাল পরে মুক্তি (এপ্রিল, ১৯৪১) ও গোপনে জার্মাণ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিষ্টদের সহযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ।

যুদ্ধের অন্তিমদশায় (১৯৪৪) সার্ত্রের প্রবন্ধের বই বেরুল, 'অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ' (L' Existentialisme est un humanisme)। তার একবছর আগে বেরিয়েছিল 'জীবন ও শূন্যতা (L' Etre et le neant)। সার্ত্রে সরাসরি আবার তত্ত্বের জগতে প্রবেশ করলেন। তাঁর যুদ্ধপূর্ব অস্তিবাদের ধারণাকে মানবতাবাদী দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে সার্ত্রে মানব সমাজে ব্যক্তির দায়িত্ব, বিশেষ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা সন্ধানীর অন্বেষায় লাগামছেঁড়া স্বাধীনতা-বোধের বিরোধিতা করলেন। প্রার্থিত সামাজিক স্থিতিশীলতা ও দায়িত্ববোধের পরিধিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দাবীতে অপর ব্যক্তির স্বাধীনতায় ও মূল্যবোধে হস্তক্ষেপের সুযোগ যেন না থাকে এ-কথাও বললেন। অস্তিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের সমালোচনার জবাবে সার্ত্রে ক্রমশঃ সমাজ-মনস্ক দর্শনের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকেন। আরো পরে ষাটের দশকে প্রকাশিত দুটি রচনায় Question de Method, 1960 (Problem of Method) ও Critique de la raison dialitique, 1960 (Critique of Dialectical reason)

সার্ত্রে নিজস্ব মানবিকতাবোধ অনুসরণ করে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের দিকে ঝুঁকে এসেছেন।

যুদ্ধশেষে ফ্রান্সের মুক্তির পর সার্ত্রে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নিতে থাকেন। জার্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে মুক্তি যুদ্ধে অংশ নিয়েই সার্ত্রের মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। লড়াই-এর ময়দানে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রায় বিলুপ্ত করে শিল্পের সুললিত জগতে মুক্তি খোঁজার বৃথা চেষ্টা থেকে বেরিয়ে আসেন। নিস্পৃহতার দর্শন থেকে মুক্তি নেওয়ার চেষ্টায় সার্ত্রে এগিয়ে এলেন নৈতিক দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত সমাজ-মনস্ক দর্শন গড়ে তোলার কাজে। এই খানেই মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর অস্তিবাদী দর্শনের এক মিলন ভূমি পেয়ে গেলেন।

১৯৪৫ সালে সার্ত্রের মাসিকপত্র Les Temps Modernes বেরোয়। রাজনৈতিক দল সম্পর্কহীন বামপন্থী চিন্তাধারার স্বাধীন মুখপত্র হিসাবে। এই পত্রিকাতেই সার্ত্রের রাজনীতি, সমাজনীতি, দার্শনিক চিন্তার ফসল প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে সার্ত্রে নিজেই একপন্থী রাজনৈতিক দলের জন্ম দিলেন, যার ইংরেজি নাম, 'রিপাব্লিক্যান ডেমোক্র্যাটিক র‍্যালি'। এই দলের জীবন মাত্র তিন বছরের। ১৯৫২ সালে সার্ত্রে দল তুলে দিলেন। এবারে নিজের চেষ্টায় ফ্রান্সের কমিউনিষ্টদের বন্ধু সহযাত্রী হিসেবে কাছাকাছি চলে এলেন। এর পরেই সার্ত্রেকে বামপন্থী মিছিলে, ময়দানে, রাস্তায় জনতার সঙ্গী হিসাবে দেখা যেতে লাগলো। ১৯৬৯ সালে আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে সাংগঠনিক অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করেন সার্ত্রে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। স্টকহল্‌মে যে সংস্থা স্থাপিত হল 'ভিয়েতনাম যুদ্ধ অপরাধের বিচার সভা'—সার্ত্রে হলেন তার সভাপতি।

অথচ এই সার্ত্রে অস্তিবাদী দর্শন গড়ে তোলার অন্তত দশবছর আগে (১৯২৫) মার্কসের 'ক্যাপিটাল' ও জার্মান ইডিওলজি' পড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনের পাঠস্পৃহা মার্কসবাদে আকর্ষণ আনে নি। জানা যায় হুসার্ল ও হাইডেগার-এর রচনা তখনো তিনি পড়েন নি। পরে হুসার্ল ও হাইডেগার-ই সার্ত্রের দর্শন-গুরুরূপে চিহ্নিত হলেন।

সার্ত্রের দর্শন

তিনটি প্রাথমিক রচনায় দার্শনিক সার্ত্রের দর্শন চিন্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্যনীয়। রচনাগুলি হোল, ১. **L' Imagination, 1936 (Imagination),** ২. **Esquise d' une theorie des emotions, 1939, (Sketch for a**

theory of emotions); ৩. L' Imaginaire, 1940, (The psychology of Imagination)।

সার্ত্রের অস্তিবাদের শুরুতে রয়েছে ফেনোমেনোলজিস্টদের ছায়া। ফেনোমোনোলজিষ্টদের অর্থাৎ অবভাসতত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে সার্ত্রে তাঁর অস্তিবাদের মোটামুটি পূর্ণরূপ দিতে পেরেছেন। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত পুস্তক L' Etre et le neant, যার ইংরেজী অনুবাদের নাম Being and Nothingness—এই বই প্রকাশিত হবার পরেই সার্ত্রে বিশ শতকের বুর্জোয়া জগতে একজন প্রথম সারির দার্শনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এরপর ১৯৪৬ সালে বেরুল সার্ত্রের L' Existentialisme est un humanisme (Existentialism and humanism), তারপরেই Question de Methode, 1960 (The Problem of Method এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে Critique de la raison dialectique, 1960 (Critique of dialectical reason)।

মানুষের সত্তা বা তার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা হল অস্তিবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য। এমনিতেই প্রায় সমস্ত ভাববাদী দর্শনে মানুষের সত্তা সর্বভূতে বিদ্যমান ঈশ্বর বা এক অতিমানবীয় সত্তা বা শক্তির আংশিক প্রকাশরূপে স্বীকৃত। বস্তুবাদে বা জড়বাদে এই ধারণা স্বীকৃত নয়। এই প্রসংগে দেকার্তের প্রসংগ আসে। ঐ রকম কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে দেকার্তে ব্যক্তিসত্তার ধারণায় আসতে চান নি। ব্যক্তিসত্তার ধারণায় দেকার্তে তাকে চিহ্নিত করেছেন চৈতন্যশীলতা দিয়ে, অর্থাৎ, ব্যক্তিকে চিনতে হবে তার চৈতন্য দিয়ে—চেতনা সমন্বিত হয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও পরিচয়। চৈতন্যশীল এই ব্যক্তিসত্তার ধারণা সার্ত্রের মতবাদেরও ভিত্তি স্বরূপ। কেবল ঐ-টুকুই।

চৈতন্যের ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিসত্তার চৈতন্য-অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণায় সার্ত্রে দেকার্তের সঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ভাববাদীদের মত চৈতন্য এবং ঈশ্বর একীভূত করে না দেখলেও দেকার্তে শেষ পর্যন্ত চৈতন্য-অতিরিক্ত বিষয়ের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে ঈশ্বরে এসে ঠেকেছেন। কিন্তু সার্ত্রের মতবাদে সর্বত্রই ঈশ্বরের ধারণা অলীক ও অপ্রয়োজনীয়। মূর্ত ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুধু সার্ত্রেই নন সকল অস্তিবাদী দার্শনিক-ই সেই বিশ্লেষণকে যে-কোনো রকম ধর্মীয় অতিলৌকিক অমূর্ত ধারণা থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন।

অস্তিবাদীরা সরাসরি বলছেন মানুষের লৌকিক অস্তিত্ব কোনো অতিমানবীয়

শক্তি অথবা ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্রে বলেছেন মানুষের সত্তা বা স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয় বা নির্ণীত হয় প্রত্যেকটি মানুষের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দিয়ে—পৃথক ব্যক্তিত্বের প্রকাশে। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত জগতের ধারণায় যেমন বলা হয় পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বচিহ্নিত ধারণার পথে মানুষের ভূমিকা বাস্তবায়িত হচ্ছে—সার্ত্রে তা বলছেন না। সার্ত্রের মতে, পৃথিবীতে মানুষ তার নিজস্ব সত্তা নিজেই নির্ণয় করে নেয়। ব্যক্তিসত্তা স্থানকালের অধীন—ঈশ্বরের অধীন নয়—ব্যক্তিসত্তার মূল লৌকিক জগতের মধ্যেই সীমিত।

নিজস্ব সচেতনতা থেকে মানুষ পায় সক্রিয়তা। সচেতনতা ও সক্রিয়তার সাহায্যে প্রতিটি মানুষ পরিস্থিতি বিচারে নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করে এবং ঐ লক্ষ্য চরিতার্থ করার পথে এগিয়ে আসে। লক্ষ্য স্থির করা এবং লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা মানুষের সত্তা নির্ধারণ করে দেয়। এই যে ব্যক্তিসত্তার ধারণা, যে সত্তা চলিষ্ণু—স্থানকালের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় নিজস্ব চেতনার তাগিদে সক্রিয়তার জন্ম দিয়ে এগিয়ে চলা ও নিজস্ব সত্তা গড়ে তোলা—এইখানেও মার্কসবাদের সঙ্গে সার্ত্রের এক মিলনভূমি গড়ে উঠেছে। আর একটু এগিয়ে এসে মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিশীলতা স্বীকার করে নিয়েছেন সার্ত্রে। মানুষের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধিক জীবন এক কথায় সমগ্র ভাবজগৎটি বস্তুজগতের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর পশ্চাতে বা প্রেরণায় রয়েছে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই মৌল বক্তব্য সার্ত্রে স্বীকার করেন। সেই একই সূত্র ধরে সার্ত্রেও চিন্তা ও যুক্তির পারম্পর্য বজায় রেখে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক বিকাশ-জনিত কারণে শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীসম্পর্ক ও শ্রেণীসংঘর্ষ—মার্কসবাদের এই মৌলিক ধারণাগুলিকে মেনে নিয়েছেন। ঐ পর্যন্তই। এরপর সার্ত্রে আর এগোননি। ইতিহাসে বস্তুজগতের প্রাথমিক গুরুত্ব এবং সমাজের দ্বান্দ্বিক সঞ্চরণশীলতা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুর অবস্থাও যে দ্বান্দ্বিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় এমন কথা মেনে নেননি। মেনে নেননি বিশ্বপ্রকৃতির ঐক্যকে, যার মধ্যে মানবসমাজ ও বস্তুজগৎ বিধৃত রয়েছে শর্তাধীন বিশেষ বিশেষ নিয়মের আবর্তে—ঐ নিয়মের সূত্রগুলি বিশ্ব প্রকৃতির ঐক্যের সন্ধান দেয়।

মার্কসবাদী সার্ত্রে

অস্তিবাদের দুটো ধারার কথা সার্ত্রে বলেছেন, জাসপার যার নির্মাতা ও প্রবক্তা, যে পথ ধরে হাইডেগার আরো জটিলতায় গিয়ে পৌঁচেছেন এবং আদর্শগত তত্ত্বে সেটি সরাসরি মার্কসবাদ বিরোধীপথ। কিন্তু ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে সরে এসে

সার্ত্রে দ্বিতীয় পথটিকে মার্কসীয় তত্ত্বের সহযোগী হিসেবে দেখতে চাইছেন, যা তাঁর মতে মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধী নয়। সার্ত্রে স্বয়ং এই তত্ত্বের নির্মাতা। এই তত্ত্বের পথ ধরেই সার্ত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারায় চলে এসেছেন এবং ঘোষণা করেছেন : "আমরা শ্রমিকশ্রেণীর পাশে থেকে যুদ্ধে নেমেছি এবং চূড়ান্ত ভাবে হৃদয়ংগম করেছি, ইতিহাস ও তার দ্বান্দ্বিক সঞ্চরণশীলতা হল অমোঘ ও নির্দিষ্ট ঘটনা।"

সার্ত্রের এই অস্তিবাদী ধারণায় বলা আছে, মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্য থেকেই অস্তিবাদকে আরো সৌধ নির্মাণ করতে হবে—তা আসলে মার্কসবাদেরই সৌধ, যা অনির্মিত রয়েছে। সার্ত্রে মনে করেন এই অস্তিবাদী পথ মার্কসীয় ধ্যান ধারণাকে আরো এগিয়ে দেবে কেননা বিশ্বের সার্বিক জ্ঞানের পথ মার্কসের পথানুসরণে এক তাত্ত্বিক বন্ধ্যাত্বের দেয়ালে এসে থমকে গেছে। আরো পরিষ্কার করে সার্ত্রে বলছেন, "মার্কসবাদ চিন্তা বা ধারণার মধ্যে মানুষকে পেতে চেয়েছে। কিন্তু অস্তিবাদ মানুষকে তার অস্তিত্বের মধ্যে খুঁজে নিয়েছে, পেয়েছে তার কর্মজগতে, গৃহ-পরিবেশে, রাস্তায়। কিন্তু তাই বলে সার্ত্রে মনে করেন না যে মার্কসীয় তত্ত্ব নিজের প্রাণশক্তি শেষ করে এনেছে। তাঁর মতে, 'মার্কসবাদ এখনো নবীন, সবে তার বিকাশলাভ ঘটতে শুরু করেছে। এই দর্শন এ-যুগের দর্শন। আমরা একে পেরিয়ে যেতে পারবো না—যে পরিবেশে এই দর্শনের জন্ম সেই পরিবেশের বাইরে আমরা নই।'

সার্ত্রের মতে মার্কসীয় পরিবেশের বাইরে চলে এসে পথ খুঁজে পাবার উপায় নেই। তাঁর মতে অস্তিবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো বিরোধ নেই। মার্কস-বাদের তাত্ত্বিক হাতিয়ারে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে অস্তিবাদ এবং মার্কসীয় ধ্যান-

ধারণার মধ্যে থেকেই অস্তিবাদ বন্ধপথের আগল খুলে দেবে। আসলে মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যেই নাকি রয়েছে—ঐ তত্ত্বের অস্তিবাদী ভিত্তভূমি।[৬] ইতিহাসের পথ ধরেই অস্তিবাদকে মার্কসীয়পথের সপ্রাণতা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালেই সার্ত্রের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের যোগাযোগ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ফ্রন্ট কমিউনিষ্টরা গড়ে তোলেন ও নেতৃত্ব দেন। ঐ ফ্রন্টে সার্ত্রে এসে যোগ দিলেন। কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিকদের সঙ্গে শুরু হল সার্ত্রের নিজস্ব দর্শনের আলোচনা ও বিতর্ক। যুদ্ধ অবসানে ফ্রান্সের সাম্যবাদী পত্রিকা (Action) সার্ত্রেকে তাত্ত্বিক বিতর্কে আহ্বান জানালো। এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম সার্ত্রে মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মিল কোথায় এবং কতখানি তার কিছু প্রকাশ্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।[৭] ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মহলে সার্ত্রেকে নিয়ে বিতর্ক সময়ে সময়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কেননা সার্ত্রে নিজেই তাঁর পত্রিকা মারফৎ বক্তব্য উপস্থিত করতে ক্লান্ত ছিলেন না। তবু তিনি মার্কসবাদের আনুগত্য থেকে সরে আসতে চান নি। দলের বাইরে মার্কসবাদ বিশ্বাসী তাত্ত্বিক বলে তাঁর সম্পর্কে একটি ধারণা ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবি মহলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

সার্ত্রের জীবনসংগীনী শ্রীমতী বোভোয়া বলছেন যে, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এসে সার্ত্রের বিশ্বাস হয়ে গেয়েছিল যে কমিউনিষ্টদের বাদ দিয়ে কোন কিছুই করা যাবে না, কিন্তু কমিউনিষ্টরা বেশিদূর এগোতে পারবেন না, ওদের মার্কসবাদ জাগতিক মানবতাবাদের কর্মধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। মার্কসবাদী মানবতাবাদকে প্রাণসঞ্চার করতে পারে অস্তিবাদ[৮] —এই হল সার্ত্রের ধারণা।

মার্কসবাদকে অস্বীকার করে নয় বা অতিক্রম করে নয়, অস্তিবাদী ধ্যান ধারণাকে মার্কসীয় চিন্তাধারার অন্তর্গত প্রাণসঞ্চারকারী তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেও ঘটনাচক্র স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সার্ত্রেকে কমিউনিষ্টদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে সাহায্য করছে। অস্তিবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা এবং সার্ত্রের দার্শনিক প্রেরণাস্থল হাইডেগার তাঁর তাত্ত্বিক

৬। তদেব পৃঃ ১৭৭।

৭। "A propos de l'existentialisme mise au point"—Action, December 29, 1944।

৮। S. de Beauvoir, Force of Circumstances, পৃঃ ৭।

মডেল নিয়ে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে একাসনে বসার পরিবেশ তৈরী করে নেন। অন্তত অস্তিবাদের এই পরিণতি বা প্রত্যাশিত পদস্খলন সার্ত্রের প্রতি মার্কসবাদীদের বিরূপ করবেই। তবু কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সার্ত্রে এক আন্তরিক যোগাযোগ রেখে চলার চেষ্টা করতেন। যেমন, ফ্রান্সের কমিউনিষ্টরাও ব্যাপক বামপন্থার চৌহদ্দি থেকে সার্ত্রেকে দূরে ঠেলে দিতে চাননি। সার্ত্রের সহায়তা তাঁদের কাছেও কাম্য ছিল দেশ জুড়ে এক সার্বিক বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে তোলার আগ্রহে—অন্তত সার্ত্রের মার্কসবাদের প্রতি যতটুকু আগ্রহ ও আনুগত্য আছে শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে তা যথেষ্ট মূল্যবান বলে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করতেন।

সার্ত্রের সমালোচনায় মার্কসবাদী গোষ্ঠী

সার্ত্রের Being and nothingness বইটির আদ্যোপান্ত সমালোচনা একের পর এক ফ্রান্সের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা করেছেন, যাদের মধ্যে ছিলেন আঁরি লেফেব্‌য়ের, আঁরি মগ্যাঁ, জঁা কানাপা, রোজার গারুদী, পিয়ের হার্ভে এবং আরো অনেকে। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ছিলেন জর্জ লুকাক্‌সও।[১]

মগ্যাঁ দেখিয়েছেন ফ্রান্সের ভাববাদী দার্শনিকেরা তাত্ত্বিক পথে অগ্রসর হয়ে সময়, ইতিহাস ও মানবিক কর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বদ্ধ পথের দেয়ালে এসে আটকে পড়েছেন। ফলে, জড়বাদী ও ভাববাদী অধিবিদ্যায় (Metaphysics) তাঁরা কেবল ঘুরপাক খেয়েছেন। কেবল তাঁদের এই দোলাচলতা থেকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে সার্ত্রের অস্তিবাদ তাত্ত্বিক সৌধ নির্মাণ করেছে, যদিও ভাববাদী দর্শনের সীমাভূমিতে থেকে তা সম্ভব নয়। মগ্যাঁর মতে সার্ত্রে আদৌ ভাববাদের সীমাক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

লেফেব্‌য়ের বললেন, অস্তিবাদের সহায়তায় মানবতাবাদী দর্শনের সৌধ গড়ে তুলতে চেয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক রোমান্টিক ধারণায় এসেছেন সার্ত্রে। এই রোমান্টিক ধারণার মূলে কাজ করেছে নার্সিসাসসুলভ আত্মবোধ। এই আত্মবোধের তাড়নায় ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড হতাশা, বঞ্চনাবোধ ও অসহায়তাকে

১। Henri Lefebvre, L' Existen, (1946).
Henri Moguin, La Sainte famille existentialiste, (1947).
Jean Kanapa, L' Existentialisme n'est pas un humanisme, (1947).
George Lukacs, Existentialisme ou Marxisme, (1948).
R. Garudy, Le Communisme et la morale, (1947).

প্রকট করে তুলেছেন সার্ত্রে। মার্কসবাদ ও সার্ত্রের অস্তিবাদের তুলনামূলক অবস্থান লেফেব্‌রেরের ভাষায় এই রকম : মার্কসবাদের মৌলবিষয় মানুষ, কিন্তু সেই মানুষ সমাজায়ত ও বিশ্বপরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অস্তিবাদের মানুষ প্রাথমিকভাবে নিজেকে নিয়েই আত্মগত—জড় জগতের পীড়নে হাহাকার করলেও তার মূল রয়ে গেছে, আত্মগত চিন্তার বিষয়িতায় (subjectivity)। লেফেব্‌রেরের মতে সার্ত্রের অস্তিবাদ খণ্ড খণ্ড ব্যক্তি চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত ক্রিয়ায় মানুষকে হতাশার নরক থেকে মুক্তি দেবার দর্শনে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছে, সেই সূত্রে ইতিহাসের শ্রেণীচিন্তার দর্শনে তার আত্মসমর্পণ। মানব গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগও সার্ত্রে সেই একই সূত্রে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ব্যক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয় নি বরং তা ব্যাখ্যাত হয়েছে মানবগোষ্ঠীর শ্রেণীগত পরিবেশের অধীনে। ঐ পরিবেশে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর সমাজচেতনা ও সমষ্টিগত ঝোঁক তাকে বিদ্রোহী করে তোলে একটি সামগ্রিক মুক্তিকামী দর্শনের প্রভাবে ও প্রেরণায়। এখানে জোর পড়ছে ব্যক্তিমানুষের উপর নয়, বিশেষ শ্রেণীর উপর। জোর পড়ছে না খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিত্ববোধের ওপর, জোর পড়ছে, বিশেষ সমাজব্যক্তিত্বের উপর—যে ব্যক্তিত্ব মানসিকভাবে বঞ্চনাবোধের পীড়নে দলিত হলেও শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অগ্রগতির অধীন।

একদা য়ুরোপীয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের পুরোধা লুকাকস্ ফরাসী ভাষাতেই তাঁর অস্তিবাদ সমালোচনা প্রকাশ করেন। লুকাকস্ বলেছেন, মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তির মুক্তিতত্ত্ব যথার্থ চরিতার্থ হতে পেরেছে। বিশেষ করে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির মুক্তি-সম্ভাবনা প্রোজ্জ্বল। উল্টোদিকে, সার্ত্রে ব্যক্তির যে ধারণায় এসেছেন সেখানে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ নির্বিচার স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক চলবে না। ফলে, এই ব্যক্তিত্বচেতনা সামগ্রিকভাবে কোনো নিয়মের অধীন নয়। অনিয়ন্ত্রিত এবং অযৌক্তিক (Irrational) ব্যক্তি-মানুষের পছন্দ-অপছন্দের প্রবণতা সমাজের চাহিদা মেনে চলে না। ফলে, ইতিহাস ও সমাজ-বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তি-মানুষের আচার-আচরণ হবে পরস্পর বিরোধী, আত্মকেন্দ্রিক ও শৃঙ্খলাহীন। আত্মকেন্দ্রিক আচরণের দায় কেবলমাত্র অন্যের সঙ্গে কোনো মিলনের সুস্থিরতা গড়ে তোলে না। লুকাকস্ মনে করেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণার জটিলতা নিয়ে সার্ত্রে মার্কসীয় দর্শন সঠিক হৃদয়ংগম করতে পারেন নি।

বিজ্ঞান-মার্কসবাদ ও সার্ত্রের অস্তিবাদী-দর্শন

সতীনাথ চক্রবর্তী

মানুষের স্বরূপ ও সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ও জিজ্ঞাসা আজ আর নিছক ব্যক্তি বিশেষের একান্ত মনস্তাত্ত্বিক উদ্বিগ্নতার ব্যাপারমাত্র নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের যুগান্তকারী কীর্তির নিত্য-নতুন দৃষ্টান্তে মানুষ নিজের সম্পর্কে আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়ে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারনা ক্রমশ স্পষ্টতা লাভ করছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, বিবর্তনতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদির আলোকে মানুষকে নিয়ে মানুষের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অন্বেষণের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

দেশকালসাপেক্ষ প্রকৃতি ও সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব-বিরোধের সূত্রেই যে ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভব ও বিকাশ—এ সত্য আজ বহুলাংশে স্বীকৃত। সুতরাং ব্যক্তিরূপে কোনো মানুষের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-চেতনা, ভয় উৎকণ্ঠা ইত্যাদি সকল মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিসংবাদ যে মূলতঃ তার বিশ্বগত জীবন সমাজ-সম্পর্ক দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত-মার্কসবাদের মর্মগত এই বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিবাদই হলো সমকালের অস্তিবাদ।

দুই বিশ্বযুদ্ধ অন্তবর্তী ও পরবর্তীকালে বুর্জোয়া উদারনৈতিক মতাদর্শের সঙ্কট, সাবেকী মূল্যবোধগুলির দ্রুত অবক্ষয়, নতুন মূল্যবোধ উন্মেষের প্রতীক্ষালগ্নে ফরাসীদেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চিন্তায় বিগতদিনের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাই যেন লক্ষিত হয়। অথচ পূর্ববর্তী দার্শনিক দেকার্তের ও ফরাসী 'এনলাইটেন্‌মেন্টের' যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমুখী সমাজচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে নির্বিচারবাদী যুক্তিবিরোধী এক রহস্যময় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদ-ই প্রাধান্য পায়। এহেন দৃষ্টিভঙ্গী তৎকালীন পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের আঘাতে দীর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অসহায়তারই এক প্রক্ষিপ্ত প্রকাশ।

২

মার্কসের সমসাময়িক কীয়েকেগার্দের দর্শনেই বিষয়িতা (Subjectivity)

অথবা সন্ময়তা-সর্বস্ব চিন্তার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। কীয়েরকেগার্দ মানুষকে কোনো বিমূর্ত-প্রত্যয় বা সাধারণ নীতির মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চাননি। হেগেলের বিষয়গত ভাববাদে বিশ্বসহ মানুষ বুদ্ধির কড়া নিয়মে বাঁধা। সেখানে মানুষের স্বাধীনতা নেই, নৈতিকতার মূল্য নেই। তাই হেগেলীয় চিন্তার বিরুদ্ধে কীয়েরকেগার্দের প্রতিবাদ তিনি মানুষকে কোনোভাবেই নিছক বস্তুরূপে দেখতে চাননি; বরং ইচ্ছা, অনুভূতি, আকুতি, বেদনা, শূন্যতাবোধ ও উৎকণ্ঠায় অস্থির ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত এবং কর্মধারা নির্বাচনের সম্ভাব্যতাকে তিনি অস্তিত্বের অর্থময়তার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের দূরত্বকে অতিক্রম করার আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই মন্ময় মানুষের তন্ময় সত্যের অধিকার। যেহেতু ঈশ্বর কেবল মন্ময়তায় (Subjectivity) সত্য সেহেতু বস্তু নিঃসম্পর্কেই ব্যক্তি মানুষেরও সত্য পরিচয়রূপে কীয়েরকেগার্দের কাছে উদ্ভাসিত।

কিন্তু নীটশে যখন এ বিশ্বে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করলেন এবং মানুষের ইচ্ছা-শক্তির প্রাধান্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষে স্বেচ্ছাবাদী অতিমানবের (Superman) ইতিহাস সৃষ্টির ভবিষ্যত সম্ভাবনার আভাস দিলেন তখন ঈশ্বর অনুজ্ঞা নির্ভর নৈতিকতার আদর্শ বিপন্ন হলেও অতিমানবিক নৈতিকতার আদর্শ শ্রেয়ঃরূপে দেখা দিল। ঈশ্বরে আর মানুষের আস্থা নেই, ধর্মে বিশ্বাস নেই—এ বিশ্বমুক্ত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র বিশ্ব নির্মাণের কাজে আত্মরত। এমন ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই। তাই ইতিহাসের চালিকা শক্তিরূপে এলিট শ্রেণীর অতিমানবের আধিপত্যই অনিবার্য্য ও একান্তভাবে কাম্যরূপে নীটশের চিন্তায় প্রতিফলিত। এমতাবস্থায় যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের প্রাসংগিতা নিরশেষিত হ'ল। আর ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের কাছে দর্শনের মৃত্যু ঘোষণাও সূচিত হলো।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি মাত্রাধিক আগমুত্যের অভিপ্রকাশ, শিল্প-বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ ও যন্ত্রনির্ভর শিল্পের সাহায্যে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা অর্জন ও শেষে বিদেশী বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা যখন ক্রমশঃ আগ্রাসী রূপ নিল তখন ইতিহাসে মানুষের প্রকৃত ভূমিকার চেয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ও মারণাস্ত্রই একমাত্র পরিত্রাতারূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণার ঘটলো অবমূল্যায়ণ। সম্পত্তি নির্ভর পণ্য উৎপাদনকারী ধনবাদী সমাজে নিষ্পিষ্ট মানুষ

তার সৃষ্টিশীল শ্রমের গৌরব হারালো। পণ্যসমাজের পণ্যরূপেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল তার পরিচয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিছক লেন-দেনের অর্থনৈতিক সম্পর্কে হ'ল পর্যবসিত। মানুষ তার নিজ উদ্দেশ্যে নয়, শ্রমিক রূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিছক মুনাফা অর্জনের উপায়রূপে গ্লানিকর এক অমানবিক অস্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে উঠলো। এমন মানুষকে নিয়েই মার্কস তাঁর তরুণ বয়সে আন্দোলিত হয়েছেন। সমাজে কেন মানুষ তার শ্রম থেকে, শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ থেকে, প্রকৃতি সমাজ ও পরিবার এমন কী নিজের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আত্মচ্যুত অস্তিত্বের যন্ত্রণায় কাতর—এই প্রশ্নের অন্বেষণে তরুণ মার্কস ও এঙ্গেলস ব্যক্তি মানুষের সমস্যায় উদ্বিগ্ন হয়েই সমাজ, ইতিহাস, শ্রেণী সংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, শ্রমিক-সংগঠন সমাজ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ধারণায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু মার্কস্ ও এঙ্গেলস-এর এই উত্তরণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। হেগেলের দ্বন্দ্ব পদ্ধতি ইতিহাস চেতনা তথা জার্মান ক্ল্যাসিকাল দর্শন-প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবদান পূর্ববর্তী মানবিক ও সমাজ চিন্তার সকল মূল্যবান কীর্তিগুলির বিচার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ ও ঐতিহ্য স্বীকারের মাধ্যমে মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী এক নতুন বিশ্বদৃষ্টিতে উপনীত হন।

৩

মানুষ সম্পর্কে মানুষের ভাবনা-চিন্তার ইতিহাসের সূচনা বহু পুরাণ। একদিন ছিল যেদিন মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগত, এমন কী নিজের সম্বন্ধেও অনেক কিছুই জানত না; নানা পুরা-কাল্পনিক ধ্যান-ধারণায়, সমাজ প্রচলিত বিশ্বাস ও মোহ মানুষের চিন্তা কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে চলত, হয়তো বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজও করে চলে। তথাপি কর্ম ও চিন্তার সূত্রে জীবন ও অস্তিত্বের অর্থপূর্ণ অন্বেষণে মানুষ দীর্ঘকাল নিষ্প্রশ্ন উদাসীনতায় তার একই প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার দাসত্ব করেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজ বিপ্লব ইত্যাদি মানুষের বহু বিচিত্র কীর্তির ইতিহাসই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ও সক্রেটিসের কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত বহু সত্যান্বেষী বিজ্ঞানী ও মানবদরদী ভাবুক নির্বিচারে গৃহীত প্রত্যয়, নীতি মূল্যবোধ ও জীবন অভ্যাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে সপ্রশ্ন চিন্তা ও কর্মের গুরুত্বকে জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সক্রেটিসের আত্মদান, ব্রুনোর অগ্নিদাহন, গ্যালিলিওর নির্বাসন, ডারউইনের অপমান, মার্কসের লাঞ্ছনা ইতিহাসের বিকাশধারায় তারই কয়েকটি

দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এমন জ্ঞানী গুণী ও মানবপ্রেমী ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা-শাস্তি ও অপমান তৎকালীন শ্রেণী সমাজের রক্ষণশীল শক্তির কাছে কি কারণে অনিবার্যভাবে বাঞ্ছিত ছিল—সেই প্রশ্নের সঠিক বৈজ্ঞানিক উত্তর দানের কৃতিত্ব মার্কস্‌বাদের।

জড়প্রকৃতির অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব-বিরোধের পরিণামের এক বিশেষ স্তরেই নতুন ধর্ম নিয়ে জৈবসত্তারূপে মানুষ যে প্রকৃতি সঞ্জাত মার্কসবাদ এই সত্য স্বীকার করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও সামাজিক ব্যক্তিরূপে মানুষের সকল সৃষ্টিশীল কর্মের প্রকাশ ও বিশিষ্টতাকে শুধু জৈব নিয়মের সূত্রে বা স্তরে নামিয়ে এনে যে ব্যাখ্যা করা চলে না মার্কসবাদ এ কথাও ঘোষণা করে। তাই মার্কসবাদ মানুষের পরিচয় দানে যেমন প্রকৃতিবাদের সর্বাস্বতা স্বীকার করেনা তেমনি বস্তু প্রকৃতির নিয়ম নির্বন্ধ মানুষের ভাব সর্বস্ব স্বেচ্ছাবাদকেও সমর্থন করে না। ডারউনের বিবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রাসংগিতা স্বীকার করেও মার্কসবাদে তাই মানুষের স্বরূপও প্রকৃতি সম্বেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবর্তনা।

নিঃসন্দেহে ব্যক্তি বিশেষ জন্মসূত্রে মাতাপিতার কাছ থেকে এমন কতগুলি উপাদান লাভ করে যেগুলি একান্তভাবে ব্যক্তির নিজস্ব উপাদান বলা চলে। এমন উপাদানগুলির মধ্যেই ব্যক্তির দৈহিক সংগঠনের সমগ্রতা, শক্তি সামর্থ, উৎসাহ, প্রসন্নতা, মেজাজ, প্রক্ষোভ, প্রতিবন্ধকতা, চোখের মণির রং, দৈহিক উচ্চতা, কেশ বর্ণের বিভিন্নতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বিমূর্ত সমাজের মত, মানুষেরও যেহেতু কোন বিমূর্ত সাধারণ (universal) রূপ নেই সেহেতু ব্যক্তি মাত্রেই, এক সঙ্গে অনুপম, অনন্য ও স্বতন্ত্র। তবুও জৈবসত্তারূপে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ এমন কতগুলি অন্যান্য প্রাণীর মত এমন কতগুলি সহজাত প্রয়োজন, প্রবণতা, ক্ষমতা, বেদনাবোধ ও সংবেদনের অধিকারী যেগুলি প্রাকৃতিক জৈবনির্মিতারগুণেই মানুষের ক্ষেত্রেও উপস্থিত। এগুলির মধ্যেই মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, তৃপ্তি, আহ্লাদ, মমতা, অমর্ষ, যন্ত্রণা ইত্যাদি বোধকে সূচিত করে। তথাপি আদিম মানুষের সঙ্গে আধুনিক মানুষের আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য নগণ্য হলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য অপরিমেয়। সুতরাং মানুষের প্রকৃত পরিচয় লাভে নিছক জীববিদ্যা (Biology) অথবা শারীরবিদ্যা (Physiology) কিংবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবিদ্যার (Individual Psychology) নিয়মগুলিই যথেষ্ট নয়।

মার্কস্‌বাদ অনুসারে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর তফাৎ এই যে মানুষ একান্তভাবেই ঐতিহাসিক। মার্কসের মতে মানুষের প্রকৃত পরিচয়কে কোনো বিমূর্ত

প্রত্যয় থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে লাভ করা যায় না। মানুষ যা তাকে সেই ভাবে জানাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য। মার্কস মানুষকে কোনো বিশেষ সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত রূপেই দেখেছেন। সর্বাগ্রে মানুষকে বাঁচতে হয়; আর বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন সিদ্ধির পীড়নেই মানুষকে উৎপাদনশীল ঐতিহাসিক কর্মে নিযুক্ত হতে হয়। এই বাস্তব জীবনের উৎপাদন কর্মসূত্রে যে সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেগুলিকে আশ্রয় করেই মানুষের জ্ঞান ও চেতনা ভাল-মন্দের ধারণা, ধর্ম বিশ্বাস নান্দনিক মূল্যবোধ বিজ্ঞান ও দর্শন জিজ্ঞাসা ইত্যাদি বিশিষ্ট মানবিক ভাব ও কল্পনা উন্মেষিত হয়। অন্য ভাষায় সমাজস্থ ভাব-জগৎ যে মূলতঃ সমাজের বস্তুগত অবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত[১] ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই তত্ত্বগত সিদ্ধান্তটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির অনুসারী হলেও এই সূত্রটিকে নিছক অর্থনৈতিক নির্দেশবাদ[২] (Economic Determinism) বা যান্ত্রিক প্রতিফলনবাদ (Mechanical Reflection Theory) রূপে গণ্য করা চলে না। কারণ মার্কস্, এঙ্গেলস ও লেনিন তাঁদের বিভিন্ন রচনায় (যেমন মার্কসের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি—১৮৪৪ ফয়ারবাকের উপর লিখিত সূত্রাবলী। জার্মান আই ডি ও লজি ১৮৫৯ সালের রাষ্ট্র-অর্থনীতির সমালোচনার ভূমিকার মুখবন্ধ, লেনিনের 'ফিলজফিক্যাল নোট-বুক্স' ইত্যাদিতে) তাঁরা প্রকৃতি ও সমাজের অন্তর্গত নিয়মকে অধিকার করার পথে জ্ঞানের বিষয়ী ও ইতিহাসের রূপকাররূপে প্রকৃতি ও সমাজ বিযুক্ত কোনো নিষ্ক্রিয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে কল্পনা করেন নি : বরং সক্রিয় ঐতিহাসিক মানুষের কর্মের নেতৃত্বে, চিন্তার ক্ষমতায় বস্তুগত সত্যের (Objective truth) অধিকারের দ্বারা প্রকৃতির শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার পথে এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও সামাজিক তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় প্রতিফলন তত্ত্বের প্রবর্তন করেছেন। প্রতিফলন তত্ত্ব ছাড়া আমাদের চিন্তা-চেতনা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বানুগ হলো কিনা সামাজিক কর্মের দ্বারা তা' নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে ইতিহাসের বিকাশ ধারায় কিছু জানার আলোকে আরও কিছু জানার নিরন্তর প্রক্রিয়া রূপে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সঙ্গে বস্তু জগতের, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের প্রতিসঙ্গ কোনোভাবে স্থাপিত হলো কিনা অথবা কার্যতঃ জ্ঞানের তাৎপর্য কী যাচাই করার কোনো ভিত্তিই থাকে না। ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ, জ্ঞান ও কর্ম, চিন্তা ও ব্যবহারের সমন্বয়-সাধন অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাই কর্মকে আলোকিত করতে সত্যকে মানুষ শুধু চিন্তায় প্রতিফলিত করে না তাকে সৃষ্টিও করে। মার্কস ও মার্কসের শিষ্য লেনিন তাঁর 'Philosophical Note book' গ্রন্থে এ সত্য স্পষ্ট

ভাবে উল্লেখ করেছেন 'Man's consciousness not only reflects the objective world but creates it.'[৩] অবশ্য বিজ্ঞানকে যারা নব্য প্রত্যক্ষবাদীর (Neo-positivists) মত জ্ঞান লাভের রীতি প্রকরণ পদ্ধতি ও প্রমাণের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মানদণ্ডকে সর্বস্ব মনে করেন কিংবা বিজ্ঞানকে যারা প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্রিয়া কৌশলগত কাণ্ড কারখানা বলে গণ্য করেন তাঁদের কাছে যা মুনাফা অর্জনের সহায়ক তাই সত্য এমন নীতি অবশ্য-গ্রহণীয় মানদণ্ডই হয়ে ওঠে। মার্কসবাদ নব্য প্রত্যক্ষবাদীর স্থাবর দ্বৈতবাদ (Metaphysical Dualism) কিংবা প্রয়োগবাদীর (Pragmatist) সুবিধাবাদের বিরোধী।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নিয়মের প্রয়োগে সমাজ ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক অন্বেষাই মার্কসবাদের প্রাণ। এমন অন্বেষণে পদ্ধতির গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য হলেও পদ্ধতির জ্ঞান লাভের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। বিজ্ঞানের লক্ষ্য কোনো বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সত্য বা সার ধর্মকে (essence) চিন্তার ক্ষমতায় অধিকার করা এবং যুক্তির সাহায্য সেগুলির ব্যাখ্যা করা। এই যুক্তি যেমন নিখাদ বুদ্ধির সূত্রে লাভ করা যায় না ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ সংবেদনের সমষ্টিতেও সিদ্ধ হতে পারে না। ঐতিহাসিক ও সামাজিক মানুষের কর্মধারায় মানবিক সংবেদন ও বুদ্ধির দ্বান্দ্বিক সমন্বয় ঘটে ও বিশেষের (Particular) মধ্যে সামান্যের (Universal) পরিচয় লাভ সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিক অন্বেষা অবশ্যই প্রশ্নজর্জর অন্বেষা। যে ভিত্তিকে কেন্দ্র করে কোনো একটি বিশেষ বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলি রচিত হয় সেই ভিত্তিই সেই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সূচিত করে যেমন দেশকাল-বস্তু-গতি-শক্তি ইত্যাদির কার্যকারণতা পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সূচিত করেছে ও আজও করে চলেছে। অবশ্য বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে এই জগৎ ও সমাজের সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিকে নির্দ্বান্দ্বিক (Metaphysical) বিচ্ছিন্নতায় স্থির, অনড়, অপরিবর্তনীয়রূপে গ্রহণ করা শেষ সত্য নয়, কেননা বিজ্ঞানের যেমন শেষ প্রশ্ন নেই তেমনি শেষ সত্য (Final Truth) উচ্চারণেরও দাবী নেই। জগৎ সীমাহীন ও অনন্ত তাই ইতিহাসের কোনো বিশেষ যুগে বিজ্ঞান জগৎ ও সমাজের গড়ন ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞান তুলে ধরে তা পরিবর্তনশীল ও বিকাশধর্মী। ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের নিদানে যে বিশ্ব স্থির অনড় বস্তু সমূহের সমাহার মাত্র (Complex of Things) চিত্রিত, বিজ্ঞানের তাৎপর্যে সেই বিশ্ব আজ প্রবাহ (Proess) মাত্র কল্পিত। যে সামাজিক প্রথা, বিধিব্যবস্থা ও সম্পর্ক একদিন শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়রূপে

প্রতিভাত হতো বিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসে সেই পুরাণ চিন্তা আজ বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে পরিত্যক্ত। সুতরাং 'আমরা এই বিশ্বের সবকিছুই জানি এই অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্তকে যেমন মার্কসবাদ গ্রহণ ক'রে না, তেমনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার প্রমাণের ধ্রুবতায় 'আমরা এই বিশ্বের কিছুই জানি না (agnosticism) এমন মিথ্যা নিশ্চয়তাবোধকেও লালন করে না। মার্কসবাদ তাই কর্মের নেতৃত্বে চিন্তার ক্ষমতায় বস্তুগত সত্যের অধিকারকে বিজ্ঞানের জয় ব'লে মনে করে। আর সফল কর্মের জন্মদানেও মানবমুক্তির সহায়ক শক্তিরূপে জগৎটাকে বদলে দেওয়ার কাছে বিজ্ঞানের সার্থকতা ও নবজ্ঞানের সামাজিক—ব্যবহারিক তাৎপর্য বলে স্বীকার করে। সাবেকী বস্তুবাদে এ হেন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপস্থিতির জন্যই মার্কস ফায়েরবাখের সমালোচনা করেন। মার্কস তাঁর Theses on Flurbach রচনায় মানুষ যে তার পরিস্থিতির ফসল একথা স্বীকার করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিস্থিতির অনুশীলনের দ্বারা মানুষ যে সেই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে—এই কথাও ঘোষণা করেছেন।[৪] সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে মানুষ যে তার অবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে পারে মার্কসবাদের মর্মমূলে এই সত্য প্রতিধ্বনিত এবং এই অর্থে মার্কসবাদ আশাবাদী দর্শন। মার্কসের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের সম্ভাবনা নির্ণয় নিছক কোনো কল্পনাশ্রয়ী ধারণামাত্র নয়। সমাজ ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলশ্রুতি। ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের ঐতিহাসিক শক্তিরূপে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকৃতি তাই মার্কস—এঙ্গেলস-এর কাছে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যমণ্ডিত। তথাপি মার্কসবাদ সমাজায়ত্ত ব্যক্তির ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য-কে অস্বীকার করে না। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের প্রসুপ্ত সম্ভাবনা ও প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাগুলির পরিপূর্ণ প্রকাশ তথা আত্মবিকাশের প্রশ্নে শোষণমুক্ত সমাজের অনিবার্যতাকে ত্বরান্বিত করার জন্য তরুণ বয়স থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস শেষ জীবন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং তরুণ ও পরিণত মার্কসের চিন্তার মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি যেমন বিভ্রান্তিকর ও দুরভিসন্ধি-মূলক ঠিক তেমনি মার্কসের মার্কসবাদ থেকে এঙ্গেলস লেনিন ও স্টালিনের সকল চিন্তা ও কর্মকে মার্কসবাদ বিরোধীরূপে বরবাদ করা সুকৌশলে ক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তিকেই (Theoretical basis) নস্যাৎ করা। তাই অর্মাস্তিক হলেও অবস্থাবিপাকে পড়ে 'মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ করার অজুহাতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী আত্মকেন্দ্রিক বিষয়তা-সর্বস্ব আত্মমুখীনতার মধ্য দিয়ে অস্তিবাদকে মার্কসবাদের বিকল্প বা

মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত একটি মতাদর্শরূপে দাবী করা মার্কসবাদের মধ্যে বুর্জোয়া ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানোর একটা প্রচেষ্টারূপেই অনেকের কাছে গণ্য হতে পারে।

একথা ঠিক যে সামাজিক মানুষ হিসাবে সার্ত্রের মহত্ত ও সৃষ্টিক্ষমতা অনস্বীকার্য। ফ্যাসীবাদী আগ্রাসী নীতিতে ফ্রান্স যখন অবরুদ্ধ তখন সার্ত্র এক প্রতিবাদী বিবেকের প্রতীক। প্রতিরোধ আন্দোলনের শরীক, কমিউনিষ্টদের সাথী। আবার ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নৃশংস ও অমানবিক যুদ্ধ অপরাধের বিচার সভায় পরিণত সার্ত্র বারট্রাণ্ড রাসেলের সহযোগী হয়ে মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে উদ্ধত। তথাপি সার্ত্র সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণে আশাহত। অগ্রসরমান সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতা স্থাপনের দৃষ্টান্তে বিভ্রান্ত। ব্যক্তির স্বাধীনতার বিমূর্ত ধারনায় একজন প্রগতিশীল উদার নৈতিক চিন্তার প্রত্যাশী হ'য়ে সার্ত্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজের ভবিষ্যতকে শ্রেণীঊর্দ্ধ ব্যক্তির স্বাধীন নির্ব্বাচন ও কর্ম-চেতনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই সার্ত্রের এহেন দৃষ্টিভঙ্গী তৎকালীন ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিক হেনরী লেফেব-এর (Henri Lefebvre) ও রোজার গারোদী (Roger Garaudy) প্রমুখের তীব্র সমালোচনার বিষয় হ'য়ে ওঠে। তথাপি সমকালীন বিশ্বে সার্ত্র এক সৃজনশীল প্রতিভার অনুপম দৃষ্টান্ত।

অস্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তারূপে কীয়েৰ্কেগার্দ (Kierkegaard) ও হুসার্ল (Husserl) হাইডেগার (Heidegger) ও কামু (Camus), জ্যাসপার্স (Jaspers) ও মার্সেল (Marcel) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য হ'লেও এই দর্শনের বহুল জনপ্রিয়তার মূলে সার্ত্রের অবদান সর্ব্বাধিক। নাটক, উপন্যাস, বহুবিধ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক রচনা, বক্তৃতামালা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সার্ত্রের ভাবমানসের রূপান্তর ও বিকাশ।

8

সার্ত্রের দার্শনিক ধ্যানধারণার বিবর্তনের প্রথম পর্য্যায়ে দেকার্ত (DeyCarty) কান্ট (Kant) ও হুসার্লের (Husserl) প্রভাবই প্রধান। দেকার্তের দার্শনিক সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যে যে বিশ্ব জড় (Matter) ও চৈতন্যের (Consciousness)

নির্দ্বান্দ্বিক বিচ্ছিন্নতায় দ্বিধা বিভক্ত সেখানে সকল সংশয় অস্বীকৃত ও নিরাকরণের মূলে সংশয়কর্তারূপে মানুষের আত্মচেতনার নির্দেশনান্বিত উপস্থিত। সেখানে চিন্তার স্পষ্টতা ও বিরোধহীনতায় সত্য সংহত। জড় জগত বিযুক্ত আত্মজ্ঞানের স্বচ্ছতায় মানুষ অস্তিত্ববান। উত্তম পুরুষের মনময়তায়ও আত্মচেতনার সাক্ষাৎ-প্রীতিতেই তাই দেকার্তের দর্শনে অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ, সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের প্রথম সূত্রেরও প্রত্যভিজ্ঞা এক অনতিক্রম্য দ্বৈতবাদই (dualism) কার্তেজীয় বিশ্ব-দৃষ্টির মর্মবস্তু। দেকার্তের দ্বৈতবাদে তাই প্রতিফলিত সাবেকী ভাববাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিরোধ এবং জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ (rationalism) ও প্রত্যক্ষবাদের (emperieism) সংঘাত। নিউটনীয় বিজ্ঞানের সাফল্যে মুগ্ধ হ'য়ে কাণ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কাঠামো নির্মাণে বুদ্ধির সক্রিয়তা যুক্তির সার্বজনীনতা (universality) ও সংবেদনের বিশিষ্টতা (particularity) স্বীকার করলেও সুসংহত বিশ্বদৃষ্টি (world view) রচনায় বিজ্ঞানের তাৎপর্য তিনি শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেন ফলে বিজ্ঞান অজ্ঞাবাদের (agnosticism) কানাগলিতে পথ হারায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশের সকল সম্ভবনাও খণ্ডিত হয়। জ্ঞান বিশ্বানুগ হওয়ার পরিবর্তে বিষয়ীর (Subjeet) অন্তরগত বৃত্তে সীমাবদ্ধ হ'য়ে দ্বৈতবাদেই প্রত্যাবর্তন করে। দ্বৈতবাদের মূলে রয়েছে পূর্ব্বভাবনা। এমন পূর্ব্ব ভাবনার (Presupposition) বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভঙ্গীর প্রকাশই হুসার্লের অতীন্দ্রিয় অবভাষতত্ত্ব (Transcendental Phenomenology) ও সার্ত্রের অস্তিবাদী নৃতাত্ত্বিক দর্শন। সার্ত্রের বয়স যখন ৩১ বৎসর তখন ১৯৩৬ সালে তাঁর যে রচনা প্রকাশিত হয় তার নাম L' Imagination (Forrest Williams এর দ্বারা অনুবাদকৃত নাম—The imagination) আর ১৯৪০ এ Bernard Frechtman কর্তৃক অনূদিত The Psychology of Imagination প্রকাশিত হয় সার্ত্রের L' imaginaire psychologic phenomenlogique de l' imagination রচনাটিকে অবলম্বন ক'রে। দুটি রচনাই প্রতিরূপ (image) এবং কল্পনা ক্রিয়া (act of imagining) সম্বন্ধীয় দর্শন সমৃদ্ধ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সার্ত্রের বিশেষ অবদানকে সূচিত করে।

বিশ্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তি অন্বেষণে হুসার্ল বিশেষ বিশেষ বস্তুসমৃদ্ধ বিশ্বকে বন্ধনী যুক্ত করে (bracketing off) চেতনার ধর্মরূপে বিষয় মুখীনতার (intentionality) সূত্রে চেতনার গঠন-ভঙ্গিমার (structure) পরিচয় দেখেছেন।

হুসার্লে'র অতীন্দ্রিয় অবভাসতত্ত্বের সূত্রেই সার্ত্র প্রতিরূপকে নিছক বস্তুরূপে (thing) নয়, কল্পনারই এক বিকাররূপে দেখেছেন। সার্ত্রে'র কাছে চেতনা কোনো স্থির অনড় অবস্থা নয়, চেতনার ক্রিয়াশীলতাই চেতনার ধর্ম। কল্পনাকারী চেতনা (Imagining Consciousness)-তেই সকল বাধা বন্ধহীন মুক্ত অস্তিত্বের অধিকার। চেতনার নঞর্থীকরণের ক্ষমতাতেই চেতনার পরম পরিচয়। দেকার্তের দর্শনে চিন্তার বিষয়ীরূপে যে ব্যক্তি উত্তম পুরুষের ভূমিকায় স্বপ্রকাশিত সেই ব্যক্তিই সার্ত্রে'র দর্শনে কল্পনার বিষয়ীরূপে চিত্রিত। অস্তিবাদী দর্শনে মানুষের অস্তিত্বের মৌল বৈশিষ্ট্যরূপে যে স্বাধীনতা ও স্বাধীন নির্ব্বাচনের গুরুত্ব স্বীকৃত সে স্বাধীনতা তাই একান্তভাবেই নির্বোধ এবং সে কারণেই কাল্পনিক বিমূর্ত। সার্ত্রে তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত ও বহু সমালোচিত দার্শনিক রচনা 'Being and Nothingness' (১৯৪৩) গ্রন্থে চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ে চেতনাকে বস্তুর পরিণামরূপে নয়, বস্তুর নঞর্থীকরণের ক্ষমতাতেই চেতনার অভ্যুদয়রূপে গণ্য করেছেন। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়ানোতেই যেন চেতনার অভিপ্রকাশ। তাই মনে হয় চেতনাবিদ্ধ বিশ্ব (Being for Itself) ছাড়া নৈর্ব্যক্তিক জড় (Being in Itself) সার্ত্রে'র কাছে এক অর্থহীন ও অবাস্তব অস্তিত্ব। সুতরাং দেকার্ত ও কান্টের মত সার্ত্রে'র প্রথম পর্বের দার্শনিক চিন্তা তাই দ্বৈতবাদের তাৎপর্য বিবর্জিত নয়।—

সার্ত্রে অবশ্য ক্রমশ চেতনার অন্তর্মুখীন যাত্রার পথ পরিত্যাগ করে বাস্তব সমাজে পুনর্বিন্যাসের সূত্র অন্বেষণে শেষে সমাজস্থ ব্যক্তির কর্ম-কল্পনার (Praxis-Project) দ্বান্দ্বিক ধারণায় উপনীত হন ও মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করেন। এই স্বীকারোক্তি তাঁর The Problem of Met od ১৯৲ , গ্রন্থে লক্ষিত হয়। "We cannot go beyond it (Marxism) because we have not gone beyond the circumstances which generated it "" তথাপি একটি গতিশীল বিশ্বদৃষ্টিরূপে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিকতা স্বীকারে সার্ত্র দ্বিধান্বিত। সার্ত্রে'র মতে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ব্যক্তি মানুষের উদ্দেশ্যমুখী কর্মনির্ভর। প্রত্যেকেই নিজ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত এবং নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে ব্যস্ত। ব্যক্তি মানুষ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্যের সহযোগী ও অন্যের সহযোগিতায় তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি। ব্যক্তির সক্রিয়তাই ব্যক্তির ঐতিহাসিক বিকাশকে অনড় জড় প্রকৃতি (Practico-inertia) থেকে পৃথক করেছে। সার্ত্রে'র

ধারনায় অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ কাঠামোতে প্রয়োজন বোধ (need) ও অভাব বোধ (scarcity) সকল বিরোধের মূল। এই ধারনাই তাঁর Critique of dialectical Reason গ্রন্থে বিশদায়িত। সার্ত্রের ভাষায় "Material Scarcity which, I showed to the critique of dialectical Reason, is for me the root of antagonisms past, present, among them"[৬] অবশ্য মানুষের এই অভাববোধ পূর্ণ করার ক্ষমতা আছে এবং অভাব পূরণে বাধা থাকলে মানুষই তা অতিক্রম করতে পারে। সার্ত্র মানব ইতিহাসকে তাই একটি সামগ্রীকরা ক্রিয়া (Totalising activity) রূপে গণ্য করলেও ভাববাদী দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বাদ (dialectics) কে বস্তুবাদ থেকে বিছিন্ন ক'রে এবং সমাজকে যোগফল মাত্ররূপে গণ্য করে প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বৈততা (dualism) কে স্বীকার করেছেন। ফলে সার্ত্র একটি সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিরূপে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের ঐতিহাসিক কর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক বিযুক্ত করে নব্য প্রত্যক্ষবাদী ও প্রয়োগবাদীর মত দর্শনকে নিছক আধিবিদ্যা বিষয়ক একটি প্রকল্প (Metaphysical hypothesis) রূপে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।[৭] মজার ব্যাপার এই যে সাম্প্রতিককালের নানা মার্কার পাশ্চাত্য মার্কসবাদ (Western Marxology) যথা Fankfurt school ও উগ্র বামপন্থার (New Left) প্রবক্তরা সার্ত্রের এহেন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী।[৮] মানুষের ঐতিহাসিক কর্ম উদ্দেশ্যমুখী হলেও বহু মানুষের শ্রম ও সম্পর্ককে ভিত্তি করে এমন অবস্থার উদ্ভব ঘটে যে অবস্থা ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও তাঁর কর্মকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে পারে। এমন নিয়ন্ত্রণের সচেতনাতেই যে মানুষের স্বাধীন কর্মের সম্ভাবনা অস্তিবাদে এই সব অনুপস্থিত। ফলে স্বাধীনতা (freedom) ও নির্ভরতার (necessity) মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ও নির্দ্বান্দ্বিক (non-dialectical) দ্বৈততা (dualism) সূচিত।

সুতরাং সামাজিক অস্তিত্ব যে সামাজিক অস্তিত্বের জ্ঞান (Knowledge of social existence) নাও হ'তে পারে মার্কসবাদে এই সত্য স্বীকৃত হলেও অস্তিবাদে অস্বীকৃত এবং সেজন্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত ভিত্তিরূপে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দার্শনিক তাৎপর্য্যও খণ্ডিত। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী তত্ত্বের অপ্রাসংগিতা প্রমাণে সার্ত্র তাঁর Critique রচনার এর পূর্বে রচিত Materialism and Revolution শীর্ষক রচনাতেই তৎপর হয়েছিলেন।

ফায়েরবাখ ও মার্কসের দ্বারা হেগেলীয় ভাববাদ খণ্ডনের পর ভাববাদ বহুলাংশে মর্য্যাদাচ্যুত। সুতরাং প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধ ও বিকাশের সাধারণ নিয়মগুলির বৈজ্ঞানিক অন্বেষণরূপে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নীতি ও বিশ্বদৃষ্টির বৈজ্ঞানিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করে সার্ত্র বিজ্ঞান ও 'ডায়ালেকটিকস্'-এর ভিত্তিরূপে প্রকৃতি ও ইতিহাসের বাস্তব অস্তিত্ব (Objective reality) ও দ্বন্দ্ববিরোধকে মানব স্বাক্ষর বিযুক্ত একটা 'ক্র্যাবসট্রাকশন' রূপে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

৫

একথা ঠিক যে মানুষ আছে বলে সমস্যা আছে, সমস্যা নিয়ে ভাবনা আছে এবং সকল সমস্যা সেজন্য এক পথে মানব চেতনা সাপেক্ষ। কিন্তু এমন বাক্যে প্রতিফলিত চিন্তা নিছক কথার কথা (Tantology) মাত্র। কারণ এতে আমাদের জ্ঞানের হ্রাসও হয় না বৃদ্ধিও ঘটে না। তাছাড়া একথা স্বীকার করলেও সকল সমস্যার সমাধান মুহূর্তে অনিবার্য্য ভাবে নিঃসৃত হয় না। কেননা প্রকৃতির ইতিহাস ও মানুষের ইতিহাস সমব্যাপক নয়। মার্কসবাদে তাই নীতিগতভাবে অস্তিত্বকে জ্ঞানের সঙ্গে আবশ্যিক ভাবে যুক্ত ক'রে দেখা যায় না। প্রশ্ন হ'তে পারে (১) জ্ঞান ও কর্মের পূর্ব্ব শর্তরূপে বাস্তব বিশ্বের (Objective reality) অস্তিত্বশীলতার নীতিতে বিশ্বাস করা কি অজ্ঞাবাদের নামান্তর নয়?

কিংবা (২) এহেন নীতির স্বীকৃতি ও বিন্যাস কি কেবলমাত্র একটি প্রকল্প (Hypothesis) বা পূর্ব্বভাবনামাত্রে পর্যবসিত হয় না?

শুধু নীতি ব'লেই কোন নীতি বর্জনীয়—নির্বিচারে এ সত্য গৃহীত হ'তে পারে না। তবে যদি কোন নীতি বা প্রকল্প বিরোধীতা বিজ্ঞানের ভিত্তি, ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর সঙ্গে বিরোধ যুক্ত হ'য়ে বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতাকেই খণ্ডন ক'রে তখনই সেই নীতি অবশ্য পরিত্যাজ্য—যেমন ঈশ্বরের প্রকল্পের আলোকে জগৎ ব্যাখ্যার নীতি আজ পরিত্যক্ত।

সর্ব্বাধুনিক বিজ্ঞানের নিদানে বাস্তব বিশ্ব আজ এক প্রবাহ মাত্রে (Process) কল্পিত। বাস্তবতার সকল পরিবর্তনের মূলে কোন বস্তু উপাদান (Physical

factor) এর স্বীকৃতি যদি একটি পূর্ব্বভাবনা বা প্রকল্প মাত্ররূপে গণ্য হয় তবুও বিজ্ঞানের ইতিহাস নির্ভর এহেন প্রকল্পের আলোকেই বাস্তবতার স্তরভেদে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ সকল বিজ্ঞানের বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল বিশিষ্ট প্রধান নিয়মগুলির (Principal specific laws) আবিষ্কার এবং সেজন্য শুধু যে বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতাই সূচিত হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সকল বিজ্ঞানের এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত ধারণাসমূহ (concepts) বা নিয়মাবলীর (laws) যোগসূত্র ও অবস্থান, বিশিষ্টতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য নির্ণয়ে বস্তু-'বস্তুময়তার ঐক্যেই বিশ্ব' এহেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি বৈজ্ঞানিক দার্শনিক তাৎপর্য্যে অর্থময় হ'য়ে ওঠে।

সুতরাং যে নীতির আলোকে বস্তু প্রকৃতির নিয়মগুলির আবিষ্কার বস্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবিত; বাস্তবতার নতুন স্তরে সেই নীতির প্রয়োগে ইতিহাস, সমাজ ও চিন্তার দ্বান্দ্বিক নিয়মাবলী আবিষ্কারের সম্ভাবনাও সূচিত।

অতএব চিরদিনই সেই তাৎপর্য্যে এ জগৎ, মানুষ ও সমাজ অপরিবর্তনীয় এমন স্থবির সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গী আজ অচল কেননা বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বাস্তবতার অস্বীকৃতিতে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্ভাবনা ও বিকাশ কেবল নির্বিশ্বের অস্তিবাদী আত্মগত ব্যক্তি চৈতন্যের বিস্তার মাত্রে নিঃশেষিত হতে বাধ্য।

নির্দেশিকা ও টীকা ঃ

১। Marx and Engels : The German Ideology, Progress Publishers, Moscow

২। Marx and Engels : Selected Correspondence, Moscow

(Block-কে লিখিত এঙ্গেলস-এর পত্র দ্রষ্টব্য)

৩। V. I. Lenin : Philosophical Note Books, Collected Works, Vol. 38. Moscow,

৪। Marx and Engels : Theses on Feuerbach (Edited by Engels) Collected Works, Vol. V, Progress Publishers, Moscow,

৫। Jean Paul Sartre : The Problem of Method [Tr. by Hazel E Barnes], Methnen & Co., London,

৬। Sartre in the Seventies—Interviews and Essays [Tran by Paul Auster and Lydia Davis] London,

৭। Jean Paul Sartre : Materialism and Revolution, quoted in Philosophy in Twentieth Century—An Anthology [Edited by William Barret and Henry D. Aiken] Vol. 3, New York,

৮। • Mark Postu : Existential Marxism in Post War France—From Sartre to Althnssir., Princeton,

* মার্কসবাদে এ্যালিয়েনেশনতত্ত্ব, নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশ্ন ও ব্যক্তি সমস্যা প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে গভীর মনোযোগের বিষয় এ ব্যাপারে সার্ত্রের চিন্তা অবশ্যই অনুশীলন যোগ্য এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অনেক তাত্ত্বিক এ বিষয়ে যে সচেতন তার প্রমাণ Adam Schaff এর 'Philosophy of Man (১৯১১) ও সাম্প্রতিকালের অন্যান্য রচনা। কিন্তু সার্ত্রের 'Praxis-Project', সূত্রকে অনুসরণ করে ফ্রয়েডীয় মার্কসবাদীরা ও নব্য বামপন্থী (New Left) মার্কস ঐতিহ্যের প্রবক্তরা যেভাবে মার্কসবাদের বিকৃতি সাধন করছেন তার উল্লেখযোগ্য একটি দৃষ্টান্তরূপে অতি সম্প্রতিকালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Dick Howard রচিত 'The Marxian Legacy' তার (১৯১১) গ্রন্থটিই উল্লেখযোগ্য।

জঁ্যাপল সার্ত্রে : সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ

ডঃ বিজয় দেব

জঁ্যা পল সার্ত্রের বয়স যখন আট কি নয় তখন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার গুরুত্ব অনুভব করে শতশত পৃষ্ঠাব্যাপী ছোটগল্প লিখতে সুরু করেন। এসব রচনা তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে কখনো কোন প্রকাশক কি সম্পাদকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে তিনি যখন বত্রিশ বছরের যুবক ফ্রান্সের বিখ্যাত গালিমার প্রকাশনা তাঁর সাহিত্যে পরিচিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তারপর থেকেই সাহিত্যে তাঁর সুনাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সময় সার্ত্রের ছোটগল্প Intimacy এবং উপন্যাস Nausea সমগ্র ইউরোপে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এমন কি প্রচুর প্রসংশা অর্জন করে।

সার্ত্রের জীবনের মর্ম ও নর্ম সঙ্গিনী সাইমঁ দ্য বোভে তাদের একদা জীবনচর্যার একটি রূপরেখা রচনা করেছেন। যেমন তাদের জীবন কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন কাফের টেবিলে কেটে যায়—রাত কাটে নির্জন ঠাণ্ডা হোটেলের কক্ষে। আবার ছুটীর দিনগুলোতে পিঠে বোঝা নিয়ে ভবঘুরেদের মতো হেঁটে হেঁটে এখান থেকে ওখানে যাওয়া। মনে পড়ে যুদ্ধের আগে সে সবদিনগুলো। তখন কখনো ডেকের ওপর ঘুমিয়ে আবার কোন একসময় পাহাড়ের কুটিরে এমন কি মুক্ত আকাশের নীচেও তাদের জীবন প্রবাহ একদা বয়ে যেতো।

সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য "জর্মন ওকুপেশান" দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। বস্তুতঃ তখন থেকেই তাঁর চিন্তাজগতে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। রোমান্টিক ও বীরত্বপূর্ণ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী তার চিন্তাজগতকে আলোড়িত করে। প্রসঙ্গতঃ তাঁর একটি প্রবন্ধে তা প্রতিফলিত হয়েছে :

"We were never more free than under the Nazi Occupation. We had lost all our right, beginning with the right to speak...Nazi poison was seeping in our thoughts, every true thought was a victory...Every instant we lived to the fau the

meaning of that banal little phrase : "All men are mortal". The choice that each of us made of his life his being was a genuine choice because it was made in the presence of death ; because it could always have been expressed in the form "Rather death than..." ...Thus the basic question of freedom was set before us ; and we were brought to the point of the deepest knowledge a man can have of himself."

সাত্রে´র দর্শনে মানুষের অবস্থা অনুসন্ধানের শেষে লক্ষ্য করা যায় জীবন অর্থহীন। ঈশ্বর মৃত কোন নৈতিক নিয়ম কোথাও নেই। মানুষ মাত্রেই এক ব্যর্থ আবেগ। সমগ্র পৃথিবী এক বিবমিষা অনুভূতিতে পীড়িত। এবং এই উপলব্ধি বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তার নাটকে উপন্যাসে গল্পে এবং দার্শনিক তত্ত্বে।

কোন কোন সমালোচকের ধারনা সাত্রে´ নাট্যকার হিসে বই বেঁচে থাকবেন উপন্যাসিক বলে নয়। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাসের জগৎ ত্যাগ করে নাটকের বিশ্বে নিজেকে মগ্ন করে রাখেন।

সাত্রে´র প্রথম উপন্যাস Nausea তাঁর জীবনের এক মহৎ সৃষ্টি। এখানে তিনি দর্শনকে কথাসাহিত্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই উপন্যাস মূলত: আতোয়ঁা রোক্যুতাঁর দিনলিপি। সে নর্মান পোর্ট অব বোভিলে বাস করতো।

Nausea (১৯৩৮) গ্রন্থ মূলত: সাত্রে´র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পষ্ট বিবৃতি মাত্র। মুখ্য চরিত্র রোকুঁতাঁর জন্য সেই দার্শনিক উপলব্ধি ছিলো সুনির্দিষ্ট। জঁ্যা পল সাত্রে´ ইতিপূর্বে 'লে হাররে' এ দর্শন শিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত করতেন। সেই সময় তিনি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। বরং বলা যেতে পারে তিনি প্রায়শঃ পীড়িত বোধ করতেন। তখন তিনি আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন : দীর্ঘদিন যাবৎ আমি পূর্ণ স্বাধীনতা অনুসন্ধানে মগ্ন রয়েছি। এমন কি সেই পর্যায় Nausea রচনা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিলো। বস্তুত: রোকুঁতাঁর অখণ্ড অভিজ্ঞতা তার স্রষ্টা সমপর্যায়ভুক্ত নয়। ত্রিশের দশক এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তখন সাত্রে´ হাইডেগার ও হুসারল্ এর তত্ত্বগত আবিষ্কারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন আবার কখনো অনুসন্ধানে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। সেই সঙ্গে চলেছে তার শিক্ষাকতা ও ভ্রমণ পর্ব। অবশ্য Being Nothingness

এর পূর্ব পর্যায়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ ও আলোচনা এই চিন্তাধারারই অনিবার্য পরিনতি। চিন্তা জগতে তখন এক চরম বিপর্যয় কাল প্রবাহিত। অবশ্য সেদিক থেকে Nausea সংকটকাল থেকে পরিত্রানের কোন ইঙ্গিত বহন করে না। যদিও এখানে মুখ্য চরিত্রের বিজয় ঘোষণা নেই তবুও সার্ত্রে'র পক্ষে এতো একধরনের স্বাধীনতা।

সার্ত্রে এই উপন্যাসকে জুর্নালের মতো উপস্থাপিত করেছেন। রোকুঁ্যতাঁর কাগজপত্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মুখ্য চরিত্রকে হয় মৃত বলে প্রকাশিত হয়েছে অথবা স্থির নিশ্চিত মূক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দিনলিপির শেষে রোকুঁ্যতাঁ তাঁর একান্ত ইচ্ছেকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। সে একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছেকে পালন করে এসেছে। যা "একই সঙ্গে অপূর্ব এবং লোহের মত কঠিন হবে। মানুষ তখন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চরম লজ্জা অনুভব করবে।" সেই গ্রন্থ মূলতঃ জীবনের এক সংকটকালেরই প্রতিক্রিয়া। এখানে জুর্নালের অস্তিত্ব রয়েছে—যা ইতিপূর্বে রচিত হয়নি? সেই সময় রোকুঁ্যতাঁর সংকট অনুভব করে পাঠককেই সমাধানের সূত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। জুর্নাল যে চিত্র তুলে ধরে তাহলো মৃত্যুর একধরণের রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ট। আমাদের কাছে তা বিশদ না হলেও মৃত্যুর স্বাভাবিক প্রকৃতিতো অচেনা নয়। এ হলো আত্মহত্যা। মুখ্যচরিত্র কোনদিকদিয়েই মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরেনি। বরং প্রাসঙ্গিকভাবে তার মনে কিছু প্রশ্ন প্রবিষ্ঠ করিয়ে দিয়েছে। এবং তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে যে সে সচেষ্টভাবে ব্যক্তি হিসেবে বাস্তবতার অসীম শক্তিকে সহজভাবেই গ্রহণ করবে। স্পষ্টভাবে Nausea আত্মহত্যার এক ধরণের আমন্ত্রণও বটে। বলা যেতে পারে সার্ত্রে'র চিন্তাধারার সূচনা মাত্র। এবং তা স্ব-ভূমির সংলগ্ন বন্দর নয়। বরং মৃত্যুর মুহূর্তে কালের উত্তরণের সঙ্গে ভ্রমণে সেখানে প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব। এই গ্রন্থ মুলতঃ একধরণের সচেতনতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই রচিত। সমগ্র গ্রন্থ পাঠে যে কোন পাঠকই রোকুঁ্যতাঁর জন্য করুনা অনুভব করবে। বেচারা এমন এক অবস্থায় নিজেকে প্রত্যক্ষ করে যেখানে সে জীবনের নিশ্চিত মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুতঃ রোকুঁ্যতা কাহিনী কৌতুহলপ্রদ হলেও ব্যক্তিগত সংকটকে সুনিপুনভাবে চিত্রিত করেছে। এখানে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার যোগসূত্র প্রায় ক্ষীণ।

Nausea শব্দের অর্থ লাতিনে সমুদ্রপীড়া। ক্রমাগত আন্দোলনে একধরনের ঈষৎ অসুস্থতা যার পরিণতি যন্ত্রণা। গতির সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থাও

অবিরাম চলতে থাকে। ঈষৎ পীড়া বহিঃশক্তি হিসেবে উপস্থিত হলেও ব্যক্তি অন্তর্জগতে তা উপলব্ধি করতে বিশেষভাবে সক্ষম। প্রধানতঃ Nausea র তীব্র অনুভূতিই বিবমিষার একমাত্র কারণ হয়ে উঠতে পারে আবার তা নাও ঘটতে পারে। বিবমিষা ও বিবেকযন্ত্রণার মূলে অনেকগুলো কারণ বর্তমান। যদিও অভ্যন্তরীন জগৎ থেকে সেই অবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং বিবমিষা আমাদের বাতিল করে এবং একইসঙ্গে এক বিবক্তিকর পরিবেশ রচনা করে। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যা আমরা নিরাপদভাবে আত্মস্থ করতে পারিনে এবং গতিকে সহ্য করাও দুঃসাধ্য। তখনই আমাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বে সমুদ্রের মত বহির্জগতের শক্তি বিবমিষা সৃষ্টি করে। আমাদের সীমিত স্বাধীনতার মধ্যে একধরণের উদ্বেগ বা অস্থিরতার অভিজ্ঞতা জাগরিত হয়। সমুদ্র আমাদের সত্তাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। তাছাড়া সমুদ্র আমাদের সহ্যশক্তির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের জানার কোন সুযোগও দেবেনা কখন আমাদের মুক্ত করে সে অপসৃত হবে। এই অনিশ্চয়তাই বিবমিষার অভিজ্ঞতা এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে। একবার তা ঘটলে বারবার তারই পুনরাবৃত্তি আমাদের জীবনে দেখা দেবে। এমন কি সমগ্র যাত্রায় অবিরাম অনুষঙ্গে তা অবস্থান করবে। ততক্ষণ আমরা আর স্বাধীন কোন সত্তা নই।

আঁতোয়া রোকুঁ্যতার দিনলিপি (জুর্নাল) মূলতঃ জাহাজের যাত্রাপথে দৈনন্দিন ঘটনা বা অগ্রগতির বিবরণ। যখন তার ওপর সেই বিবমিষার প্রতিক্রিয়া সূচিত হয় তখনই জুর্নালের সুরু। অনিবার্য পরিণতিতে বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে তার অতীত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীন চেতনার সে এক তরুণ মাত্র। তার হাতে সীমিত উপায় বা উপাদান। এই অবস্থা বহন করে সে এসেছে বোভিলে। তার একমাত্র কামনা উনিশ শতকের এক অভিজাত বংশজাত ব্যক্তিত্ব ম, দ্য রোলেবোঁর জীবনী রচনা করা। রোলেবোঁ সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র স্থানীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। রোকুঁ্যতাঁ এখানে এসে নির্জনবাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে। অবশ্য সে একমাত্র যোগাযোগ স্থাপন করে অটোডিডাক্‌ট্‌ বলে খ্যাত ওগিয়ার পি-র সঙ্গে। প্রথম যোগসূত্র প্রায় অনিচ্ছাকৃত। কার্যতঃক্রমে অটোডিডাক্‌ট্‌ তরুণ গবেষকের ওপর নিজের দায়িত্বকেও অর্পন করে। তারপর আরোপিত হয় পৃষ্ঠপোষকের পছন্দ অনুযায়ী যৌন জীবনের বাধ্যবাধকতা। বিশেষ করে প্রাত্যহিক শয্যাসঙ্গিনীর ক্ষেত্রে বিচিত্র ব্যবস্থার ও সুযোগ বহাল থাকে। কিন্তু রোকুঁ্যতাঁর সারা মন অধিকার

করে রয়েছে গবেষণার কাজ। অবশ্য একসময় সে ক্লান্ত হয়ে ওঠে একঘেয়েমীতে : "আমার কাজকরার যে ধারণা ছিলো তা একেবারে নিখুঁত কল্পনাপ্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়।"

প্রাথমিকভাবে রোকুঁতাঁর বিবমিষার অভিজ্ঞতার রূপ বহির্জগৎ থেকে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে তাকে অধিকার করে রেখেছে, তারপক্ষে সেই অবস্থা পরিহার করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তার মধ্যে অবিরাম যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তার ফলে এক প্রত্যয়ের উদ্ভব ঘটেছে। এইভাবেই বিবমিষা তার অখণ্ড সত্তাকে ঘিরে রাখে। "[সেই মধুর অবসরপ্রাপ্ত বিরক্তি] মূলতঃ তা শিলাস্ফাটিক থেকেই উদ্ভূত। আমি সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত। শিলাস্ফটিক থেকেই তা আমার হাতে এসেছে। হ্যাঁ সত্যিই তাই। এবং তা ঘটেছে সন্দেহাতীতভাবে যেন একধরনের বিবমিষার মতো।" (পৃঃ ২৩)।

আবার তার অনুভূতির মানচিত্র লক্ষ্য করার মতো : "আমার মধ্যে আর সেই বিবমিষার আচ্ছন্নতা নেই। মনে হয় দেয়ালে আমার প্যাণ্ট কোমরে আটকে রাখার বন্ধনীতে বা আমার চতুঃস্পার্শে বাহুর বর্ম। আমি বস্তুতঃ অবস্থান করছি কাফের অন্তর্ভুক্ত আয়তনের অংশ মধ্যে (পৃঃ ২৪)।"

রোকুঁতাঁ মূলতঃ সার্ত্রের "আকর্ষনীয় সচেতনার'র শিকারে রূপান্তরিত। সে "মুহূর্তের স্বাধীনতা বা মুক্তি উপভোগ করেনি। পরিবর্তে সে অ্যাবসার্ডের সমন্বয় রচনা করেছে সেখানে যুক্তির বিশ্বনিখিল সুরক্ষিত রয়েছে। তখন আর সচেতনতা বস্তুর অধিকারে নেই।"

Nausea উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে রোকুঁতাঁর বিশ্বস্ত মুহূর্তের আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপস্থিতির চেয়ে সেই সব বিশ্বস্ত মুহূর্তের প্রত্যাবর্তন বরং পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর অদ্ভুত প্রকৃতিতে। প্রাতরাশ গ্রহণের মুহূর্তে রোকুঁতাঁ কাফের মালিক এম. ফাসক্যুয়েলকে অনুপস্থিত দেখে বিচলিত বোধ করে। তার মনকে আতঙ্ক গ্রাস করে। তার আশঙ্কা মালিক মৃত। এই ভাবনা তার দিনকে ধ্বংস করে। সে তার সম্বন্ধে মৃত্যুর লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে। কোন কাজ সম্পাদনে আর সে সক্ষম নয়। এই চিন্তা তাকে ভূতগ্রস্ত করে রাখে, যা পূর্ব নির্ধারিত নয় এমনি সব ঘটনাও ঘটতে পারে। অবশ্য এসব কিছু নির্ভর করছে একমাত্র কাফে মালিকের মৃত্যু হলে! "আমাকে ফিরে যেতেই হবে (কাফেতে)। যদি ম. ফাসক্যুয়েল বেঁচে থাকেন—যদি প্রয়োজন হয় তবে তার দাঁড়ি বা হাত স্পর্শ করা যাবে।

সম্ভবতঃ তখন আমি স্বাধীন হবো।” (পৃঃ ১০২) রোকুঁতাঁ যে ভাবনায় আবিষ্ট তা হলো মৃত্যুর প্রতিমা। এবং যার মূলে রয়েছে ম. ফাসক্যুয়েলের আকস্মিক সংঘটিত মৃত্যুর কল্পনা। যার অনিবার্য পরিণতিতে সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ভয়াবহ আতঙ্কের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে আসন্ন বিপদের মধ্যে। রোকুঁতাঁর অক্ষমতা এখানে সর্বত্র বিস্তৃত। যেমন একের কাজ, একজনের পার্কে ভ্রমণ একের অন্যের ওপর আক্রমণ এমন কি জীবন পর্যন্ত। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থাগারের পাঠকদের দ্বিধার মধ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অথচ রোকুঁতাঁ নিজস্ব সাধনায় মগ্ন। এক কুয়াসাঘন সন্ধ্যায় রোকুঁতাঁকে অতিক্রম করে এক তরুণ এগিয়ে চলে, রোকুঁতাঁ তাকে অনুসরণ করে। শুনতে পায় এগিয়ে যেতে যেতে তরুণ শিস দিয়ে চলেছে। নিজের সাহস ও তরুণের শিস যেন অনতিবিলম্বে সেই রাত্রে একটি সেতু রচনা করে। সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। পাঠকদের চীৎকার করে জানাতে ইচ্ছে করে যে সে আতঙ্কে নিমজ্জিত।

অন্যদৃশ্যে সে লক্ষ্যকরে এক তরুণী এক প্রদর্শনকারীর শিকারে রূপান্তরিত। রোকুঁ্যতাঁর মধ্যে সঞ্চারিত ধারণায় প্রদর্শনকারী ও তরুণী দু’জনেই একই মুহূর্তে সংলগ্ন বা ঘনিষ্ঠ তারা জৈবিক দিক থেকে মিথুনে সোচ্চার। একই ধরনের আতঙ্ক সঞ্চিত হয় রোকুঁতাঁর জীবনে পরবর্তী রোববার। সেদিন সে বোভিল ম্যুজিয়াম পরিদর্শনে বেরিয়েছে।

সার্ত্রে’র মতো রোকুঁতাঁর সম্মুখে সেই মুহূর্তে দুটো ঘটনা সংঘটিত হয় : আমি আকস্মিকভাবে বস্তুর পৃথিবীতে ঝাঁপ দিই যা আমার সচেতনতার মধ্যে এক অখণ্ডতা রচনা করে। তারপর তা এক আকর্ষনীয় এবং বিরক্তিকর গুন নিয়ে মূল্যবোধ সহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ততক্ষণে প্রায় অদৃশ্য আমি নিজেকে তখন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছি।…

আমরা প্রায় শুনতে পাচ্ছি উদ্বিগ্ন পিতা দীর্ঘকাল ব্যাপী যব বপনে নিযুক্ত পুত্রের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে চলেছেন। এখানে যদি অনুরূপ উদাহরণ প্রয়োগ করা হয় তবে রোকুঁতাঁর মধ্যে উভয় অস্তিত্ব বর্তমান। একদিকে অস্থির পিতা এবং অন্যদিকে বীজবপনকারী পুত্র। পিতা জীবনের প্রচলিত স্থির ধারার ওপর মূল্যবোধ স্থাপন করেন অথচ পুত্র সেখানে এলোমেলো আচরণে বিশৃঙ্খলভাবে অভ্যস্ত।

এখানে পিতা ও পুত্রের মধ্যে মূলতঃ স্থিতি ও অনিশ্চয়তার বিভ্রান্তি প্রধান

ভূমিকা গ্রহণ করে যা রোকুঁ্যতাঁর মনে প্রতিবিম্বিত হয়। সে তখন এক দুরূহ সংগ্রামে লিপ্ত সে স্থিতি কামনা করে বিশ্রামের জগতে চলে পড়তে চায়; কিন্তু নিকট অস্তিত্ব থেকে এ ধরণের কামনা প্রায় অসম্ভব।

রোকুঁ্যতাঁ রোলেবোঁর জীবনী রচনার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। সে স্বীকার করে এই ধরনের বিষয় নিয়ে যেকোন অক্লান্ত প্রয়াসই একেবারে নিরর্থক। সে অবশ্য এরই মধ্যে রোলেবোঁর ওপর অজ্ঞাতসারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো। সেই ব্যক্তিত্ব মৃত এবং অপ্রয়োজনীয়। সে তার সম্বন্ধে অর্থহীন অতীত থেকে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু রোলেবোঁর কাছে কূটনীতি-বিদের বন্ধনমুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করেছে রোলেবোঁর বিচক্ষনতা, ঘৃণা এবং কোন কিছু কৌশলে পরিহার করার মানসিকতা। এ সব কিছুই তার জীবনীকারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। রোকুঁ্যতাঁ জীবনী রচনার কাজ থেকে বিরত থাকলেও কখনো গ্রন্থাগার ছেড়ে যাবার চিন্তা করেনি। কারণ যদি আবার 'সেই' বাইরের অস্তিত্বের সম্মুখীন হয় এবং এই অবস্থাই বিবমিষার রূপ গ্রহণ করে তাকে আবিষ্ঠ করে রাখে। কিন্তু সে অনতিবিলম্বে আবিষ্কার করে "সেই" জৈবিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক প্রবেশপথকে কোন ক্রমেই গ্রাহ্য করেনা। সে তখন কপাট রুদ্ধ করার প্রয়াসে অটল হয়ে ওঠে "কোন ভাবনা নয়···আমি চিন্তা করতে চাইনে··· না আমি কোন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করবনা··· না কোন চিন্তাও নয়··· সত্যিই কি এর কোন অন্ত আছে?" (পৃঃ ১২৯)।

পরবর্ত্তী পর্যায়ে সান্ধ্য দৈনিকের শিরোনাম—তরুণী লুসিয়েন ধর্ষিত ও মৃত। রোকুঁ্যতাঁর প্রতিক্রিয়ার বিহ্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন তার মনে এক বিমূর্ত্ত অবস্থা। রোকুঁ্যতাঁ যে লোকটিকে বিভিন্ন সময়ে একই দিনে দেখেছে। কে জানে লুসিয়েন হয়তো তারই হাতে করুণ শিকারে পরিণত হয়েছে। শেজ ক্যামিলেতে এসে স্নায়ুপীড়িত স্থানীয় চিকিৎসক ম. ত্রশিলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং বিড় বিড় করে বলে যান "কি হতভাগ্য এই মেয়েটি।" তখন রোকুঁ্যতাঁর জন্য বহিরাগত বাস্তবতা আর অবশিষ্ট নেই। সে আবিষ্কার করে প্রত্যক্ষ করছে প্রদর্শনকারী ও মেয়েটির সম্পর্ক। এক ভীতিপূর্ণ অবস্থা। ম. এশিলের আচরণেও ভয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হত্যার প্রতিক্রিয়ার ভয় তখন শর্তাবদ্ধ। লুসিয়েন আর নেই। সেখানে অবস্থান করে একটি মৃতদেহ মাত্র। সার্ত্রে'র স্বাভাবিক পার্থক্য এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। বিশেষ করে মানুষ ও বস্তুর

মধ্যে বিস্তৃত দূরত্ব। লুসিয়েন এখন বস্তুতে রূপান্তরিত। অবশ্য অন্যের হিংসাত্মক হস্তক্ষেপের ফলেই বস্তুর রূপান্তর সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

এখানে লক্ষ্য করা যায় রোকুঁ্যতাঁর সঙ্গে বিবমিষার এক আচ্ছন্ন পরিচয় মাত্র। সে এর ফলে জ্ঞান অর্জন করে : যে তার অস্তিত্ব কোন বহিরাগত শক্তির ফাঁদে আবদ্ধ নয় সে বস্তুই হোক আর ব্যক্তিই হোক। তার উপলব্ধি থেকেই বিবমিষা উদ্ভূত হয়েছে। সে এখন উদাসীন। অথচ এই গতানুগতিক বিশ্বে সে এক উদ্বৃত্ত অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই নয়। এ সম্পর্ক কোন প্রকারেই প্রভাবিত হয়না। সে তার অস্তিত্বের আনুসঙ্গিকতার আবিষ্কারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বিবমিষা শুধুমাত্র জৈব পৃথিবীর অস্তিত্বের নিশ্চলতাকে অবলম্বন করে জেগে ওঠে। সে অনুভব করে বিশ্বদ্বারা নির্জ্ঞেয়তাকে লাভ করবে। এই তার একমাত্র সাধনা।

জৈবিক পৃথিবী তো স্থির অচঞ্চল এবং শান্ত। রোকুঁ্যতাঁ সেই পৃথিবীতে বাস করে, এবং আতঙ্কিত হয়—অনির্দিষ্টকালের জন্য : ··· আমি বিবমিষা উপলব্ধি করেছি। আমি সেই অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়েছি আনুসন্ধিকতাও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে যা একান্তভাবে অপরিহার্য।···(পৃঃ ১৬৬)।

যেখানে পৃথিবী স্থির নির্জ্ঞাত অস্তিত্ব হিসেবে একজনকে প্রলুব্ধ করে গতি সৃষ্টি করে যেমন বৃক্ষ বায়ুর প্রভাবে অবনত হয় কিন্তু মূলতঃ বৃক্ষ অনড়। সর্বোপরি বৃক্ষ নিজেকে প্রশ্ন করেনা। সুতরাং সেখানে কোন মিথ্যে বা ফাঁকির সুযোগও অবাস্তব। সে যে জগতে বাস করে তা এক চিন্তাহীন অস্তিত্ব মাত্র যা নিশ্চলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানেই মৌলিক মানবিক প্রলোভনে কামনা বাসনা অন্য কোথাও দায়িত্ব অর্পন করে। তখন প্রভাবিত স্রোতে অথবা দৃঢ়সংকল্পে আমরা নিয়ন্ত্রিত হই। যা সার্ত্রে তাঁর Being and Nothingness-এ অনুসন্ধান করেছেন। সেখানে অস্তিত্বপূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বের ওপর মূলতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

রোকুঁ্যতাঁর নিকট "অ্যানি" মূলতঃ অবাস্তব বস্তু বলে চিহ্নিত হয়েছে। যার ফলে সে তার অতীতের সংরক্ষিত অনুভূতিকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ। বস্তুতঃ তার কল্পনায় যা অবাস্তব বলে মনে হয়েছে তা প্রকৃত বাস্তব। সুতরাং সেখানে এক বাস্তব অ্যানি অন্য এক মহানগরীতে বাস করে। সে তার আহ্বানে সাড়াও দেয়। এমন কি অ্যানি ও রোকুঁ্যতাঁর চরম সাক্ষাতের লগ্নে এক সর্বনাশা বিপর্যয়ও ঘটে।

এক গভীর আন্তরিকবোধশক্তির ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌছনো যায় তা হলো

পৃথিবীতে ব্যক্তির স্থান নির্ণয়। এখানে যোগাযোগ প্রায় অসাধ্য বিশেষ করে বস্তু এবং বহিরাগত অবস্থার মধ্যে। মানুষ এখানে প্রতিকূল বিশ্বে এক মূক দর্শক ব্যতীত কিছুই নয়। অ্যানির প্রতিক্রিয়ায় সততা প্রকাশিত হয়না। সে অনুভব করে এবং জ্ঞান অর্জন করে। পরিশেষে রোকুঁ্যতাঁকে বলে সে বিদায়ও গ্রহণ করে : "বেচারা! এমনই ভাগ্য! জীবনের প্রথমেই যখন তুমি তোমার ভূমিকা সার্থকভাবে অভিনয় করতে গিয়েছো তখনই কেউ তোমায় ধন্যবাদও জানায়নি (পৃঃ ১৯৪)। সে রোকুঁ্যতাঁর পূর্বের সমীক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। এবং সেদিক থেকে সেও রোকুঁ্যতাঁর মতোই নিঃসঙ্গ প্রতিটি মানুষের মতো প্রত্যেকেই নিজস্ব নির্জনতায় প্রত্যাবর্তন করে।

The Age of Reason (১৯৪৪) সার্ত্রের এক মহৎ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই গ্রন্থে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ সমর্থন সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মোটকথা সার্ত্রের জীবনচর্যা, অভিজ্ঞতার প্রভাব এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে অস্তিত্বের সম্মুখীন স্থাপন করেছে।

যদিও The Age of Reason এর বক্তব্য যুক্ত হয়েছে গর্ভপাতের জন্য ম্যাথুর অর্থ সংগ্রহ প্রয়াসে। সার্ত্রের মূল লক্ষ্য গর্ভপাতের সম্পর্কিত কোন নৈতিক বিচার সংগঠনের মধ্যে সীমিত নয়। গর্ভপাত বা বন্ধ্যাকরণ মূলতঃ এক গতানুগতিক আচরণ হিসেবে স্বীকৃত। অথচ এইধরণের আচরনের অন্তরালে অবস্থিত উদ্দেশ্য কিন্তু কৌতূহলশূন্য নয়। বরং ব্যক্তিগত পরিকল্পনাই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গর্ভপাতের প্রচেষ্টা ম্যাথুর সচেতনতার অভিপ্রায় মাত্র। যার ফলে অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্ত সজ্ঞানতার পরিকল্পনা উদ্‌ঘাটিত হয়। গর্ভপাত এখানে শুধুমাত্র সঙ্কেত চিহ্ন। অভিপ্রায় এবং ব্যক্ত প্রেরণার মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত তা স্পষ্ট সন্বিক্ষনের আদিরূপ হিসেবে পরিচিত। একজন মানুষের গর্ভপাতের ইচ্ছে সমগ্র সমাজের কাম্য পীড়নের সামান্য প্রতিফলন মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ম্যাথুর একমাত্র কামনা মুক্তিলাভ। প্রণয়িনী মার্সেল ও তাদের সন্তানের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ ধরণের কামনার সঙ্গে অতীতের রাজনীতি সম্পর্কিত একটি ঘটনাও যেন যুক্ত হয়ে পড়ে। এবং তা হলো হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিলো তা থেকে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ারের পরিত্রাণের কামনার কোন পার্থক্য চোখে পড়েনা। জাতীয় অভিপ্রায়ের মতো ব্যক্তিগত ইচ্ছে মূলতঃ একটি পরিকল্পনা সদৃশ অবস্থা

যা দ্বারা ব্যক্তি নিজের কর্মধারাজনিত পরিস্থিতি থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মতো ম্যাথুর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় তার প্রাণান্তকর প্রয়াসের মধ্যে। সে স্বাধীনতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে তৎপর। অথচ তার এই প্রচেষ্টা এক অর্থহীন প্রক্রিয়ার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তার মুক্তি কামনা একসঙ্গে অন্যান্য স্বেচ্ছাকৃত কর্ম থেকে তাকে রক্ষা করবে। তার কর্ম যে পথে তাকে নিয়ে চলেছে সে কখনো ঐ পথে যেতে চায়নি। ম্যাথুকে বারবার সেইপথ পরিহার করে চলার জন্য যাবতীয় কর্ম এড়িয়ে চলতে হবে। তখন তার সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার ভয় ও সতর্কতা এক খাঁজকাটা নির্দিষ্ট পথরেখা সৃষ্টি করেছে যা তার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া দুরূহ। মুক্তির আশায় তখন সে পাগল হয়ে উঠেছে, তখন তার আচরণ অধিকতরভাবে নিশ্চল বলে মনে হয়। ম্যাথু কামনাচালিত হয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উ-স্স্ ধ্বনি ব্যক্ত করে। এতো তার মুক্তি অনুসন্ধানেরই পথ।

সে গোপনীয়ভাবে এখনো মার্সেলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। তস্করের মতো নিভৃতে গভীর নিশীথে সে মার্সেলকে দেখতে আসে। মূলতঃ যৌন প্রয়োজনেই সে এসব শর্ত পূরণ করে। কিন্তু ক্রমে যেন এসব প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে জড়িত থাকার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এদিকে মার্সেল ও প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে—ম্যাথুর ক্ষীণ প্রতিশ্রুতির আশ্বাসে। যখন সে মার্সেলের সান্নিধ্য লাভ করে তখনই অভ্যন্তরীন জগৎ উদ্ভূত উদাসীনতা দেখা দেয়। এবং অনতিবিলম্বে সে বিবেকের দংশনে যন্ত্রণা অনুভব করে। কিন্তু মহৎ করুনা প্রকাশ করার চেয়ে বিবেকদংশন অধিকতরভাবে ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার মতো। কারণ এখানে সে ম্যাথুর স্বাধীন গতিবিধি গ্রহণ করেনা—বরং তার যৌন প্রয়োজন তৃপ্ত করে। ম্যাথুর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মার্সেলের অন্য একটি রূপ। মার্সেল তার ওপর এক ধরনের উন্মাসিকতা আরোপ করে। সম্ভবতঃ প্রভুকে যেমনি সব শিকারের ওপর আনন্দলাভের জন্য নির্ভর করতে হয়। সেদিক থেকে মার্সেলকে সে কিছুটা উচ্চতর অধিকার প্রদান করেছে। যার ফলে ম্যাথু তাকে যৌনসঙ্গীর চেয়ে অধিক এক ব্যক্তিত্ব বলে প্রত্যক্ষ্য করে। সেদিক থেকে মার্সেল তার একাধারে দীপ্তি সাক্ষী এবং তার সব কর্মের বিচারক। কথোপকথন মুহূর্ত মূলতঃ ম্যাথুকে উদঘাটিত করে। এমন কি জীবনের সব ঘটনার সাক্ষী হিসেবে এইভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ এই ধরণের দ্বৈত অনুষ্ঠান

মার্সেলকে ম্যাথুর কর্ম বা তার সমগ্র ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে অধিকার প্রদান করে।

মার্সেল যখন অন্তঃসত্তা হয় তখনই তিনটি বৃত্তিই যৎপরোনাস্তি বোঝা বা অমঙ্গলের উপশম করে। কারণ আসন্ন নবজীবন তার স্বাধীনতাকেই ঘোষিত করে। এখানে একটি চুক্তি তাকে যেন রক্ষা করে। অথচ সেই চুক্তি ন্যায়সম্মত ভাবে প্রত্যাহৃতও হতে পারে। কিন্তু সেখানে অবমাননার উপলব্ধি তাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেনা। এমন কি মার্সেল তাকে যে ঘৃণা করে তাও নিবৃত্তি করতে পারেনা। তথাপি সে মার্সেলকে তার বিচারক নির্বাচিত করে অন্যদিকে মার্সেল তাকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত যদিও ঘৃণার সঙ্গে জড়িত তবুও এনিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। হয়তো তা একদিন মার্সেলকে বন্ধনহীন করতে সক্ষম হবে। সে যেন ক্রমে এক নিদারুন লজ্জার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মার্সেল ম্যাথুকে লক্ষ্য করে সংকল্প গ্রহণ করে। যেন সে এই সন্ধিলগ্নে যে কোন পদ্ধতিতে সে কাজ করতে পারে।

ম্যাথুর প্রতিক্রিয়া খামখেয়ালী ঢঙে প্রকাশিত হয়। কাফেতে বসে সে মনেপ্রাণে একান্তভাবে কামনা করছে যেন মার্সেল থেকে বহুদূরে অবস্থান করতে পারে। এখানে সে অনুক্ষণ মার্সেলের যে দৃষ্টির সম্মুখীন হচ্ছে তা যেন সান্তনার হয় এই কামনা তাকে চঞ্চল করে তুলছে। যে ব্যক্তি পাশ কেটে চলে যায়—অথবা তার সামনেই যারা বসে পান করছে তাদের দৃষ্টিতে যেন নিরপেক্ষতার ছায়া বিস্তৃত। এবং সে এখানে বিশদ করে ভেবে চলেছে যে নিরপেক্ষতাই তার অনুকূলে রায় দান করছে। বস্তুতঃ তারা সবাই একজন স্বাধীন মানুষের ওপরই দৃষ্টি স্থাপন করছে। কিন্তু তাদের কাছে সে মূলতঃ যথাযথ নয় বরং একটি কক্ষে অবরুদ্ধ এক অস্তিত্ব মাত্র। যে অনুক্ষণ এক অবশ্যম্ভাবী দায়িত্বের ভীতিপ্রদর্শনে বিবন্ন। সে এখন এমনই এক ব্যক্তি যে এই কাফের যে কোন স্থানে আপন ইচ্ছে মতো বসতে পারে। মার্সেল ও পণ ধরতে অবলম্বন খুঁজছে। প্রসঙ্গতঃ ম্যাথুকে এখন সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে যে তরুণী সে মার্সেল নয়—সে এক অজ্ঞাত দর্শক। অল্প পরিচয় এক তরুণী ছাত্রী আইভিচ তার প্রাথমিক আকর্ষণ যৌবনকে ঘিরে। ম্যাথুকে সে কি বলতে চায়? "আমি সময়কে জমা করে রাখি যদিও তা প্রবহমান। এই অবস্থা আমাকে কখনো বঞ্চিত করেনি।"

যে দৃষ্টি তাকে অন্ধ করার জন্য মুগ্ধ করে সেই উপলব্ধি তো যৌবনের।

সেদিক থেকে ম্যাথুর দৃষ্টিশক্তি সতেজ এমন কি প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। আই-ভিচের সঙ্গে তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা বিস্মিত হবার কারণকে প্ররোচিত করে। ম্যাথুর পছন্দ মন্দ নয়। যদি সে আইভিচের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে তবে তার নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে তাকে অর্পন করার মতো কিছু রয়েছে। আইভিচের সত্যিই দেবার কিছুই নেই। সে অস্তিত্বের প্রয়োজনে একেবারে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করছে। তাই যে কোন কর্ম, কাজের উদ্যম বা পরিস্থিতি বা সন্ধিলগ্ন স্বাভাবিকভাবে আইভিচকে আতঙ্কিত করে। পরিণতিতে যখন সে ম্যাথু ব্যতীত অন্যকোন পুরুষদ্বারা সতীত্বহানির অনুমতি প্রদান করে তখন তার বদমেজাজই উদঘাটিত হয়ে পড়ে। এইভাবেই সে নিজের পরিবারের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আইভিচের অসুখী অবস্থা ও তার দৃঢ়সংকল্প-হীনতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

আইভিচ এক চরম উপলব্ধির জগতে অবস্থান করে। সেখানে সে লক্ষ্য করছে যে বিশ্ব তাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাকে নষ্ট করা। এবং এইভাবেই সে অন্য এক পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কবে সেই সুদূর অতীতে তার পিতামাতা রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন—প্রত্যক্ষভাবে সে কিছুই জানেনা। তারসঙ্গে মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলো তারই ভ্রাতা —যা তার কামনার প্রকাশ মাত্র।

উপন্যাসের প্রথমখণ্ডে আইভিচের অবস্থান অসুস্থ অবস্থা এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এসব সমস্যা কেন্দ্র করে আবেগ চালিত উদাসীনতা পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আইভিচের প্রচণ্ড ভয় গ্রন্থে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। সাত্রে´র সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় এক আবৃত্তিশীল মহা আতঙ্কের রূপ। যে মানুষের হাত তাকে স্পর্শ করার জন্য এগিয়ে এসেছে তা মূলতঃ অধিকারের ভঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করেছে। ম্যাথুর মতো সে নিকটবর্ত্তী বিশ্বে আশ্রয় প্রার্থনা করেনা। সেখানে হয়তো সে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো। বরং সে যেকোন পরিস্থিতি থেকেই নিজেকে ধ্বংস করার পথ নির্বাচন করতে প্রলুব্ধ হয়।

সংরক্ষিত দূরত্বের অন্তরালে কৌশল না বুঝেও ম্যাথু মনে মনে আইভিচকে প্রশংসা করে। সে ভাবে এ ধরণের অবস্থাই আইভিচকে নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষা করবে। তার কোমল কটিদেশ অনমনীয় অপূর্ব স্তন লাঞ্ছনার যন্ত্রনা অনুভব করবেনা। এর ফলে সে সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে

যেমন ম্যাথু পরিত্রাণ লাভ করতে পারেনি। আইভিচের নিঃসঙ্গতায় বাস শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে, ম্যাথু তীব্রভাবে অনুভব করে সে কোন প্রকারেই আইভিচের জন্য অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ নয়। পরিণতিতে সে আইভিচের প্রেমে পড়ে। অতি সচেতনভাবে সে সতর্ক হয়ে পড়ে ভালবাসার ব্যাপারে। এতো তার বাসনারই অভিক্ষেপ মাত্র। সুতরাং সে কোথাও বাধা সৃষ্টি করেনা। প্রত্যেকটি চরিত্র এক জটিল ক্রীড়া বা শিকারে জড়িত। যার উদ্দেশ্য হলো সব বন্ধ করে দেয়া যেখানে রয়েছে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ও আপোস মীমাংসার প্রয়াস।

আইভিচের দূরত্ব এখানে স্বভাববহির্ভূত। বহিরাগত ব্যক্তির অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বিশ্বে তার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। এবং স্বাভাবিকভাবে এই পৃথিবী তার ওপর কোন দাবীও ঘোষণা করতে পারেনি। সুতরাং এই বিশ্বের প্রয়োজনেই তার অস্তিত্বের বিশদ বিশ্লেষণ হয় অন্যের জন্য। প্রাথমিকভাবে আইভিচ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—যে সে পরনির্ভরশীল হতে পারেনা—কেননা সে এই অবস্থাকে ঘৃণা করে। এই ঘৃণাবোধই তাকে এক সন্ধিলগ্নে উপস্থাপিত করে—এবং তারই প্রতিধ্বনি লক্ষ করি সার্ত্রের তত্ত্বসমৃদ্ধ রচনাবলী "Being and Nothingness" এর মধ্যে ?" I escape the other by leaving him with my alienated Me in his hands. But as I choose myself as a tearing away from the other, I assume and recognize as mine this alienated Me My wrenching away from the other is Myself—is by its essential structure an assumption as mine of his Me which the other refuses ; we can even say that it is only that".

বস্তুতঃ আইভিচের অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেই সে নিদারুণ মানসিক বা শারিরিক যন্ত্রনায় যে ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সেখানে পরীক্ষার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা যেন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ডেকে আনে। সে যেন অন্যের ওপর নির্ভরশীল তা প্রমাণিত হয় এমন কি তার বিচার ও এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ম্যাথু ও আইভিচের সম্পর্কে মৌলিক সমস্যাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে যা' সার্ত্রের সব চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত। তারা সবাই নিজেদের দৃষ্টিতে মুক্ত অথচ অন্যের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ব্যতিরেকে কিছুই নয়।

সাত্রে প্রধানতঃ সচেতনতার সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করেন। ফাঁপা অবস্থাকে অন্তহীণভাবে পূর্ণকরার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ম্যাথু ও আইভিচের মধ্যে যে উত্তেজনা তা এক বিক্ষুব্ধ অবস্থার উৎসমুখে অবস্থান করছে। তাদের সচেতনতা পরস্পর বিরোধী স্বভাবদ্বারা পরিপূর্ণ যা থেকে কখনো নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব নয়। কারণ তারা কেউই সেই পরস্পর বিরোধী স্বভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। প্রতিবাদমূলক স্বভাব সংক্রামিত হয়ে যে কর্ম সম্পাদন করে তার অনিবার্য পরিণতি হলো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন। তখন এই নির্জনতাই জীবনের একমাত্র পথ এবং অভিষ্টফলদানে সক্ষম বলেই মনে হয়। অথচ প্রত্যেকেই পরস্পরের সান্নিধ্যে ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার অবসান ভাবনায় আতঙ্কবোধ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ম্যাথু স্পষ্টভাষায় উচ্চারণ করতে পারেনা—তাদের কার্য বা আচরণ সত্যি সত্যি কোন অচল অবস্থার জন্য দায়ী কিনা! কিন্তু তাদের দু'জনের হতাশার মূল কারণ হলো অনিশ্চয়তা। একজনের নিঃসঙ্গতা অন্যের নিজস্ব দর্পনে উজ্জ্বলভাবেই প্রতিবিম্বিত।

যেসব লোক আইভিচের সমকক্ষ হতে চেয়েছে সে তাদের সবাইকে অতিশয় ঘৃণা করতে বাধ্য হয়েছে। ম্যাথুর উত্তেজনা বা ক্রোধ দ্রুত অপসৃত হয়। সে উপলব্ধি করে আইভিচের আদিম অঙ্গভঙ্গির জন্য অনেক কিছু করেছে। বাকী সন্ধ্যার জন্য সে এবং আইভিচ দম্পতি হিসেবে বাস করে। দু'জনে প্রকাশ্যে হাসাহাসি করে যা আনন্দের সমীপবর্তী। সংক্ষিপ্তভাবে দু'জনের অত্যন্ত সরল ও আন্তরিক কথোপকথন মুহূর্ত্তেই নিজস্ব ভাবনা থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে এক প্রতিশ্রুতিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে : "সেই মুহূর্ত্তের সম্ভাবনা—ছোট্ট হীরকখণ্ডের মতো ঝকমকে। যা চিরায়ত। অথচ সেই মুক্তি মানুষের প্রাপ্য নয়। কারণ প্রতিটি মানুষই নিজস্ব নিঃসঙ্গতায় বারবার প্রত্যাবর্ত্তন করে।

অনুকরণও কখনো কখনো সংহতি বা ঐক্যের সূত্র উদ্ভাবন করে। একবার ম্যাথু আইভিচকে অনুকরণ করতে গিয়ে অনুভব করে সে যেন আইভিচের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেছে। আইভিচের কর্মধারা আইভিচের আচরণ যেন ম্যাথুরই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আইভিচ নিজেকে ছুরিকাঘাত করে প্রতিবেশী দম্পতির সম্মুখে অস্তিত্ব ঘোষণার প্রয়োজনে—তেমনি ম্যাথুও আইভিচের সম্মুখে ছুরিকাঘাত করে একই উদ্দেশ্যে।

কৈশোরের বন্ধু এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির এক গোঁড়া সমর্থক ব্রুনেৎ ম্যাথুর অভ্যন্তরীণ ভাবনার প্রক্রিয়ার একজন ক্যাটালিস্ট। স্পেনের রিপাবলিকানদের

জন্য সংগ্রামশীল গোমেসের পুত্র পাবলো ম্যাথুর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করার মুহূর্ত্তে ম্যাথু অন্যের প্রশ্নকে আবিষ্কার করে। সে বর্ত্তমানে যে পরিকল্পনায় মগ্ন তা হলো গর্ভপাতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। অপরাধী হিসেবে সে নিজেকে বলে ওঠে—সে কখনো কোন কুৎসিত কর্মের চিন্তাও করেনি : "I am going to prevent an infant being born" এসব বিশ্লেষণের মধ্যে নিজেকে টেনে এনেও সে দায়িত্বের জন্ম থেকে সচেতনতাকে দুরে সরিয়ে রেখেছে।

ম্যাথু যা চিন্তা করে তাই সে কর্মে রূপদান করে। দায়িত্ব কারুর ওপরই অর্পিত নয় একমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্ব ছাড়া। ম্যাথু সংস্কারমুক্ত। কারণ সে অণুক্ষণ প্রশ্ন করে, প্রত্যেককে এবং প্রতিটি জিনিষকে পরীক্ষাও করে যুক্তি দিয়ে। অথচ ম্যাথুর পৃথিবী উদাসীন।

ম্যাথুর বিদ্বেষপরায়ণ সমকামী বন্ধু ড্যানিয়েল মার্সেলকে দেখে আকর্ষন অনুভব করেছে। এমন কি সে তাকে সন্তানলাভের পরামর্শও দান করে। ইতিমধ্যে ম্যাথু গর্ভপাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে যখন মার্সেলের ফ্ল্যাটে হাজির হয় তখন মার্সেল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ম্যাথুকে সে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দেয়। এবং সেইসঙ্গে জানিয়ে দেয় যে ড্যানিয়েলই তাকে বিয়ে করতে রাজী এমন কি ম্যাথুর সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে মোটেই কুণ্ঠিত নয়। সমকামী হলেও ড্যানিয়েল ম্যাথুকে প্রতিশ্রুতি দান করে যে স্বামী হিসেবে সে তার কর্ত্তব্য যথাযথভাবেই সম্পাদন করবে।

মুহূর্ত্তে ম্যাথু নিজেকে এক নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে। এদিকে আইভিচও মার্সেলের মতো তাকে করুণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তারপর আইভিচ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ম্যাথু তখন ড্যানিয়েলকে অদৃশ্য হতে দেখে অন্য এক দুঃশ্চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে : "আমিই শুধু একা। এবং সেই একাকীত্ব, বহন করে চলব।" আবার একক হিসেবে সে পূর্বের চেয়ে স্বাধীন নয়। শেষ সন্ধ্যায় স্বগতঃ ভাষণে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে : "যদি একা মার্সেল না থাকে তবে কেউই আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেনা। আমার জীবনও শুষ্ক হয়ে ওঠবেনা।" ম্যাথু তখন জানালা বন্ধ করে নিজের কক্ষে ফিরে আসে। আইভিচের দেহের সুবাস বা গন্ধ এখনো ঘরের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। সে বুকভরে সেই গন্ধ গ্রহণ করলো। দিনের ঘটনার আলোড়ন পুণরীক্ষণ করলো : "এত যে ব্যস্ততা তা যেন কিছুই নয়। "ম্যাথ

ভেবে চলে সত্যিই তো কোন কিছুই নয়। তবুও তার কোন পরিবর্ত্তন হবেনা। যেমন ছিলো তেমনি থাকবে। ··সে হাই তুললো। সে দিনটির অবসান ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে সে যৌবনেরও পরিসমাপ্তির রেখা টেনে এনেছে। সম্মুখে ভেসে ওঠে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত নৈতিকতা, কর্ত্তব্যপালন, মোহমুক্ত ভোগবাদ, সহিষ্ণুতা, আত্মসমর্পন, সাধারণজ্ঞান ও জেনোর মতবাদ। সুখদুঃখের প্রতি সমপরিমান ঔদাসিন্য। এসবের সাহায্যে একজন মানুষ জীবনের ব্যর্থতা তিল তিল করে রসিকের মতো উপলব্ধি করে। ম্যাথ্ আবার হাই তোলে। সে পুনরাবৃত্তি করে : "এটাই পরমসত্য। আমি Age of Reason এ সিদ্ধিলাভ করেছি।"

জ্যাপল সাত্রে´র উপন্যাসের আলোচনার পর সাহিত্যেরই অন্তর্ভূক্ত নাটকে অস্তিত্ববাদ দর্শনের প্রভাবকে বিশেষভাবে প্রতিফলিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ The Respectable Prostitute (১৯৫২) অস্তিত্ববাদের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। এই শতকের অন্যতম অর্থহীন নাটক হিসেবে মঞ্চে অভিনয়ের পর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এখানে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের সান্নিক্ষণ প্রত্যক্ষ। তাছাড়া মৃতদ্বারা এই পৃথিবীর জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের স্থান নিরূপণের প্রয়োজনে।

The Respectable Prostitute-এ তিন শ্রেণীর মৃতের ভূমিকা রয়েছে। প্রথম শ্রেণী যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমাহিত, এই বিশ্ব থেকে তাদের প্রস্থান সত্ত্বেও বাসগৃহে তারা দেবতায় রূপান্তরিত এবং তাদের শক্তি ইউমেনিদিসের চেয়েও কম নয়। তাছাড়াও রয়েছে জীবনমৃত এক সম্প্রদায়। তারা দক্ষিণ আমেরিকার শ্বেতকায়। জন্মসূত্রে অতীতের ঐতিহ্যের অধিকারী বলে তা রক্ষা করার কর্ত্তব্যও তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাদের আচরণের সত্যতা প্রতিপাদনে তারা অধিকতর আগ্রহবোধ করে। কারণ এছাড়া তারা কোন-প্রকারেই অভিজাত বংশের উত্তরাধিকারী বলে চিহ্নিত হতে পারেনা। বস্তুতঃ সাত্রে´র বন্দীভাবনার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। The Imagination-এ তিনি উল্লেখ করেন : "is constrained to realize all its own intentions"

প্রয়োজনে ক্রটীপূর্ণ বিশ্বাসের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তও এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ফ্রেডের কৈফিয়তের মধ্যে "· with the Devil you can only do evil [My Cousin] put his hand up your Skirts, he shot a dirty nigger, so what? Those one only gestures you do

without thinking; they don't count" তার বক্তব্যে ভিন্ন ধরনের অশুভ বিশ্বাসের উদাহরণ রয়েছে। যার ফলে বারবিলাসিনী লিজির কাছে প্রস্তাব করতেই সে তাকে গুলি করার ভীতি প্রদর্শন করে; জানো আমার পিতা সিনেটার। সুতরাং তার পরেই আমি সিনেটার হবো; আমিই তার অবশিষ্ট পুরুষ উত্তরাধিকারী। আমরা এই দেশ গড়ে তুলেছি। অতএব এর ইতিহাস মূলতঃ আমাদেরই জীবন কাহিনী।"

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই বিশ্বে লিজি যে মুক্তি নিয়ে আসতে সমর্থ হতো তাদ্বারা তার মধ্যে কোন বিশ্বাসই উৎপাদন করতে পারেনি। সত্যিই সে পুরুষ উত্তরাধিকারী থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলো। অধিকতরভাবে ঐতিহ্যের বিচারবোধ লিজির মধ্যে প্রত্যয় উৎপাদন করেছিলো। যদিও ঐতিহ্য তার জন্যে ন্যূনতম কৌলিন্য হিসেবে পৃথকবৃত্তি লালন করার সুযোগ দান করেছে। লিজি ও তার অবস্থা বর্ণনা করার জন্য ফ্রেডকে সম্মতিদান করেছিলো; "তোমার মতো নোংরা স্ত্রীলোক আমার মতো লোককে গুলি করতে পারেনা। তুমি কে? এই বিশ্বে সত্যিই তুমি কি করছো? তুমি কি জানো তোমার পিতামহ কে ছিলেন? আমার এখানে বাস করার অধিকার রয়েছে। এমন কি অনেক জিনিষ করারও রয়েছে: বহুলোক আমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেও চলেছে, (পৃঃ ৩১৫)।" ফ্রেডকে নিজের বর্ণনাদানের সম্মতির মুহূর্তে লিজির কাছে সত্য প্রকাশিত হতে থাকে। সে নিজেকে সেই অবস্থার উপযোগী করে প্রস্তুত করে। সে অনুভব করে তাদের ঐতিহ্য, তাদের আচ্ছন্ন অবস্থা ও তাদের একান্ত প্রয়োজনের ওপর দিয়েই এই বিশ্ব পরিক্রমণের বৃত্তে এগিয়ে চলেছে। তবুও ক্ষনিকের জন্যে সন্তোষ বিধান করে একটি আশা। যেমন মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং সপ্তাহের শেষে যখন ফ্রেড তার কাছে আসবে। তাকে আসন্ন উত্তেজনাও আবিষ্ট করে রাখে সেই সময় ফ্রেড তার সঙ্গে কলঙ্কে লিপ্ত হবে। এবং রাগ-মোচন সম্পাদন করবে। "সব কিছুই" ফ্রেড্ পরিণতিতে বলে ওঠে: "স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করবে।"

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে নিগ্রো। নিগ্রো এক ধরনের মৃতের ভূমিকা পালন করে। তারা সবাই মৃত। অন্য যে কোন স্বাভাবিক মানুষের মতোই তারা মুক্তি দাবী করতে পারে। যেমন ইহুদী অথবা মানুষেরই (নিপীড়িত) শোষিত শ্রেণী। এই ধরণের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে শত্রুকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এইভাবেই একসময় তাদের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবীতে নিগ্রো

ও বারবনিতা অশুভ শক্তি সদৃশ। যদিও শ্বেতকায় নিগ্রোকে গুলি করে এবং বারবনিতাকে শোষন করে। এখানে নিগ্রো ও বারবনিতা দুজনেই বোঝা বহন করে চলে এবং অপবাদের গ্লানিতে অংশ গ্রহন করতে হয়। সার্ত্রে নিগ্রোকেও ক্ষমা করেননা। তার স্বীকারোক্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে শ্বেতকায়কে গুলি করতে পারেনা কারন সে অনাবশ্যক শর্তাধীনে আত্মসমর্পনের জন্য প্রস্তুত। অথচ সে অনায়াসেই তাকে গুলি করতে পারতো যেখানে শ্বেতকায়ই তাকে বিচার ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে এবং তাকেই সে অনুসরণ করে চলেছে, অবশ্য সেদিক থেকে তার ভাগ্য অধিকতর মন্দ হবেনা। লিজির মতো তার প্রত্যাখ্যান তো মুক্তি সদৃশ। সেই মুহূর্ত্তে সে সনাক্ত করতে পারে জীবনের ওপর মৃতের অবাধ অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে।

এইভাবেই মৃত জীবিতদের সুনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। অথচ মৃত কখনোই ব্যক্তিগত ভাগ্য পরিকল্পনা করতে পারেনা। এবং সেই ক্ষমতা অনিবার্যভাবে জীবিতদের ওপর পরিবর্ত্তিত হয়। মৃত শুধুমাত্র উপকথা বলেনা কিন্তু কৈফিয়ৎ সমর্থন করে। মৃত একদা যখন জীবিত ছিলো তখন তারা সবাই শিশুদেহ ভবিষ্যৎ ও আশা নিরাশা নিয়ে কথা বলতো। যে নিগ্রো ছিলো তার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো ভীতিপ্রদর্শন এবং যৌন প্রয়োজনের জন্য বারবিলাসিনী। অন্তরালে অবস্থান করে মৃত অনুক্ষণ এক গঠনমূলক প্রভাব রেখে এসেছে। তা হলো নির্জ্ঞেয় অবস্থা। তার ফলে মানুষ অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে যে মৃত মাত্রেই ভ্রান্তি। এবং তাদের পরামর্শদাতা দাসগুলভ আচরণে অভ্যস্ত।

এই নাটকের চরিত্র মূলতঃ নির্বোধ। সমাধির এখানে মৃত্যু নেই এবং মৃতের অভিনয় যারা করে তারা মৃতদ্বারাই শৃঙ্খলিত। সেই ঘোষণাপত্র সচেতনভাবেই রচিত। মৃত এখানে উভয়ক্ষেত্রেই অতীতের পটভূমি থেকে মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, অথচ বিরাট প্রলোভন মানুষের স্বাধীনতার পথে অন্যতম বাধা হিসেবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠেছে।

The Flies (১৯৫৪) গ্রীক পুরাণের নবসংস্করণ। সার্ত্রের এই নাটক জনপ্রিয়তার দিক থেকে যথেষ্ট সাড়া পায়নি। ১৯৪৩ সালে নাৎসী প্রশাসন এই নাটকের মঞ্চপ্রয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। তবুও এই নাটক শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অস্তি নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক ধারণার

বিচার এক জটিল আকার ধারণ করেছে। যার ফলে নাটকের নীতিও অনেকাংশে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেছে।

গ্রীক পুরাণে ছিল আরগোসে ওরেস্তেস। সার্ত্রের নাট্যরূপে গৃহ শিক্ষককে নিয়ে ওরেস্তেসের আরাগোসে প্রত্যাবর্ত্তন। এখানেই একদা তার পিতা রাজা ছিলেন। এখন পতঙ্গের সঙ্গে সংক্রামক মহামারী এই রাজ্যকে গ্রাস করেছে। প্রজাগণ বা মানুষ অপরাধের বোঝায় বিষন্ন। তার গৃহশিক্ষকও এক অচেনা ব্যক্তি (ছদ্মবেশে জুপিটার) ওরেস্তেসকে দ্রুত সরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু ওরেস্তেস এখানে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার ভাবনায় রয়েছে এই মহানগরী যখন তার নিজস্ব সুতরাং এই অবস্থায় তাকে কিছু করতে হবে। অতীতে ওরেস্তেসের পিতা আগামেননকে তারই ভ্রাতা হত্যাকরে এবং রাণী ক্লাইতেমনস্ত্রাকে বিয়ে করে। বর্ত্তমানে সেদিনের অপরাধ বহন করে তারাই রাজ্য শাসন করছে। অথচ তীব্র অনুতাপের জ্বালা ও পাপবোধ জনগনকেও সিংহাসনের সঙ্গে একত্রে বন্ধন করে রেখেছে, এই মহানগরীর ধর্ম হলো মনস্তুষ্ট ও অনুশোচনা। ক্লাইতেমনস্ত্রার কন্যা ও ওরেস্তেসের ভগিনী ইলেক্ত্রা বাধ্য হয়ে মাতা ও সৎপিতার অধীনে বাস করে। জাতীয় অনুশোচনার দিনে ইলেকত্রা আরগাইভ নাগরিকদের কাছে বক্তব্য রাখে যে তাদের ধর্ম মিথ্যে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তারা যেন সুখী হয়। গণ বিক্ষোভমূলক বিস্ফোরণের বিপদ-সঙ্কেত পেয়ে জুপিটার দেবমন্দিরের স্তম্ভ ভূপাতিত করতে থাকেন এবং একই সঙ্গে তিনি জনগণকে ইলেক্ত্রার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন।

ইতিমধ্যে ওরেস্তেস ইলেকত্রার সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়েছে। ইলেকৃত্রা স্বপ্ন দেখে এসেছে যে একদিন সত্যিসত্যি তাঁর ভ্রাতা দেশে প্রত্যাবর্তন করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। ওরেস্তেস আত্মপরিচয় ব্যক্ত করে প্রতিশ্রুতিদান করে যে তার স্বপ্ন অতিসত্বর সফল হবে। জুপিটার পুনরায় তার সঙ্কেত চিহ্ন ওরেস্তেসের কাছে প্রেরণ করে নগর পরিত্যাগ করার আদেশ দেন। কিন্তু ওরেস্তেস ক্রমে সবকিছু উপেক্ষা করে চলে। এদিকে জুপিটার এইগিস্থাসকে ওরেস্তেসের অবস্থান ও তাকে হত্যার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। এইগিস্থাসকে সতর্ক করার ফলে জুপিটারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন : আপনি তো দেবতা! আপনি তো এসব ঘটনার নিবৃত্তি করতে সক্ষম। তবে কেন বিরত ?

জুপিটার গোপনীয়তা উদ্‌ঘাটন করে বলেন : দেখ মানুষের স্বাধীনতার ওপর ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই।

ওরেস্তেস আঁড়িপেতে জুপিটার ও এইগিস্থাস এর কথোপকথন শুনে ফেলে। এবং নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সে অগ্রসর হতে থাকে। ওরেস্তেস প্রথমে এই-গিস্থাস ও পরে মাতাকে হত্যা করে। ইলেকত্রাও এই ঘটনায় আকস্মিকভাবে মানসিক আঘাত লাভ করে। সে আশ করেছিলো জুপিটার আবির্ভূত হয়ে তাকে অনুশোচনার উপদেশ দান করবেন। এবং সে অভিভূত হয়ে তাই পালন করবে।

ওরেস্তেস শক্তি প্রয়োগে প্রতিরোধ করে চলে। সে নিজস্ব নৈতিকতার স্বশাসনের দাবীও ঘোষণা করে। দেবগনের অধিকৃত বিশ্বে জুপিটারের ছলনার বিরুদ্ধে ওরেস্তেস নিজের অস্তিত্বের অবস্থান ঘোষণা করে। সে তার আচরন বা কর্মের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সে কোন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়। কারন তার বিশ্বাস সে কোন অন্যায় করেনি। সুতরাং সে উন্নত শির নিয়েই আরাগোস ত্যাগ করে।

শেষ দৃশ্যে জুপিটার ও ওরেস্তেসের মধ্যে এক সংকটময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। জুপিটার ইলেকত্রাকে দুর্বল করে মনস্তাপে অশ্রুবিসর্জনে বাধ্য করেন এবং ওরেস্তেসকে হেয় করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি প্রস্তাব করেন ওরেস্তেস যদি অনুশোচনা করে তবে সিংহাসন তারই প্রাপ্য। কিন্তু নিদারুন বিরক্তি সহকারে ওরেস্তেস উত্তর প্রদান করে। জুপিটার তার অহংকার লক্ষ্য করে বলেন গর্বিত হবার মতো সে কিছুই করেনি। ওরেস্তের উত্তর : অনুশোচনা তার ক্ষেত্রে কাপুরুষতা বলেই প্রযোজ্য হবে।" জুপিটার ওরেস্তেসকে তক্ষুনি স্মরণ করিয়ে দেন যে সশস্ত্র বিশ্ব নিখিল নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দেবগণের বিধান অনুযায়ী। এবং তার কাছে মিনতি করেন সে যেন প্রকৃতির কাছে ফিরে এসে কর্তব্য পালন করে। ওরেস্তেসের নির্ভিক কণ্ঠ জেগে ওঠে : "তুমি দেবগণের সম্রাট হে জুপিটার, তুমি রত্নের অধীশ্বর, নক্ষত্রের রাজা সমুদ্রের অধিপতি। কিন্তু তুমি মানুষের রাজা নও"। জুপিটার দাবী করেন : "আমি কি তোমাকে সৃষ্টি করিনি ? ওরেস্তেস সম্মতি প্রকাশ করে কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত করে যে জুপিটার তাকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যে মুহূর্তে তার স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়েছে সে মুহূর্তে সে আর ঈশ্বরের অধিকারের মধ্যে নেই। "আমিই আমার স্বাধীনতা।"

জুপিটার প্রশ্ন করেন যদি ওরেস্তেস তা সত্যিই উপলব্ধি করে থাকে তবে সে নিরাপত্তা ও নিরাপদ আশ্রয়ের সুখ থেকে দূরে সরে যাবে। মুক্তি অর্থে এতো

নির্বাসন—যা মানসিক ও শারিরিক যন্ত্রনা বহন করে বেঁচে থাকা। ওরেস্তেস স্বীকার করে। সে জানে সে অপরাধী। সে তখন নিজের রীতী অনুযায়ী জীবনের অর্থ খুঁজে পায়—যেমন প্রতিটি মানবসন্তান সেই অর্থ অনুধাবন করে। "তুমি ঈশ্বর এবং আমি মুক্ত। আমরা সমভাবে নিঃসঙ্গ। আমাদের মানদিক বা শারিরীক যন্ত্রণা এক। জুপিটার ওরেস্তেসকে স্মরণ করিয়ে দেন—এই ধরণের আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ওরেস্তেস গর্বভাবে উত্তর দান করে : মানুষ মাত্রেই স্বাধীন এবং মানুষের জীবন হতাশার সীমারেখায় সুরু।"

এই নাটকে জুপিটার মূল চরিত্র। তিনি ঈশ্বর। ভাবা যেতে পারে নাস্তীবাদী ঈশ্বরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সার্ত্রের নাস্তিবাদ সত্যিই অচেনা। তিনি প্রচালত ধারনার সঙ্গে যুক্ত মানবতাবাদীর বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করলেও 'ঈশ্বর' শব্দে কোন বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন না। এমন কি ঈশ্বরের ধারণাকেও একপাশে সরিয়ে রাখেন। সার্ত্রের কাছে "ঈশ্বরের মৃত্যু" প্রগাঢ় জ্ঞানের সঙ্গে ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত।

"দি ফ্লাইজ" নাটকে ঈশ্বর নীতিমূলক বাণী প্রচার করেন। বস্তুতঃ বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য বলে তা উপলব্ধি সম্ভব হয়ে ওঠে না। মানুষ নিজের জন্য নৈতিক মান সৃষ্টি করে যা অধিবিদ্যামূলক এবং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বলা যেতে পারে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। সেখানে মানুষ কখনোই ঈশ্বরের নতুন হিসেবে সমর্পনের প্রতিরোধ রচনা করে। বাহিরের কোন শক্তিও সেই মানুষের ওপর, প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। মানুষ এখানে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন এবং "নিজস্ব রীতিতে" বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। ভবিষ্যৎ ও সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত। সার্ত্রে অবশ্য 'দি ফ্লাইজ' এর অনুকরণে প্রবন্ধও রচনা করেন :

"মানবিক স্বাধীনতা মাত্রেই অভিশাপ। কিন্তু এই অভিশাপ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রতিফলিত করে।"

নাটকটি মানবতাবাদী হিসেবে সুচিহ্নিত। এখানে মানুষ মুক্ত বলেই অদৃশ্য শক্তির বশ্যতাকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে। মানব ঐতিহ্যের দিক থেকে তা হবে রীতিমত বিপ্লবাত্মক।

এস্কাইলাস নিজেদের সঠিক প্রশ্ন করলেও সবসময় ত্রুটীপূর্ণ উত্তরের সম্মুখীন হন। তখন উভয়েই তাদের যথাযথ বিশ্লেষণের সন্ধান লাভ করেন। মানুষের প্রতিকৃতি যে বিশ্বে নিক্ষিপ্ত সেখানে সে উভয়সংকটে বিড়ম্বিত। প্রতিটি মানুষও

যেন ভূতগ্রস্থ হয়ে পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দান করে। ওরেস্তেস সেদিক থেকে সার্ত্রিয়ান মানুষের আদিরূপের এক চমৎকার নিদর্শন।

এস্কাইলাস ও সফোক্লিস উভয়েই প্রাচীন রীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং হিংস্রতা স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত ছিলো। অবশ্য সমাধানের প্রয়াসে এক অর্থহীনতা প্রতিফলিত হতে থাকে। সার্ত্রের উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অশুভ পরিস্থিতির পটভূমিকায় লক্ষ্য করা যায় প্রচলিত রীতি মানুষকে বিহ্বল করে তোলে। এই ধরণের মন্দ অবস্থায় সব মানুষই নির্দিষ্ট অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন এবং আতঙ্কবোধ করে। তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যও তখন পরস্পরবিরোধী পরিবেশে বাস করে।

সার্ত্রের পদ্ধতিতে বিচক্ষণতার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বিপজ্জনক বলে মনে হয়। ন্যায়পরতা মানুষেরই সম্পর্কিত একটি বিষয়। পৃথিবীতে তার হঠাৎ উদ্ভব ঘটেনি। যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে স্বাধীন বলে উপলব্ধি করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ওরেস্তেসের পৌরানিক কাহিনী ক্রমে এক মৌলিক পরিবর্ত্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। কারণ যে কোন সমাধান মানুষের উপলব্ধিকে ভিত্তি করেই রচিত। ন্যায়পরতা এককভাবে মানুষের সান্নিধ্যে আসে অথচ সে পর্যায়ে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

এখানে মানুষ যে মুহূর্তে আবিস্কার করে সে স্বাধীন সে মুক্ত তখন ঈশ্বরের কোন আসনের আর চিহ্ন থাকেনা :

When freedom has exploded just once in a man's soul, the Gods Can do nothing more aganist that man. Everything's upto him, then, and other men—acting on their own—will have two decide to let him go or to strangle him." (p. 86.).

No Exit (১৯৪৭) নাটক নরকের দৃশ্য অভিনীত। কিন্তু নরকের এই সজ্জা প্রায় অপ্রত্যাশিত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শের রচিত একটি সুসজ্জিত কক্ষ। কোন দর্পন নেই, নেই কোন বাতায়ন। কিন্তু তিনটি সোফা রয়েছে। গারসেঁা, উনেস্ ও এস্তেল এই তিন চরিত্রকে নিয়েই নাটক। এরা সবাই জানে তারা এখন নরকে অবস্থান করছে। প্রত্যেকেই একবার করে সেই কক্ষে প্রবেশ করে বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন করে সেখানে নির্য্যাতনের জন্য নির্দিষ্ট কোন যন্ত্র বা অগ্নির ব্যবস্থা নেই। শেষ মুহূর্ত্তে তারা সত্যের প্রকৃত রং উপলব্ধি করতে সক্ষম

হয়। তাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিজেরাই স্বকীয় যন্ত্রণার একমাত্র উৎস সেখানে একজন অন্যজনকে ক্রমাগত পীড়ন করেই চলেছে।

গারসেঁা এবং এস্তেল দুজনেই ভণ্ড এবং কাপুরুষ। ইনেস তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করে। সেই কক্ষে উনেসের অবস্থানকালেই গারসেঁা প্রবেশ করে। উনেসই তাকে রূঢ়সরে প্রশ্ন করে—তার দৃষ্টি কেনই বা আতঙ্কগ্রস্ত? গারসেঁা অতি শান্ত এবং নিরুত্তাপ স্বরে উত্তর দেয়—সে মোটেই ভীত নয়। অথচ সেই মুহূর্ত্তে দু'জনই পরস্পরের সঙ্গী। সুতরাং তাদের ব্যবহার মার্জিত হওয়া উচিত। অসামাজিক এবং স্বকামী উনেস তাকে কোন প্রতিশ্রুতি দান না করেই বলে—সে মোটেই ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত নয়। এস্তেল যখন কক্ষে প্রবেশ করে তখন সে গারসেঁার ইচ্ছে অনুযায়ী পরিস্থিতিকে সহজ করতে শোভন ব্যবহারই করে। উনেসের উপস্থিতি না ঘটলে দু'জনের আদর্শ সমন্বয় রচনা করবো। অবশ্য এই ধরনের বিনিময়ের ফলেই উভয়ের নরকে আগমন ঘটেছে। গারসেঁা বলে—সে মূলতঃ ছিল একজন শান্তিবাদী। আদর্শের জন্যেই তাকে গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছে। এস্তেল রূপসী। সে একদা বিত্তশালী বৃদ্ধকে বিয়ে করেছিলো তার উদ্দেশ্য ছিলো নিজের পরিবারের জন্য অর্থলাভের সুযোগ গ্রহণ করা। অথচ সে যাকে ভালবাসতো তার সঙ্গে ক্রমে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়েছিলো।

ইনেস তাদের কাহিনী শুনে উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। কেমন করে এবং কেনই বা তারা নরকে প্রেরিত ইনেস তাদের সামনে তুলে ধরে। গারসেঁা সাময়িকভাবে তা প্রতিহত করলেও অপরাধ স্বীকারে রাজী হয়। সে পাঁচ বছর যাবৎ নিজের স্ত্রীর ওপর নির্দয় অত্যাচার করে। সেই গৃহে—সে রক্ষিতাকে নিয়ে আসতো। এবং স্ত্রীকে তাদের শয্যায় প্রাতরাশ পরিবেশন করতে বাধ্য করতো। ইনেস সজোরে বলে ওঠে: "লোচ্ছা"। গারসেঁা প্রশ্ন করে—'এবং তুমি?" ইনেস অকপটে স্বীকার করে সে একটি রমনীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করে। এবং তার মধ্যে অপরাধবোধ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে একদিন গ্যাসের কাছে ইনেসকে নিয়ে একই সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। তারপর এস্তেল নিজের কাহিনী বলতে সুরু করে—সে তার প্রেমিককে বাধ্য করেছিলো তার সন্তানকে হত্যা করতে। এবং সেও আত্মহত্যা করে। ইনেস পর্যবেক্ষণ করে: *এখানে আমরা সবাই সত্যিই নগ্ন।"*

গারসেঁার একমাত্র প্রস্তাব তার পরস্পরকে যেন সাহায্য করে। ইনেস

তাকে আবার ধমক দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। তার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। এস্তেল তখন আপোস মনোভাব নিয়ে তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে প্রস্তুত। কিন্তু গারসোঁ এস্তেলের প্রস্তাবে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। এখানে ইনেসের সিদ্ধান্তও তার একান্ত প্রয়োজন। সে প্রত্যেকেরই শুভকামনা আশা করে। তাপর দেখা যায় কেনই বা গারসোঁ নরকে নির্বাসিত? স্ত্রীর প্রতি নির্দয় আচরণ দায়ী নয়। বস্তুতঃ সেখানে তার কাপুরুষতাই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের চেষ্টা করেছিলো। পরিশেষে ধরা পড়ে এবং ভীরুর মতো মৃত্যুবরণ করে। এই কারণই তাকে বারবার দহন করে। বন্ধুদের কাছে আজ সে একজন কাপুরুষ মাত্র। সে এস্তেলকে প্রশ্ন করে: "তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালবাস? এস্তেল উত্তর দান করে: "তুমি কি মনে করো আমি একজন ভীরুকে ভালবাসতে পারি?

গারসোঁ তখন সজোরে আঘাত করে দরজা খুলে ফেলে। কিন্তু কক্ষ পরিত্যাগের কথা চিন্তা করতে পারেনা। সে পুনরায় ইনেসের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করে। সে যে ভীষণ নয় তা ইনেসের কাছে প্রমাণ না করে স্থান ত্যাগ করতে পারেনা। সে প্রশ্ন করে: যখন কোন বিপজ্জনক পথ নির্বাচন করতে হয় তখন সে কি কাপুরুষ হতে পারে? আর তুমি একটি ঘটনা দিয়ে সমগ্র জীবনকে বিচার করতে পার?

ইনেসের কণ্ঠে অভিযোগের উত্তাপ: "তুমি বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বপ্ন দেখতে পার কিন্তু সঙ্কটমুহূর্তে তুমিই আবার পলায়নের পথ খুঁজে এগিয়ে যাও। গারসোঁর দাবী সে তার পছন্দমতো বীরত্বের বা শৌর্যের স্বপ্নও দেখেনি। ইনেস প্রমাণ পত্র দাখিল করতে বলে। তাছাড়া একমাত্র কর্মই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে রূপায়িত করে। গারসোঁ ধীরে ধীরে বলে: জান অল্প বয়সেই আমার মৃত্যু ঘটে; যার ফলে আমার সুযোগমতো কাজ করা হলোনা। মানুষ মাত্রেই কেউ অল্পবয়সে মারা যায় আবার কাউকে মৃত্যুরজন্য অধিক বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এখন তোমার জীবন শেষ। হিসেব নিকেশেরও এই সময়। তুমি জীবনের চেয়েও কিছুই নও। ইনেসের বক্তব্য গারসোঁর মধ্যে হতাশা ক্রমে ক্রোধের সঞ্চার করে। এদিকে যে ইনেসকে এস্তেল ঘৃণা করে সে এগিয়ে এসে ইনেসের সামনেই গারসোঁর কাছে প্রেম নিবেদন করে। হয়তো এভাবেই সে প্রতিশোধ গ্রহনের কথা চিন্তা করে। গারসোঁ এস্তেলকে সোহাগে আদর করতে সুরু করে। কিন্তু সে ইনেসের ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি ও চীৎকার

"কাপুরুষ! কাপুরুষ "থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারছেনা। এস্তেল তখন উত্তেজিত হয়ে কাগজের ছুরি দিয়েই ইনেসকে আঘাত করে বসে। কিন্তু যে ইতিপূর্বে মৃত—এই আঘাতে তার কিছুই হয়না। সুতরাং নাটকের পরিণতিতে দেখা যায় তাদের মধ্যে উপলব্ধির সঞ্চার হয়েছে। তারা অনন্তকালধরে পরস্পরের সান্নিধ্যে অবস্থান করে অপরাধী বলে চিহ্নিত। গারসোঁ আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে "মানুষই নরক"।

সার্ত্রের দর্শন নাটকেও যথারীতি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। বিশেষ করে ইনেসের সংলাপে কিছু ধারণার প্রকাশ দর্শনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ। তাবলে ইনেসও নির্দোষ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। অন্যান্যদের মতো সেও নরকে প্রেরিত। তার আচরণ প্রথম থেকেই নিষ্ঠুর সুতরাং গারসোঁকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করার তার কোন অধিকার নেই। ইনেস একই সঙ্গে আকর্ষণহীনা এবং রুঢ়। সে ভণ্ড নয়। তার বুদ্ধি সততা গারসোঁর বেদনায় এক প্রচণ্ড শক্তিশালী নির্যাতনকারী হিসেবে রূপান্তরিত। কারণ তাকে কাপুরুষ চিহ্নিত করাইতো একধরণের চরম নিপীড়িত অবস্থা।"

এস্তেলের মতামত গারসোঁকে প্রভাবিত করেছে। সে মূলতঃ চপল রমনী সে এমনই স্বার্থপর যে তার কোন নীতিবোধই নেই। কেনই বা নরকে প্রেরিত তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে : আমি সত্যিই সন্তান চাইনি। তাই সে হ্রদের জলে তাকে নিক্ষেপ করেছিলো। তার বুদ্ধি তার বিবেকের মতোই যৎসামান্য। কিন্তু তার তীব্রভৎসনা গারসোঁকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এস্তেল সেখানে অবস্থান করেছে বলে তাকে পীড়ণ করার সুযোগ পেয়েছে। সে সত্যিই আকর্ষণীয়া বলে বাসনাকে প্রলোভন করার ক্ষমতার অধিকারিণী। পরিণতিতে সে গারসোঁকেই কামনা করে। কিন্তু গারসোঁর কাছে তার বাসনা পরিতৃপ্ত করার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কারণ ইনেসের দৃষ্টি তাকে অনুক্ষণ ঘিরে রেখেছে। এখানে স্পষ্টতঃ Being and Nothingness এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। অসাধ্যের পারস্পরিক অভীষ্টলাভের ওপর ভিত্তি করে দুটো মানুষ অনন্ত "প্রেম সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বস্তুতঃ সেই উত্তমকে ধ্বংস করে।

এই নাটকে ইনেস ও গারসোঁর মধ্যে কথোপকথন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার্ত্রে পর্যবেক্ষণ করেন গারসোঁকে ও তার ভ্রান্তিধারনার, প্রভাবকে। যদিও সে ইতিপূর্বে কাপুরুষোচিত কর্ম সম্পাদন করেছে। অথচ তার মধ্যে সাহসী চরিত্র

অথবা সত্তা রয়েছে। সেখানে ইনেসের চরিত্র গাঁরসোর কাছে মর্মান্তিক অস্তিত্ববাদী বাণী হিসেবে শিক্ষনীয় হয়ে ওঠে যে মানুষ যা করে তাই তার অস্তিত্ব অন্য কিছু নয়। গারসোর মহৎ বা দুঃসাহসী হবার মতো কিছুই নেই। সে ভীরু। তার আচরণ মূলতঃ কাপুরুষোচিত। এখানে সব কটি চরিত্রই মৃত। তাদের স্বাধীন কোন সত্তা নেই তাদের জীবনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য বলে তাদের কিছুই নেই। তাদের পূর্ণ জীবনী রয়েছে। অন্যদিকে বিচার করলে তাদের ভবিষ্যৎও নেই। তাদের অন্য কোন পরিকল্পনা নেই। তারা নরকে প্রেরিত। সেখানে তাদের মুক্তির কোন উপায়ই নেই। যদি গারসোঁ জীবিত থাকতো তাহলে সে তার কাপুরুষোচিত কর্মকে সাহসী প্রয়াসদ্বারা ধ্বংস করার সুযোগলাভ করতো। এমন কি পরিণতিতে সে একজন সাহসী ব্যক্তি হিসেবে গৌরবও অর্জন করতো। কিন্তু সে মৃত বলে ইনেস তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: "সত্যিই খুব দেরী হয়ে গেছে।" এ অবস্থায় তার কোন অভিপ্রায় থাকলেও আর কোন উপায় নেই। কারণ মৃত্যু সেই হিসেবের পরিসমাপ্তি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে।

সার্ত্রের No Exit নাটক নরকের দৃশ্যে অভিনীত এবং মানুষের অবস্থা নিরূপনের এক প্রয়াসকে সুচিহ্নিত করেছে। মানুষের মুক্তিকামনা বস্তুতঃ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদকে যথার্থভাবে রূপান্তরিত করেছে। এমন কি নাট্যসাহিত্যে এক মহৎ সংযোজন হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করবে।

জঁ-পোল সার্ত্র্ : নাট্যকার

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জর্মন শাসনে অবরুদ্ধ ফরাসী দেশে জঁ-পোল সার্ত্র্-এর চিন্তা অন্য পথ নেয়। তার আগে সার্ত্র্-এর চিন্তাধারা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর আজীবনসুহৃদ সিমোন দ্য বোভোয়া বলেন : 'স্বাধীনতার প্রতি আমাদের টান, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের অনীহা, আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, এই সব কিছু মিলে আমাদের এনে দিয়েছিল অ্যানারকিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের চিন্তা এমনই সঙ্গতি বিহীন ছিল যে তাকে কোন লেবেলেই চিহ্নিত করা যেত না। আমরা পুঁজিবাদবিরোধী ছিলাম অথচ মার্কসবাদী ছিলাম না। আমরা শুদ্ধ মনন ও শুদ্ধ স্বাধীনতার পূজারী ছিলাম, অথচ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ আমরা পরিহার করেছিলাম। মানুষ ও পৃথিবীর যে ব্যাখ্যা আমরা মেনে চলতাম তা ছিল একান্তই বস্তুবাদী, অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আমাদের অনীহা। এই সব অসঙ্গতি সার্ত্র্-কে একেবারে বিচলিত করত না, এগুলোকে ফরমুলেট করতেই সে রাজি ছিল না। সে আমায় বলত, সমস্যা ধরে যদি তুমি ভাবতে থাক তবে তো তুমি ভাবছই না। সার্ত্র্ নিজে এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে চলে যেত, যুক্তি-তর্কের কোনো পরোয়া না করেই।' কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধের 'আশ্চর্য মহাকাব্যোপম সংগ্রামে নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মনে হয়েছিল' তাঁদের। যুদ্ধের শুরুতেই সার্ত্র্ জর্মনদের হাতে বন্দী হন। জর্মন বন্দী শিবিরেই সার্ত্র্ তাঁর প্রথম নাটক লেখেন, বন্দী শিবিরেই তা প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই সময়ে তাঁদের মনোভাবের আভাস পাওয়া যায় সিমোন দ্য বোভোয়ার লেখায় : 'হঠাৎ ইতিহাস আমার উপর আছড়ে পড়ল, আমি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লাম। আমি আবিষ্কার করলাম আমি পৃথিবীর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, আমার স্নায়ুর সূত্রে আমি পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি।'

পারী শহরে অভাব আতঙ্ক এবং জর্মন স্বৈরাচারের ভয়াবহ ছায়ায় সিমোন দ্য বোভোয়া একভাবে সমাজসৌহার্দ্যের আকর্ষণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ; জর্মন কারাশিবিরে প্রতিরোধের তাগিদে সার্ত্র্ অন্যভাবে। কারাশিবিরে 'বারিওনা' নামে যে নাটকটি (এখনও অপ্রকাশিত) সার্ত্র্ লেখেন ও মঞ্চস্থ করেন, পরোক্ষ

সাক্ষ্যে যতদূর জানা যায়, তার বিষয় ছিল খৃষ্ট-এর জন্ম। রোমান সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে প্যালেসটাইনের পটভূমিতে এই নাটকের জন্ম তাৎপর্য ধরতে বন্দী দর্শকদের কোন অসুবিধা হয়নি। সিমোন গু বোভোয়া লেখেন, 'এই সময়ে সার্ত্র মনে করতেন থিয়েটারের যথার্থ ভূমিকা হল, যে দর্শকেরা নাট্যকারের সঙ্গে একই সঙ্কটের বোধে পীড়িত, তাঁদেরই কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা। একই সঙ্কট বলতে তখন যা সব ফরাসী মানুষই অনুভব করেছিলেন, জর্মন ও ভিশি প্রচারের সেই নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ যা ফরাসী জনসাধারণকে বলে যাচ্ছে অনুতপ্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে। থিয়েটারে এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক বাহন হয়ে উঠতে পারে যা তাদের প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার আদর্শে আবার বিশ্বাসী করে তুলতে পারে।' বড়দিনের আগের রাত্রে জর্মন কারা-কর্তাদের অনুমতিক্রমে অভিনীত এই আপাত-ধর্মীয় নাটকটির শেষে বারিওনা বলে, 'আমি স্বাধীন। আমার নিয়তি আমার হাতের মুঠোয়। আমি এগিয়ে চলেছি হেরড-এর সৈন্যদের বিরুদ্ধে। ঈশ্বর হেঁটে চলেছেন আমার পাশে। সারা, আমার নিজেকে কি অপরিসীম মুক্ত লাগছে, মুক্ত! তুমি যদি জানতে আমি কত মুক্ত! আহ্, আনন্দ, কি আনন্দ! আমার চোখ আনন্দের অশ্রুজলে সজল হয়ে উঠল।'

কারাশিবির থেকে বেরিয়ে এসে সার্ত্র যে নাটক লেখেন তার ভিত্তি প্রোথিত ছিল গ্রীক পুরাণে। নাটক লিখতে লিখতে তিনি সিমোন গু বোভোয়াকে একদিন বলেন, পুরাণ কাহিনীকে 'তিনি এমন এক অস্ত্রে পরিণত করবেন যা দিয়ে তিনি সরকারি নীতিবোধকে আঘাত করতে পারবেন, যে অপরাধবোধে ভিশি ও জর্মন আমাদের বিষিয়ে তুলছে, সেই অপরাধবোধ বিতাড়িত করে স্বাধীনতার পুনরুচ্চারণ ঘটাবেন।' সিমোন গু বোভোয়া লেখেন, 'দ ফ্লাইজ্' নাটকে 'ফরাসি জনসাধারণের কাছে সার্ত্র আবেদন করছেন, তাঁরা তাঁদের অপরাধবোধ পরিহার করে শাসককুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাধীনতায় তাঁদের অধিকার ঘোষণা করুন। তিনি চেয়েছিলেন, এই নাটক জনসাধারণের কাছে পৌঁছোক।' শেষ পর্যন্ত শার্ল দুলাঁ্য ১৯৪৩ সালের ৩ জুন যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, সিমোন গু বোভোয়া-র ভাষায় 'নাটকের তাৎপর্য বুঝতে ভুল করার এতটুকু সম্ভাবনা ছিল না; ওরেসতেস্-এর মুখে উচ্চারিত মুক্তি শব্দটি আমাদের উপর বোমার মতো ফেটে পড়ে।'

অথচ 'দ ফ্লাইজ' নাটকেই সার্ত্র-এর নাটকের ধরণটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। একটি স্তরে তিনি ঐতিহাসিক এবং সমকালীন একটি মাত্রায় দাঁড়িয়ে; অন্য এক

সূত্রে তিনি সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা বিষয়ে তাঁর দার্শনিক অন্বেষায় ভাবিত। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই তাঁর কুশীলবেরা স্থানকালসীমিত একটি খাঁচার মধ্যে আটকা পড়ে। এমন এক বন্দীত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যেই স্বাধীনতার সত্য আবিষ্কার করা যায়। সার্ত্র তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন, 'প্রত্যেক পরিস্থিতিই এক একটি ফাঁদ, সর্বত্র চতুর্দিকে দেয়াল।' সার্ত্র-এর গল্প ও নাটকে অতীত, সংস্কার ধর্ম ইত্যাদি প্রায়ই এক দেয়াল খাড়া করে। এই দেয়ালের ভয়ংকর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ব্যক্তিকে বেছে নিতে হয় তার পথ, স্ব-দায়িত্বে। আরগস-এর শাসক ইজিস্থস্ একদা আগামেমননকে হত্যা করে সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়েছিল, আগামেম্ননের স্ত্রী ক্লাইতেমনেসত্রার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। তার সেই অপরাধকে চাপা দেবার জন্য, জনরোষকে অন্য পথে বিপথচালিত করবার উদ্দেশ্যে ইজিস্থস্ সারা জাতির মনে বপন করেছিল অপরাধবোধের বীজ। প্রত্যেকেরই ব্যক্তি জীবনের আলাদা অপরাধের গ্লানিকে ইজিস্থস্ সংহত করে এক বার্ষিক আচারে, মৃতদের প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠানে। বছরের একটি দিন অদৃশ্য মৃতেরা ফিরে আসে জীবিত আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, জীবিতদের অপরাধবোধ দগ্ধ করে। এই সামগ্রিক অপরাধবোধের চাপে ইজিস্থস্‌ের অপরাধ চাপা পড়ে যায়। অপরাধী জাতি কোন্ স্পর্ধায় অপরাধী রাজাকে বিচার করবে? আগামেম্নন পুত্র ওরেস্তেস্ ও ক্লাইতেমনেস্ত্রাকে হত্যা করে সারা জাতির অপরাধ যেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আরগস ছেড়ে চলে যায়, আরগসকে মুক্ত করে দিয়ে যায়। অনুশোচনার যন্ত্রণার প্রতীক স্বরূপ যে মাছিরা নাটকের শুরু থেকে অবিরাম ভন্‌ভন্ করে বেড়ায়, তারাও আরগস ছেড়ে চলে যায়, ওরেস্তেস্ এর সঙ্গেই। ওরেস্তেস্-এর মনে কোন অনুশোচনা নেই, সে সঙ্গত প্রতিশোধ নিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই তার জাতিকে ক্লীবতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। নাটকের বিন্যাসে একদিকে ওরেস্তেস্-এর শিক্ষক, অন্য দিকে স্বয়ং দেবাদিদেব জুপিটার ওরেস্তেস্‌কে বাঁধবার চেষ্টা করে, একজন বাস্তববোধ তথা গা-বাঁচিয়ে চলার সংস্কারের নামে, অন্যজন ধর্মের নামে, নীতিবোধের নামে। দুই প্রলোভনই এড়িয়ে ওরেস্তেস্ তার পথ বেছে নেয়। ওরেস্তেস্ জুপিটারকে বলে, 'তুমিই ভুল করেছিলে। আমাকে স্বাধীন করে দিয়েই তুমি ভুল করেছ। আমি ক্রীতদাস নই, প্রভুও নই, আমি মুক্তি। যে মুহূর্তে তুমি আমায় সৃষ্টি করলে, সেই মুহূর্তেই আমি আর তোমার রইলাম না।' জুপিটার ইজিস্থসের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে ওরেসতেস্-এর চক্রান্ত তার কাছে ফাঁস করে দিয়ে ওরেস্তেসের বিনাশে রাজার সাহায্য প্রার্থনা

করে। বিস্মিত রাজা যখন জিজ্ঞাসা করে, মহাশক্তিমান দেবাদিদেব নিজে কেন ওরেস্তেসকে সংযত করতে পারেন না, তখন জুপিটার বলে, 'মানুষের অন্তরে একবার মুক্তির বিস্ফোরণ ঘটলে দেবতারা তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না।' একদিকে ধর্মকে, ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মানুষের স্বীয় দায়িত্ব স্বীকার, অন্যদিকে ফরাসি জনসাধারণের কাছে আবেদন : ইজিস্থসের মতোই জর্মন আক্রমণকারীকে আঘাত কর, ক্লাইতেমনেস্ত্রার মতো যে ফরাসি বিশ্বাসঘাতক বিদেশী আক্রমণকারীকে স্বাগত জানিয়ে দেশে নিয়ে আসে, তাকেও আঘাত কর, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যখন জনসাধারণের মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করতে একতাবদ্ধ হয়, তখন ধর্মকে আঘাত কর। সার্ত্রীয় দর্শনে স্বাধীনতার আর্তি ও মানুষের আত্মধিক্কার একই বিন্দুতে মিলিত হয় যখন মানুষ একা নিজের বিশ্বাসে ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পথ বেছে নেয়। যদিও সার্ত্র বলেন, এই ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গভীরে নিহিত থাকে ইতিহাসের জমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বচেতনার প্রেরণা, তবুও অনস্বীকার্য যে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত, নৈঃসঙ্গ্যের অন্তর্গত। অনুমান করা যায়, গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনে সময় সময় যা ঘটতে বাধ্য, যোগাযোগ, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে রাজনৈতিক কর্মীকে একক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, এমন সিদ্ধান্ত যার দায়িত্ব সম্পূর্ণত তার নিজের অথচ যার উপর নির্ভর করছে আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ, এক অর্থে বলা যায় যেন ইতিহাসই। প্রতিরোধ আন্দোলনের এই অনিবার্য পরিস্থিতিই হয়ত একভাবে সার্ত্র-এর অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে মানবসত্তার আত্মঘোষণার এক নাটকীয় প্রতীকী প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিল। এগারো বছর বয়স থেকে নিরীশ্বরবাদী সার্ত্র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধর্ম, সাবেকী নীতিচিন্তা ইত্যাদিকে একেবারেই প্রশ্রয় দিতে চাননি, এই সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হবে কেবলমাত্র মানুষের স্বাধীন সত্তার আত্মঘোষণা। ইলেক্ত্রা বহু দিন ধরে পিতৃহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও নিজের অপমানের অপনোদনের স্পৃহা লালন করেও যখন জুপিটারের নীতিশাসনের তাড়নায় অনুশোচনায় ও পাপবোধে নিমজ্জিত হয় এবং পাশা-পাশি ওরেস্তেস হাতে রক্ত মেখেও কৃতকার্য্যের দায় গ্রহণ করে খোলা চোখে, তখন স্পষ্ট হয় একদিকে ধর্মের সেই ক্ষমতা যা মানুষকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে কর্মের পথ থেকে সরিয়ে রাখে, অন্যদিকে ধর্মকে দূরে ঠেলে সরিয়ে রেখে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিজ দায়িত্ব নির্ধারণের মানবিক দায়।

জর্মন অধিকৃত পারী শহরে মঞ্চস্থ সার্ত্র-এর দ্বিতীয় নাটক 'নো এগজিট'-কে বুর্জোয়া সমালোচকেরা সার্ত্র-এর দর্শনতত্ত্বে ব্যক্তি ও 'অন্যদের' মধ্যে যে অবিরত

সংঘাত তারই দৃষ্টান্ত রূপে বিবেচনা করলেও সার্ত্র এর প্রথম পর্বের রচনায় ('দি ওয়াল,' 'দ রুম', 'ইনটিমেসি,' 'দ চাইল্ডহুড অফ এ লীডার' প্রভৃতি গল্পে) 'বুর্জোয়া অভিজাতদের চরিত্র উদ্ঘাটনের' যে লক্ষ্য ছিল, তারই দৃষ্টান্তরূপে এটিকে বিবেচনা করা যায়। এই নাটকের তিনজনই মৃত, নাটকের ঘটনাস্থল মৃতলোক। এরা প্রত্যেকে অন্যদের চোখে নিজেদের মিথ্যা মূর্তি তথা নিজেদের জীবনের মুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যায়. নিজেদের কাপুরুষতা, অমানুষিকতা গোপন করে নিজেদের গৌরবান্বিত না করতে পারুক, অন্তত অন্যদের সহানুভূতি বা করুণার পাত্র করে তুলতে চায়। কিন্তু পারে না, শেষ পর্যন্ত অন্যদের কাছ থেকে পালাতে চায়। তাদের নরক কক্ষের দরজাও খুলে যায়, কিন্তু তারা বেরিয়ে যেতে পারে না। অন্যদের চোখেই তাদের বাঁচতে হবে। দার্শনিক সার্ত্র মানবচরিত্র বা মানবসত্তার কোন পূর্বনির্ধারিত সারসংজ্ঞা স্বীকার করেন না। একজন ব্যক্তিমানুষ তার নিজের কর্মকাণ্ডের দ্বারা তার নিজের চরিত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করে, নির্ধারণ করে, প্রকাশ করে। যেহেতু এই নাটকের তিনজনই মৃত, তারা এই নাটকে প্রবেশের আগেই তাদের জীবনযাপনের ইতিহাসে তাদের চরিত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। ইনেজ গারস্যাঁকে বলে, 'তুমি তোমার ক্রিয়াকর্মের সমাহার ছাড়া আর কিছুই নও।' মৃত্যুতেই তাই এক অর্থে মানুষের অপরিবর্তনীয় সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি। প্রচলিত বিশ্বাসে মানুষের চরিত্র যেমন, তার আচরণও তেমনই। কিন্তু সার্ত্র এই বিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন অদৃষ্টবাদ মানেন না। ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক জীবন ব্যাখ্যায় একই কারণে তাঁর অনাস্থা। ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দুই স্তরে। সার্ত্র অবচেতনে বিশ্বাস করেন না ; মানুষের চেতনায় তাঁর অপ্রশ্ন বিশ্বাস। মানুষ যা-কিছু করে সচেতন ভাবেই করে, এবং সে যে সচেতন, তাও তার চেতনায় সর্বদাই স্পষ্ট। মানুষ সম্পূর্ণ সচেতন এই বিশ্বাস থেকেই সার্ত্র এতটা জোর দিতে পারেন মানুষের কর্ম ও আচরণে তার সম্পূর্ণ দায়িত্বের উপর। অন্য আরেক স্তরে শৈশবের আপতিক অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের অবচেতনে সংস্কারের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সংস্কারের নিয়ামক ক্ষমতায় মানবচরিত্রের গঠন কল্পনা করতে গিয়ে ফ্রয়েড যখন ব্যক্তির ভূমিকায় স্বদায়িত্বের ভূমিকা লাঘব করেন, সার্ত্র তা মানেন না। অন্যদের চোখে নিজেকে সাজাবার চেষ্টা বস্তুত দায়িত্ব থেকে পালাবার চেষ্টা। তাই 'নো একজিট' (প্রথম প্রকাশকালে সার্ত্র যার নাম দিয়েছিলেন 'দি আদার্স' বা 'অন্যেরা') এই প্রতারকদের আক্রমণে, তিক্ত ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে নগ্ন করে দেয়।

১৯৪৬ সালে 'জর্মনদের প্রাক্তন ফরাসি সহযোগীরা যখন আবার সমাজে দেখা দিতে শুরু করেছে, জনসাধারণের স্মৃতিকে আবার শানিয়ে তুলবেন বলেই' (সিমোন গু বোভোয়া-র সাক্ষ্য) সার্ত্র লেখেন 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ', যার বিষয়বস্তু নির্যাতন। আবার সেই বন্ধ ফাঁদ, প্রতিরোধ আন্দোলনের কয়েকজন সংগ্রামী বন্দী হয়ে নির্যাতিত হয়, এক ঘরে নির্যাতন চলে, তাদের নেতার অবস্থানের খবর জোর করে আদায় করবার জন্য ; অন্য ঘরে বাকিরা অপেক্ষা করে, তাদের প্রতিক্রিয়াই নাটকের মূল অবলম্বন। প্রথম অভিনয়ের স্মৃতি থেকে সিমোন গু বোভোয়া লেখেন, নির্যাতিতদের চিৎকার 'প্রায় অসহনীয়' লাগে ; দর্শকেরা অনেকে প্রতিবাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'এই উত্তেজনার কারণ স্পষ্ট। বুর্জোয়ারা তখন সকলকে আবার মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তখন এই অস্বস্তিকর স্মৃতি টেনে আনা তাদের রুচিকর লাগেনি।'

সময় ভরাট করার জন্যই স্বল্পায়ক 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ' নাটকের সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্য সার্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষাপটে 'দ রেসপেকট্‌ফুল প্রসটিটিউট' লেখেন। 'রেসপেক্‌ট্‌ফুল' ('রেসপেক্‌টেবল্‌' অনুবাদে এর ধার নষ্ট হয়) শব্দটির মধ্যে একটা ব্যঙ্গ আছে। একটি বেশ্যা এক অযৌক্তিক, নির্মম নিগ্রোহননের সাক্ষী। সে শুরুতে সেই সত্য বিকৃত করতে রাজী হয় না। কিন্তু পরে সমাজের মাননীয় নেতাদের আবেদনে প্রতিশ্রুতিতে সে আত্মসমর্পণ করে নিহত নিগ্রো যুবকটির সঙ্গী তার আশ্রয়প্রার্থী হলে কার্যত তাকে শ্বেতাঙ্গ খুনীর হাতে তুলে দিয়ে নিরাপত্তার সুখের আশ্বাস পায়। সাধারণ মানুষের প্রতিভূ এই বেশ্যাটির শুভবুদ্ধির প্রসারে এবং অস্ত্র হাতে পেয়েও নিগ্রো যুবকটির প্রতিরোধে বা প্রত্যাক্রমণে প্রসারগতা দেখে ফরাসি কমিউনিস্টরা সার্ত্র এর সমালোচনা করলে সার্ত্র জবাব দেন, 'তার কারণ এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের সমস্যার সমাধান অসম্ভব এবং সেই অসম্ভাব্যতাই আমার নাটকে প্রতিফলিত।' ১৯৬৪ সালে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মার্কিনি নিগ্রো সমাজের আন্দোলন এমন কোন পর্যায়ে পৌছয়নি যাতে তার মধ্যে শক্তি ও সার্থকতার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়। এই ঐতিহাসিক সত্য লঙ্ঘন করতে সার্ত্র রাজি ছিলেন না।

সার্ত্র-এর মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে সিমোন গু বোভোয়া বলেন : 'সে আশাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মানতে রাজি ছিল না।...সাফল্য-অসাফল্যের সম্ভাবনা হিসেব করে কর্মপন্থাকে ঠিক করার প্রশ্ন ওঠে না। কোন কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণই

আশার অঙ্গীকার। কোন গৌরবদীপ্ত সম্ভাব্য ভবিষ্যতের জয়গান না করে লেখক পৃথিবীকে দেখাবেন তার যথার্থ রূপে, এবং তারই মধ্য দিয়ে তাকে পাল্টাবার তাগিদ সৃষ্টি করবেন। তাঁর বিবরণ যতই বিশ্বাসযোগ্য হবে, ততই তিনি লক্ষ্যের দিকে এগোবেন। সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন রচনাও নৈরাশ্যবাদী নয়, যদি তাকে মুক্তির আহ্বানবাণী রূপে গ্রহণ করা যায়।' সঙ্গে সঙ্গেই সার্ত্র আবার মেনেছেন, 'ব্যাপকতম জনগণের স্তরে আশা রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের অন্যতম উপাদান; চূড়ান্ত বিজয়ের আশ্বাসে আস্থা না থাকলে তাদের পক্ষে সংগ্রামের ঝুঁকি নেওয়া বড় কষ্টকর হবে।' যেহেতু চলচ্চিত্র এই বৃহৎ জনসাধারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সামগ্রী, তাই 'দ্য রেসপেক্ট্ফুল প্রসটিটিউট নাটকের চিত্রভাষ্যে তিনি দেখান, বেশ্যা লিজি নিরপরাধ নিগ্রো যুবকটিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। সিমোন দ্য বোভোয়া বলেন: 'থিয়েটারে যাবার সুযোগ যে ভাগ্যবানদের আছে, তাদের যখন দেখানো যায় যে পৃথিবীতে আজও এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যা ভয়াবহ অথচ যার কোন নিরসনের সম্ভাবনা নেই, তখন তাদের বিচলিত করা যায়, ধাক্কা দেওয়া যায়।...কিন্তু চলচ্চিত্র দেখানো হয় এমন লক্ষ লক্ষ মানুষকে যাদের নিজেদের জীবনই প্রতিকারহীন ভয়াবহ পরিস্থিতি। যে কোন পরাজয়ে তারাও পরাজিত হয়। তাদের নৈরাশ্যকে বাড়িয়ে তোলা বিশ্বাসঘাতকতা। সার্ত্র নিজে লেখেন, 'কমিউনিস্টরাও ঠিক। আমিও ভুল করিনি। যে মানুষ শ্রান্ত, দমিত, তার কাছে আশা সর্বদাই প্রয়োজনীয়। তারা নৈরাশ্যেরই সম্মুখীন হয় বারবার। কিন্তু কোন মোহ ছাড়াই কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সম্ভাবনাও বহাল রাখতে হবে।'

এই দুটি নাটকেই, প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রতিরোধীরা প্রলোভন ও অত্যাচারের চাপেও নিজেদের বিশ্বাসের মর্যাদা যেভাবে রেখেছিলেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই), তার অভিজ্ঞতাই ভিত্তিস্বরূপ। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্স্-এর মুক্তির এক বেতার ভাষণে সার্ত্র বলেন, 'আমরা জর্মনদের অধীনে যতটা স্বাধীন ছিলাম, তত আর কখনও ছিলাম না। আমরা আমাদের সব 'অধিকার হারিয়েছিলাম।... এবং সেই কারণেই আমরা ছিলাম স্বাধীন। যেহেতু নাৎসি বিষ তখন আমাদের চিন্তার মধ্যেও চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করেছে, প্রত্যেক নির্ভুল সিদ্ধান্তই তখন এক একটি জয়। যেহেতু এক সর্বশক্তিমান পুলিশবাহিনী তখন আমাদের জোর করে নীরব রাখতে সচেষ্ট, প্রত্যেকটি শব্দই তখন হয়ে ওঠে একটি নীতির ঘোষণার মত মহামূল্যবান। যেহেতু তখন ওরা আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গসঞ্চালনও অঙ্গীকারের ভার লাভ

করে।… আমরা প্রত্যেকে…তখন নিজেদের জিজ্ঞাসা করি : আমাদের উপর ওরা যখন নির্যাতন করবে আমরা স্থির থাকতে পারব তো? এই ভাবে উঠত স্বাধীনতার মূল প্রশ্ন, মানুষ নিজের সম্পর্কে গভীরতম যে জ্ঞান লাভ করতে পারে, আমরা তারই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলাম।'

পরের নাটক 'ডারটি হ্যাণ্ড' বা 'ক্রীম পাসিওনেল' কমিউনিষ্ট বিরোধীরা সাগ্রহে লুফে নিলে সার্ত্র বিবৃতি দিয়ে এই নাটকের মঞ্চায়নে বাধা দিয়ে তাঁর বিরক্তি ও অস্বস্তি প্রকাশ করেন। এই নাটকে সার্ত্র কমিউনিষ্ট সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিরোধ এবং কমিউনিষ্ট নীতিবোধ সম্পর্কে এক জটিল বিচারে ব্যাপৃত। পার্টির মধ্যে বুদ্ধিজীবীর কঠিন ভূমিকা সন্ধানে ব্যক্তিগত জীবনের অকর্মণ্যতার গ্লানি স্খালনের চেষ্টা, নীতির প্রশ্নে পার্টির মধ্যে হত্যা, পরে আবার নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিহত নেতার পুনর্বাসনের প্রয়াস, পার্টি নেতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি অনেকগুলি সমস্যা সার্ত্র নাটকীয়ভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। থিয়েটারি বিচারে বিন্যাস কল্পনায় অসামান্য সার্থক এই নাটকটি বোধ হয় থিয়েটারি গুণের কারণেই কোন স্থিরনিশ্চিত ব্যাখ্যার সুযোগ দেয় না এর জটিলতা থিয়েটারি উত্তেজনায় প্রাণময় নির্দেশকের ব্যাখ্যার ও বিশ্লেষণের সুযোগেও অ্যাডভেঞ্চারস্বরূপ। আবার ট্রটস্কি হত্যার ঘটনার ছায়া, কমিউনিষ্ট রাজনীতি সম্পর্কে চলিত বুর্জোয়া সমালোচনার সঙ্গে আপাতসাদৃশ্যের কারণে এই নাটকটি কমিউনিষ্টদের কাছে অস্বস্তিকর থেকে গেছে। 'নেক্রাসভ' নাটকে বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত বিরোধী প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শঠতার ব্যঙ্গাত্মক উন্মোচনে সার্ত্র বামপন্থী শিবিরে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নেন, 'লুসিফার আণ্ড দ লর্ড' নাটকে শ্রেণীসংগ্রাম অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র দয়াধর্ম বা খৃষ্টীয় পুণ্যধর্মের সাহায্যে দারিদ্র্য ও শোষণের অপনোদনের ব্যর্থতা প্রমাণ করেন, 'দ কনডেমড্ অফ আলটোনা'য় নাৎসি অতীতের দায় স্বীকারে বাধ্য করেন সেই তরুণ যুদ্ধাপরাধীদের যারা যুদ্ধোত্তর সমাজে ভালো মানুষ সেজে মিলে যাবার চেষ্টা করছিল পঞ্চাশের দশকে। এই শেষ নাটকের পর সার্ত্র সরে গেছলেন উপন্যাস নাটক রচনার সাহিত্যিক প্রয়াস থেকে, দেশের বামপন্থী আন্দোলনে এবং আন্তর্জাতিক মানবিকবাদী আন্দোলনে অহরহ যোগদানেই ব্যস্ত থাকতেন বেশি। ব্যক্তির সামাজিক ও ঐতিহাসিক আত্মঘোষণা তথা অঙ্গীকারের যে দায় তাঁর যাবতীয় সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রস্থ ছিল, তা-ই তাঁর প্রতিদিনের জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল শেষে।

লেখা কি ? / জঁ পোল সার্ত্র

লেখক লিখতে বসলেন ; তার মানেই তিনি পাঠকদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। পাঠক বই খুলে ধরলেন ; তার মানেই তিনি লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, শিল্পকর্ম মাত্রেই মানবসমাজের স্বাধীনতায় আস্থা ঘোষণা। লেখকের মতোই পাঠকেরাও এই স্বাধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মপ্রকাশ প্রত্যাশা করেন। তাই শিল্পকর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে মানবমুক্তি দাবি করে বলেই তা বিশ্বলোকের কাল্পনিক উপস্থাপনা। ফলত 'বিষাদাচ্ছন্ন সাহিত্য' বলে কিছু নেই, কেননা, যত কালো রঙেই কোনো লেখক পৃথিবীকে আঁকুন না কেন ; তাঁর রঙ লাগাবার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে স্বাধীন মানুষ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে তাদের স্বাধীনতা অনুভব করতে পারে।

উপন্যাস ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। খারাপ উপন্যাস চাটুবাক্যে খুশি করতে চায়। ভালো উপন্যাস জন্মায় প্রচণ্ড তাগিদে, বিশ্বাসের তাড়নায়। কিন্তু সর্বোপরি যে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো লেখক পৃথিবীকে সেইসব স্বাধীনতার দিকে তুলে ধরেন যা তিনি বাস্তবে সত্য করে তুলতে চান, তার ভিত্তি, এমন এক পৃথিবীতে বিশ্বাস যা ক্রমাগতই আরো স্বাধীনতাকে জাবিত করে। উদারতার এই যে মুক্তি লেখক ছড়িয়ে দেন, তা কখনোই কোনো অন্যায়কে স্বীকার করে নেওয়ার যুক্তিতে প্রযুক্ত হতে পারে না। যে রচনা মানুষের হাতে মানুষের পরাধীনতাকে সমর্থন করে, স্বীকার করে নেয়, কিংবা নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে, সেই রচনা পড়তে পড়তে পাঠক তাঁর স্বাধীনতাবোধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবেন, এ হতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে পরিব্যপ্ত ঘৃণায় পরিপূর্ণ হলেও কোনো মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গের লেখা উপন্যাস ভাল হতে পারে, কারণ সেই ঘৃণার মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর জাতির স্বাধীনতা দাবি করেছেন। যেহেতু তিনি আমার মধ্যে উদারতার দৃষ্টিভঙ্গিই সঞ্চারিত করছেন, যে মুহূর্তে আমি নিজে সেই শুদ্ধ স্বাধীনতার উপলব্ধি বোধ করি, আমি আর কোনো অত্যাচারী শ্রেণীর সগোত্র থাকতে পারি না। তাই সর্বপ্রকারের স্বাধীনতার কাছে আমার দাবি শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মুক্তির দাবি উচ্চারিত হোক, আমিও যেহেতু সেই শ্বেতাঙ্গকুলের অংশ, আমার বিরুদ্ধেও তা ধ্বনিত হোক। এক মুহূর্তের জন্যও

কেউ ভাববেন না যে, ইহুদি বিদ্বেষের সমর্থনে কোনো ভালো উপন্যাস লেখা সম্ভব। অনুভব করি যে আমার স্বাধীনতা অন্য সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত, সেই মুহূর্তেই আমি জানি যে জনসমষ্টির একাংশের দাসত্বের সমর্থনে আমার স্বাধীনতাকে আমি কাজে লাগাতে পারি না। প্রাবন্ধিক, পুস্তিকাকার ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক, ব্যক্তিগত আবেগের ধারক বা সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবাদী, প্রত্যেক লেখকই মানুষের মুখোমুখি স্বাধীন মানুষ। তাঁর বিষয় কেবল একটাই হতে পারে—স্বাধীনতা। তাই পাঠকদের দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধবার যে-কোন চেষ্টাই লেখকের শিল্পেই চিড ধরাবে। কোনো লোহার কারিগর তাঁর ব্যক্তি-জীবনে ফ্যাসিবাদের আক্রমণের শিকার হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর কারিগরিতেও তার প্রভাব পড়বে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু লেখক বিপর্যস্ত হবেন উভয় ক্ষেত্রেই, জীবনের চেয়েও বেশি আঘাত পাবেন তাঁর লেখার ক্ষেত্রে। আমি এমন লেখকদের দেখেছি, যাঁরা যুদ্ধের আগে মনে প্রাণে ফ্যাসিবাদকেই চেয়েছেন, অথচ নাৎসিরা যখন তাদের উপর সম্মান ঢেলে দিয়েছেন, তখন তাঁরা বন্ধ্যাতায় নিমজ্জিত হয়েছেন। আমি বিশেষ করে দ্রিউ লা রোশেলের কথা ভাবছি। তিনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু তার নিষ্ঠায় ফাঁকি ছিল না। তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন। নাৎসিদের উদ্যোগে প্রকাশিত এক পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম কয়েক মাস তিনি তাঁর দেশবাসীকে তিরস্কার করেছেন, নিন্দা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। কেউ তাঁর লেখার জবাব দেয় নি, কারণ জবাব দেবার স্বাধীনতা তখন কারোর ছিল না। তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন; তিনি আর তাঁর পাঠকদের অনুভব করতে পারেন না। তিনি আরো জোর দিয়ে লিখতে লাগলেন। কিন্তু কেউ যে তাঁকে এতটুকু বুঝেছে তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই। ঘৃণা বা রাগের কোন চিহ্ন নেই; কিছু নেই। তাঁর মনে হল, তিনি আর কোনো কিছু ধরতে পারছেন না। তাঁর ক্ষোভ বেড়ে উঠছে। তিনি জার্মানদের কাছে তিক্ত অনুযোগ জানালেন। তাঁর আগের প্রবন্ধগুলি চমৎকার হয়েছিল; এবারে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। একটা সময় এল যখন বুক চাপড়ে চিৎকার করতে লাগলেন; কোথাও কোনো প্রতিধ্বনি উঠল না। সাড়া এল কেবল সেই কেনা সাংবাদিকদের দঙ্গল থেকে, যাদের তিনি ঘৃণা করেন। তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন, সেই পত্র প্রত্যাহার করলেন, আবার লিখলেন, আবার সেই মরুভূমিতে। শেষে তিনি নীরব হয়ে গেলেন, অন্যদের নীরবতা তাঁর গলা চেপে ধরল। তিনি অন্যদের দাসত্বে টেনে নামাতে চেয়েছিলেন, পাগলের

মতো ভেবেছিলেন এটা তাঁর স্বাধীন চিন্তা, ভেবেছিলেন তাঁর নিজের মন বুঝি তখ-ও স্বাধীন। দাসত্ব এল। তাঁর ভিতরের মানুষটা তাঁকে পিঠ চাপড়াল। কিন্তু তাঁর ভিতরের যে লেখক সে সইতে পারল না। এই টানাপোড়েন যখন চলছে, তখন অন্যরা, যারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, তারা বুঝেছে, নাগরিকের স্বাধীনতা না থাকলে লেখার স্বাধীনতা থাকবে কি করে? কেউ তো আর ক্রীতদাসের জন্য লেখে না। গদ্যের শিল্প সেই এক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে, ঐ এক শাসন ব্যবস্থাতেই গদ্যের যা কিছু তাৎপর্য, যার নাম গণতন্ত্র। একের উপর আঘাত এলে অন্যও আহত হয়। শুধু কলমের জোরেই এদের রক্ষা করার চেষ্টা করলে চলবে না। এক একটা সময় আসে যখন কলমকে জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, তখন লেখককে অস্ত্র তুলে নিতে হয়। তখন যে পথেই আপনি এসে পৌঁছান না কেন, যে মতামতই আপনি ধারণ করে থাকুন না কেন, সাহিত্য আপনাকে লড়াইয়ের মাঝখানে এনে ফেলবে। লেখা বলতে একভাবে স্বাধীনতা চাওয়া। একবার শুরু করলেই, চান বা না চান, আপনি জড়িয়ে পড়েছেন।

কিসে জড়িয়ে পড়েছেন? স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায়। কথাটা বলা সহজ। বেন্দার বুদ্ধিজীবীর মতো বিশ্বাসঘাতকতার আগে আদর্শ মূল্যবোধের রক্ষাকর্তার ভূমিকায়, না কি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে পক্ষ বেছে নিয়ে প্রতিদিনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা? এই প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে আরেকটি প্রশ্নের সঙ্গে, সেই আপাত সহজ প্রশ্ন, যে প্রশ্ন কেউ কখনও নিজেকে করে না: 'কার জন্য লিখি?'

['সাহিত্য কি' গ্রন্থের নির্বাচিত অধ্যায়। প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়'/ অনুঃ অভিজ্ঞ ভট্টাচার্য।]

সাহিত্য কি গ্রন্থের ভূমিকা

'যদি আপনি নিজেকে যুক্ত করতে চান', জনৈক তরুণ নির্বোধ লিখেছেন, 'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন তবে? কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিন। একজন বড় লেখক যিনি মাঝে মধ্যেই দায়িত্ব নিয়েছেন ও আরও অনেকবার দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু ভুলে গেছেন সে সব, আমাকে বলেছিলেন, 'নিকৃষ্টতম শিল্পীরাই সবচেয়ে কর্তব্যপরায়ণ। সোভিয়েত শিল্পীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন।' জনৈক প্রবীণ সমালোচকের শান্ত অনুযোগ, 'আপনি সাহিত্যকে খতম করতে চান। আপনার সমস্ত আলোচনার মধ্যে উদ্ধত ভাবে ছড়িয়ে থাকে রম্যরচনার প্রতি অবজ্ঞা—একজন ক্ষুদ্রমনা আমাকে আকাট বলেন, যা কিনা তার পক্ষে স্পষ্টতই চূড়ান্ত অপমান। কোন এক লেখক যিনি কোন ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়েছেন যুদ্ধ যার নাম বুদ্ধদের ধূসর স্মৃতির সম্বল আমার বিরুদ্ধে অমরতা প্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন না হওয়ার অভিযোগ এনেছেন, তিনি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কত যে লোককে চেনেন যাদের প্রধান আশা এটাই। অন্য এক মার্কিনী ভাড়াটে সাংবাদিকের চোখে আমার সমস্যা হল যে আমি বের্গসঁ ও ফ্রয়েড় ঝাড়িনি, ফ্লবেয়ারের কথা যদি ওঠে, যিনি নিজেকে যুক্ত করেন নি, মনে হয় তিনি আমাকে মনস্তাপের মতো তাড়না করেন। চালিয়াতরা চোখ পিটপিট করে, 'আর কবিতা? আর ছবি? আর গান? আপনি দায়িত্বশীল হতে বলেন, এদেরও? এবং কিছু সামরিক মানসিকতা থেকে দাবী করা হয়, 'এসব কি নিয়ে? যুক্ত সাহিত্য? ভালো, এতো সেই পুরোনো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, যদি লোকায়ত কিছুর পুনরুদ্ধার না হয়। শুধু আরও আক্রমণাত্মক।'

কি মূর্খতা! এরা তাড়াতাড়ি পড়ে, বাজে ভাবে পড়ে ও বোঝবার আগেই রায় দিয়ে দেয়। সুতরাং আমি বরং গোড়া থেকেই শুরু করি। এটা কাউকেই খুশী করবে না, না আপনাকে, না আমাকে। কিন্তু আমাদের তীরবিদ্ধ করতে হবে পাখীর চোখটাই। এবং যেহেতু সাহিত্যের নামেই সমালোচকরা আমায় দণ্ডিত করেছেন, এটা বলতে তারা কি বোঝেন না ব্যাখ্যা করেই, তাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ উত্তর হবে সংস্কারহীন ভাবে লিখন শিল্পকে পরীক্ষা করা। লেখা কি? কেন লেখা? কার জন্য? ঘটনা হচ্ছে, মনে হয়, কেউই কাউকে এ-জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন করেন নি।

[রচনাকাল—১৯৪৭। অনু: সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
প্রথম প্রকাশ/বিজ্ঞাপন/চতুর্থ সংকলন/নভেম্বর '৭৬।]

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের বক্তৃতা

……পুরস্কার অস্বীকার করার যুক্তিটা ব্যক্তিগত এবং বস্তুগত দুইই।

"এই সমস্ত আমার ব্যক্তিগত যুক্তি। আমার প্রত্যাখ্যান করাটা কোনো হঠাৎ সিদ্ধান্ত নয়। চিরকালই আমি দপ্তরী সম্মান প্রত্যাখান করেছি। যুদ্ধের পর ১৯৪৫-এ আমায় 'সম্মানের পাত্র' (Legion of Honour) বানাবার প্রস্তাব ওঠে। আমি ফেলে দিয়েছিলাম, যদিও সরকারে আমার বন্ধু-বান্ধব ছিল। একই ভাবে আমি কলেজ দ্য ফ্রান্সে প্রবেশ করতে চাই নি যা আমার বন্ধুরা স্থির করেছিল। এই ভঙ্গি লেখক হিসেবে আমার ভূমিকার ধারণার ওপর নির্ভরশীল। একজন লেখক যিনি রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাহিত্যগত দিকের পক্ষ নিয়েছেন (তাঁরা) শুধুমাত্র সেই সমস্ত অর্থের প্রতিই বিশ্বাস রাখতে পারেন—তাঁর লিখিত শব্দ। যে কোন সম্মানই তিনি গ্রহণ করুণ না কেন, তা তাঁর পাঠকদের চাপ সৃষ্টি করতে উন্মুক্ত হয়ে পড়বেই যা আমার পছন্দ নয়। 'জাঁ-পোল সাত্র্' সাক্ষরটা এক জিনিস, 'জাঁ-পোল সাত্র্' নোবেল পুরস্কার জয়ী, সাক্ষরটা অন্য কিছু।

"সুতরাং লেখক নিজেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে দেবে না, এমন কি যে কোনো সম্মানীয় পরিবেষ্টনীর মধ্যেও, যেমন বর্তমান অবস্থায় ·····

"এ'সবই পুরস্কার প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে আমার বস্তুগত যুক্তি। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ক্ষেত্রে একমাত্র দুই সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই সম্ভব, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য। তার অর্থ এই নয় যে পুর্ণমিলন চলেছে। আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি যে সেই সম্মুখীন হওয়া নিঃশ্চয়ই এক বিবাদের রূপ নেবে, কিন্তু তা শুধুমাত্র মানুষ এবং সংস্কৃতির মধ্যে হবে, কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া।

"সে কারণেই কোনো সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সম্মানের পুরস্কার আমি গ্রহণ করতে পারি না, তা প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যের, এমন কি ওদের অস্তিত্বে বিবেচনায় আমি প্রশংসা করি। যদিও আমার গোটা সহানুভূতিটাই সমাজতন্ত্রবাদী, তবু আমি গ্রহণ করতে অপারক, উদাহরণস্বরূপ, লেনিন পুরস্কার, যদি আমায় দিতে চাওয়া হয়, যা ঘটে নি।

"……বর্তমান পরিস্থিতিতে নোবেল পুরস্কার এমন এক সম্মান যা পাশ্চাত্যের লেখকদের এবং প্রাচ্যের বিদ্রোহীদের সংযত করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, নেরুদাকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি, মহান দক্ষিণ আমেরিকান কবিদের একজন। লুই অঁরাগকে সিরিয়াসলি কোন দিনই বিচার করা হয় নি, কিন্তু তাঁর যোগ্যতা

ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা শলোকভের আগে প্যাস্টিরনেককে দেওয়া হল, কেননা তা একমাত্র সোভিয়েত কর্ম যা তাঁর নিজের দেশে প্রকাশিত হয়েছিল এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোন সাম্ত্বনার ভঙ্গিমায় এর ভাবসাম্য রক্ষা করা উচিত ছিল। অলজিরিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন, যখন আমরা 'ডিক্লিয়ারেশন অব দি ১২১' সাক্ষর করি, তখন হয়তো ধন্য হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতাম, কেননা তা শুধু আমাকে নয়, যে স্বাধীনতার জন্যে আমরা লড়াই করছিলাম তাকেও সম্মানিত করতো। কিন্তু তা ঘটে নি, এবং বর্তমানে সংগ্রামের অন্তে পুরস্কারটা আমার মস্তকে স্থাপন করা হল।

"সুইডিশ এ্যাকাডেমির উল্লেখ করে, স্বাধীনতা কথা কয়ে ওঠে। এটা এমন একটা শব্দ যা অসংখ্য ব্যাখানের মাধ্যমে নিজেকে ধার দেয়। পাশ্চাত্যে এর মানে করা হচ্ছে এ্যাবষ্ট্রাক্ট (পৃথক) স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ আরও বাস্তব স্বাধীনতা—এক জোড়ার চেয়ে বেশী জুতো থাকার এবং খিদে পেলে খাওয়ার অধিকার। সেখানেই পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকে গ্রহণের চেয়ে কম বিবাদ-জনক মনে হয়েছে আমার। গ্রহণ করলে, আমার বর্ণনা মতো নিজেকে ধার দেওয়া হবে।

"আমি 'Figaro Litteraire'তে পড়ি যে আমার বিতর্কিত রাজনৈতিক অতীত আমার বিরুদ্ধে আমায় খুব বেশী ধরে রাখতে পারবে না। আমি উপলব্ধি করি যে এ' এ্যাকাডেমির মতামত প্রসূত রচনা হতে পারে না, কিন্তু এগুলো পরিষ্কার সেই সমস্ত ব্যাখ্যাকে নির্দেশ করে যা আমার (পুরস্কার) গ্রহণে কিছু দক্ষিণপন্থী চক্রে হতে পারতো। আমার বিতর্কিত রাজনৈতিক অতীতকে আমি বর্তমানেও যুক্তিযুক্ত বলে সম্মান করি, এমন কি আমার পূর্বকৃত ত্রুটিগুলো আমার কমরেডদের কাছে মেনে নিতে রাজী আছি, যা আমি করেছি।

"আমি এমন ইংগিত করছি না যে নোবেল পুরস্কার 'বুর্জোয়া পুরস্কার', কিন্তু ওতে বুর্জোয়া ব্যাখান আছে যা নিঃসন্দেহে আমার অতি পরিচিত দক্ষিণপন্থী চক্র প্রস্তাবিত।

[১৯৬৪তে পুরস্কার ঘোষণার পরদিন সার্ত্র সুইডিস প্রেস প্রতিনিধির কাছে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সংকলিতরূপ। অনু : অপূর্বনারায়ণ রায়।]

জঁ-পল সার্ত্র্ ও তাঁর সমকাল

সার্ত্র্-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জী

ও

সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

পুষ্কর দাশগুপ্ত

সাত্র্‌-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জী

১৯০৫

২১-এ জুন, প্যারিসে জন্ম।

আলবের সোয়েৎজের সম্পর্কে সাত্র্‌-এর মামা।

সাত্র্‌ এল্যুয়ার-এর থেকে ১০, আরাগোঁ-র থেকে ৮, অঁদ্রে মাল্‌রো-র থেকে ৪ বছরের ছোট; বেকেট-এর থেকে ১, সিমন দ্য বোভোয়ার-এর থেকে ৩, জঁ জনে-র থেকে ৫, কাম্যু-র থেকে ৮ বছরের বড়।

জীবনানন্দ ও তারাশংকর-এর থেকে ৭, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীর থেকে ৪, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অন্নদাশংকর রায় এর থেকে ১ বছরের ছোট; বুদ্ধদেব বসু-র থেকে ৩, বিষ্ণু দে ও অরুণ মিত্র-এর থেকে ৪ বছরের বড়।

১৯০৬

পিতা জঁ-বাতিস্ত সাত্র্‌-এর মৃত্যু।

১৯০৬—১৯১৬

দাদামশায়, দিদিমা ও মার সঙ্গে সাত্র্‌ এর শৈশব কাটে। ১৯১১ পর্যন্ত তাঁরা থাকতেন প্যারিসের শহরতলিতে, ১৯১১ থেকে প্যারিসে।

১৯১৫—১৯১৬

প্যারিসে লিসে অঁরি কাৎর্‌ বিদ্যালয়ে নিয়মমাফিক শিক্ষার সুরু

১৯০৫

ফ্রান্সে রাষ্ট্র এবং চার্চ-এর পৃথকীকরণ। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বিদ্রোহ ও প্রথম সোভিয়েৎ গঠন।

ফোভিস্‌ম-এর সুরু।

বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সুরু। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট-এর প্রতিষ্ঠা।

ক্লোদেল : প্রাচ্যের পরিচয় (ক, ২য় সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ : আত্মশক্তি (প্র)।

১৯০৬

আলফ্রেদ্‌ দ্রেইফ্যুস-এর পুনর্বহাল ; রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট। রবীন্দ্রনাথ : নৌকাডুবি (উ); আলফ্রেদ জারি-র মৃত্যু, ইবসেন-এর মৃত্যু।

১৯০৬-১৯১৬

১৯০৭ : বের্গসন : সৃজনশীল বিবর্তন (দ); কিপলিঙ-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা। অরবিন্দের গ্রেপ্তার। ব্রাক ও পিকাসো-র ক্যুবিক চিত্রকলার সুরু।

১৯০৯ : নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ-এর প্রতিষ্ঠা। ফরাসি পত্রিকা ল ফিগারো-তে ইতালিয়ান কবি মারিনেত্তি-র ফিউচারিস্ট ঘোষণাপত্র প্রকাশ।

১৯১১ : সুন ইয়াৎ সেন-এর নেতৃত্বে চীনে বিপ্লবের সুরু। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ। মেতেরল্যাঁক-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯১২ : রাশিয়ায় মায়াকভস্কি কর্তৃক ফিউচারিস্ট ঘোষণা পত্র 'জনরুচির মুখে থাপ্পড়'-এর প্রকাশ। বঙ্গভঙ্গ রদ ; কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর।

১৯১৩ : রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। 'সবুজ পত্র'-এর প্রকাশ। প্যারিসে ভারতীয় শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী।

আপলিনের : সুরাসার (ক); প্রুস্ত : সোয়ান-এর বাড়ির ধারে (উ)।

১৯১৪ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুরু।

১৯১৫ : রোম্যাঁ রোলাঁ-র নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯১৬ : আয়ারল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ। ভের্দাঁ-র যুদ্ধের পর ইয়োরোপ জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিস্তার। জ্যুরিখে ত্রিস্তঁ জারা-র নেতৃত্বে 'দাদা'র প্রতিষ্ঠা।

আপলিনের : নিহত কবি ; অঁরি বারব্যুস : আগুন (গ)।

রবীন্দ্রনাথ : বলাকা (ক), ঘরে বাইরে (উ), ফাল্গুনী (উ)। প্রমথ চৌধুরী : চার ইয়ারী কথা (গ); জয়স : তরুণ শিল্পীর আলেখ্য (উ); ফ্রয়েড : মনো-বিশ্লেষণের ভূমিকা (বি)।

১৯১৭

ইঞ্জিনিয়ার জোজেফ ন'সি-র সঙ্গে মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ। বাইরে কোন পরিবর্তন দেখা না গেলেও এই বিবাহ বালক সার্ত্র-কে মানসিকভাবে খুবই বিচলিত করেছিল।

লা রশেল-এ মা ও সৎ পিতার কাছে। সেখানকার বিদ্যালয়ে ভর্তি। ১৯১৭—১৯১৯ : লা রশেল এ।

১৯২০-তে প্যারিসে ফিরে ১৯২১ এবং ১৯২২-এ যথাক্রমে বাকালোরেয়া (স্নাতক) প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে উত্তীর্ণ।

১৯২৩

'রভ্যু সঁ তিৎর্' পত্রিকায় প্রথম গল্প এবং জাক গিল্ম্যা ছদ্মনামে প্রথম উপন্যাসের চার কিস্তি প্রকাশ।

বিখ্যাত লুই ল গ্রঁ লিসেতে লেকোল নর্মাল স্যুপেরিয়র-এ ভর্তির প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি-পর্বের ছাত্র (১৯২২—১৯২৪)।

১৯২৪

মেধাবী ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ শিক্ষায়তন 'লেকোল নর্মাল স্যুপেরিয়র'-এ প্রবেশ। ১৯২৪—১৯২৯।

১৯২৮

অধ্যাপনা-বৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 'আগ্রেসাসিয়োঁ'-তে সকলকে অবাক করে অকৃতকার্য হলেন।

ছুটিতে এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুর সম্পর্কিত এক বোনের সঙ্গে পরিচিত হন—সৎ বাবা ও মার কাছে অনুমতি নিয়ে সার্ত্র্ বাক্দান করেন। মুদির মেয়েকে বিয়ে করতে চান শুনে দাদামশায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ বিয়ে অবশ্য হয় নি।

১৯২৯

সিমন দ বোভোয়ার এর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। দর্শনে 'আগ্রেগাসিয়োঁ' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার, সিমন দ বোভোয়ার দ্বিতীয়। 'লে নুভেল লিতেরের' (সাহিত্য-সংবাদ) পত্রিকায় 'আজকের ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধান'-এর উত্তরে সার্ত্র্-এর লেখা 'আমরা আরো অভাগা, তবে আরো সহানুভূতিশীল' রচনাটি প্রকাশিত হয়।

১৯২৯ থেকে ১৯৩১ বাধ্যতামূলক সামরিক কর্ম (মিলিটারি সার্ভিস)।

সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৯১৭

রুশবিপ্লব ও বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা।

ভালেরি: তরুণী নিয়তি (ক)। এলিয়ট: প্রুফ্রক (ক)। শরৎচন্দ্র: শ্রীকান্ত (১ম পর্ব, উ); প্রমথ চৌধুরী: বীরবলের হালখাতা (প্র)। ১৯১৮: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

১৯২২

ইতালিতে মুসোলিনির ক্ষমতা দখল।

ভালেরি: শার্ম (ক); জয়স: য়ুলিসিস (উ; প্যারিসে প্রকাশিত); এলিয়ট: পোড়ো জমি (ক); নজরুল: অগ্নিবীণা। কলকাতায় ক্লে, কান্দিন্স্কির চিত্র-প্রদর্শনী। প্রুস্তের মৃত্যু।

১৯২৩

লেনিন-এর পর স্তালিন-এর রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথ: যোগাযোগ (উ); বিভূতিভূষণ: পথের পাঁচালী (উ); রিল্‌কে: ডুইনো এলেজি, (ক) অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছ (ক)। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ। ইয়েট্‌স্‌-এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯২৪

ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডে প্রথম স্বল্পস্থায়ী শ্রমিক সরকার।

পের্স: অভিযান (ক); রোলাঁ: গান্ধী (জী); রবীন্দ্রনাথ: রক্তকরবী (না)। ব্রতোঁ: স্যুররেআলিস্ত ঘোষণাপত্র, 'স্যুররেআলিস্ত বিপ্লব' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। কাফ্‌কার মৃত্যু। লেনিন-এর মৃত্যু।

১৯২৮

ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকারের বিরুদ্ধে ইয়েন-বে-র বিদ্রোহ।

ব্রতোঁ: নাদজা (উ)। লরেন্স: লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক (উ)। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত: বেদে (উ); শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়: নারীমেধ (উ)।

১৯২৯

ভারতে মীরাট ষড়যন্ত্রে ৩১ জন কম্যুনিষ্ট গ্রেপ্তার। ট্রট্স্কি রাশিয়া থেকে বিতাড়িত। আমেরিকায় অর্থনৈতিক সংকটের সুরু। সবাক চলচ্চিত্রের সুর ক্লোদেল: মখমলের জুতো (না); এল্যুয়ার: ভালোবাসা কবিতা (ক); রোলাঁ: রামকৃষ্ণ (জী)। রবীন্দ্রনাথ: মহুয়া (ক); তপতী (না), শেষের কবিতা (উ); জগদীশ গুপ্ত: অসাধু সিদ্ধার্থ (উ)। টমাস মান-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।

সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৯৩১

স্পেনে প্রজাতন্ত্র। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সৃষ্টি। ১৯৩০ থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা।

রবীন্দ্রনাথ : রাশিয়ার চিঠি (প্র); শরৎচন্দ্র : শেষ প্রশ্ন (উ); প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রথমা (ক); অন্নদাশংকর রায় : পথে প্রবাসে (ভ্র)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ।

১৯৩৩

জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা লাভ।

মালরো : মানুষের জীবন (লা কঁদিসিয়োঁ য়ুমেন, উ)। রবীন্দ্রনাথ : মানুষের ধর্ম (প্র); প্রেমেন্দ্র মিত্র : মিছিল (উ); বুদ্ধদেব বসু : পৃথিবীর প্রতি (ক) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : অন্তঃশীলা (উ)। বুনিন-এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৩৪

ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ট ও শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা। ফ্রান্স থেকে দ্বিতীয়বার লেওঁ ট্রট্স্কি-কে বহিষ্কার।

১৯৩৬

ফ্রান্সের সাধারণ নির্বাচনে গণফ্রন্টের জয়। শ্রমিকদের সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের সীমা ও সবেতন ছুটির অধিকার।

স্পেনে গৃহযুদ্ধ ('৩৬—'৩৮) সুরু। কবি লোর্কা ফ্রাংকোপন্থীদের হাতে নিহত।

এল্যুয়ার : উর্বর চোখ (ক) বের্নানোস : এক গ্রাম্য পাদ্রীর ডাইরী (উ)। জীবনানন্দ : ধূসর পাণ্ডুলিপি (ক); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : পুতুল নাচের ইতিকথা (উ); পদ্মানদীর মাঝি (উ)।

লণ্ডনে আন্তর্জাতিক স্যুররেয়ালিস্ত প্রদর্শনী।

ইউজিন ওনীল এবং নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৩৭

চীন-জাপান যুদ্ধ, বৃটিশ ভারতে প্রথম নির্বাচন। মাল্‌রো : আশা (উ); রবীন্দ্রনাথ : কালান্তর : (প্র); বুদ্ধদেব বসু : কঙ্কাবতী (ক); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ক্রন্দসী (ক); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগৈতিহাসিক (গ); রজে মার্ত্যা দ্যু গার-এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৩১

বন্দর-নগরীর আভ্‌র্‌-এ দর্শনে অধ্যাপনার পদ লাভ।

'বিফ্যুর' পত্রিকায় 'লেজ্‌ঁদ দ লা ভেরিতে' ('সত্যের কাহিনী' প্রবন্ধ) অংশত প্রকাশিত হয়।

গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমন দ বোভোয়ার-এর সঙ্গে স্পেনে যান।

'লা নোজে' (বিবমিষা) উপন্যাস লিখতে সুরু করেন।

১৯৩

বার্লিনে ফরাসি ইনষ্টিট্যুটে কাজ করার জন্য বৃত্তিলাভ। হুসের্ল, কাফকা; ফকনার ও হেমিংওয়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন।

দার্শনিক প্রবন্ধ 'লা ত্রঁসঁদঁস্‌ দ লেগো' (অহং-এর তুরীয় অবস্থা) এবং 'মেলঁকোলিয়া' (বিষাদ) শিরোনামে 'লা নোজে' (বিবমিষা) উপন্যাসটি দ্বিতীয় বার রচনা।

জার্মানীতে একটি ফরাসী মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। জার্মানীতে অবস্থান ১৯৩৩—৩৪।

১৯৩৪

বছরের শেষের দিকে ল আভ্‌র্‌-এ প্রত্যাবর্তন। দার্শনিক প্রবন্ধ 'লিমাজিনের' (কাল্পনিক)-এর রচনা।

সিমন দ বোভোয়ার-এর প্রাক্তন ছাত্রী ওল্‌গার সঙ্গে পরিচয়।

১৯৩৬

এন. এর. এফ (গালিমার) 'লা নোজে' উপন্যাসটি (তখনো নাম 'মেলঁকো-লিয়া') ফেরৎ দেয়।

ওলগা কে নিয়ে সার্ত্র্‌ ও সিমন দ বোভোয়ার 'এয়ী' র জীবন কাটাতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এই অভিজ্ঞতা থেকে সিমন দ বোভোয়ার পরে 'ল্যাভিতে' (আমন্ত্রিতা) উপন্যাসটি লেখেন।

সাধারণ নির্বাচনে সার্ত্র্‌ ভোট দেন না কিন্তু গণফ্রন্টের বিজয়ে উল্লসিত হন।

১৯৩৭

প্যারিসে বদলি। লিসে পাস্ত্যর-এ অধ্যাপনা। 'লা নোজে' ছাপার জন্য গৃহীত হয়। জুলাই মাসে লা নুভেল রভ্যু ফঁ্রসেজ পত্রিকায় 'ল ম্যুর' (দেয়াল) গল্পটি প্রকাশিত হয়। জিদ গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন।

১৯৩৮

এপ্রিলে 'লা নোজে'-র প্রকাশ। ডস পাসোস, ফকনার ও বাল্যবন্ধু পল নিজ্‌ঁ সম্পর্কে রচনা। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ।

'লে শম্যাঁ দ লা লিবের্তে' (মুক্তির পথ) উপন্যাসের পরিকল্পনা।

১৯৩৯

ফেব্রুয়ারী মাসে গল্প সংকলন 'ল ম্যুর' (দেয়াল) এবং ডিসেম্বরে 'এস্‌কিস্‌ দ্যুন তেয়োরি দেজেমোসিয়োঁ' (অনুভূতি বিষয়ক তত্ত্বের রেখাচিত্র) প্রকাশিত হয়।

ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন, সেখানে ইলিয়া এরেনবুর্গ-এর সঙ্গে পরিচয় হয়।

সেপ্টেম্বরে সৈন্যদলে ডাক পড়ে এবং আলজাসে গিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়। 'লাজ দ রেজ্ঁ' রচনা সুরু।

১৯৪০

পরে প্রকাশ করার কথা ভাবলেও মার্চ মাসে 'লিমাজিনের' (কাল্পনিক) প্রকাশিত হয়।

'ল ম্যুর' গল্প-সংকলনের জন্য 'ল প্রি দ্যু রোমঁ পপ্যুলিস্ত' পুরস্কার লাভ।

জার্মানীর ফ্রান্স আক্রমণের সুরুতে যে মাসে সার্ত্র্-এর বন্ধু পল নিজ্‌ঁ সীমান্তে নিহত হন। জুন মাসে লোরেন-এ সার্ত্র্ বন্দী হন।

বন্দী শিবিরে কিছু পাদ্রীর সঙ্গে সার্ত্র-কে হাসপাতালে কাজ করতে হয়। পাদ্রীদের কাছে তিনি হাইডেগার-এর দর্শন ব্যাখ্যা করেন। ক্রিসমাসে তিনি একটি ধর্মীয় নাটক (মিস্‌ট্রি) রচনা করে বন্দী-শিবিরে অভিনয় করান, নিজেও তাতে অভিনয় করেন। এই নাটকে ধর্মীয় রূপকের আড়ালে ছিল প্রতিরোধের আহ্বান।

১৯৪১

নিজেকে অসামরিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দিয়ে সার্ত্র-এর মুক্তিলাভ।

'দার্শনিক মের্লো-পোঁতি ও অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের প্রতিরোধ দল 'সমাজবাদ ও মুক্তি' নামক সংঘটন প্রতিষ্ঠা, যা খুব একটা সফল হয় না এবং কয়েকমাস পরে ভেঙে যায়।

কম্যুনিস্টরা গুজব রটিয়ে দেয় যে সার্ত্র 'দালাল'। আলবের্তো জাকোমেত্তি-র সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত। 'লাজ দ রেজ্ঁ' রচনা শেষ করে 'লে মুশ' (মাছি) নাটক ও দার্শনিক গ্রন্থ 'লেৎর্ এল নেয়ঁ' (অস্তিত্ব ও শূন্যতা) রচনার সুরু। লিসে কঁদর্সে-তে অধ্যাপনা (১৯৪৪ পর্যন্ত)।

সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৯৩৮

জ্যুলিয়া গ্রাক : আর্গল-এর বাগানবাড়িতে (উ); আর্তো : নাট্যকলা ও তার ছায়া (প্র); (ল তেয়াৎর্ এ সোঁ দুব্‌ল্)। কামু্য : পরিণয় (নোস্); বাশলার : আগুনের মনোবিশ্লেষণ (দ)। গোপাল হালদার : একদা (উ); বিষ্ণু দে : চোরাবালি (ক)।

১৯৩৯

১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ২য় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯—১৯৪৫) সুরু। বৃটেন ও ফ্রান্সের জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। পোলাণ্ড ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে জার্মান-রুশ চুক্তি।
এমে সেজার : স্বদেশে ফেরার খাতা (ক); তারাশংকর : ধাত্রীদেবতা (উ); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সরীসৃপ (গ)।

১৯৪০

ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে ইতালির যুদ্ধ ঘোষণা। মে মাসে জার্মানীর ফ্রান্সে অভিযান। জেনারেল পেতাঁর সন্ধি প্রস্তাব ও জার্মানদের ক্রীড়নক হিসেবে ভিশিতে সরকার গঠন। লণ্ডন থেকে জেনারেল দ গোল-এর প্রতিরোধের আহ্বান। জার্মানী, ইতালী ও জাপানের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। ট্রট্‌স্কি-কে হত্যা। ব্রতোঁ : অঁতোলজি দ ল্যুমুর নোয়ার (কুটিল পরিহাসের সংকলন)। রবীন্দ্রনাথ : নবজাতক (ক); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সহরতলী (উ); প্রেমেন্দ্র মিত্র : সম্রাট (ক); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : উত্তরফাল্গুনী (ক); বিষ্ণু দে : পূর্বলেখ (ক); সমর সেন : গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (ক); সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক (ক)।

১৯৪১

জাপান-রুশ চুক্তি। জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ। লণ্ডনে ফরাসী জাতীয় কমিটি গঠন। পার্ল হার্বারে জাপানী আক্রমণ। জার্মানী, ইতালী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের যুদ্ধ ঘোষণা।

অঁদ্রে ব্রতোঁ, মাক্‌স্ এর্ন্‌স্ট ও অঁদ্রে মাসোঁর যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথ : আরোগ্য (ক) জন্মদিন (খ) সভ্যতার সংকট (প্র) ; বিভুতিভূষণ : যাত্রাবদল (গ)।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯৪৩

১৯৪২-এ শেষ করা 'লে মুশ' ও 'লেৎর্ এ ল নেয়ঁ'-র প্রকাশ।

জাতীয় লেখকসঙ্ঘে যোগদান ও গোপনে প্রকাশিত 'কঁবা' (লড়াই) ও 'লে লেৎর ফ্রঁসেজ' পত্রিকায় স ক্রিয় সহ যোগতা। কাম্যু-র সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

এক সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিতে '৪৩-'৪৪এ কয়েকটি চিত্রনাট্য-রচনা। কয়েকদিনে 'লেজোৎর্' (অন্যেরা) নাটক রচনা, যার পরবর্তী নাম 'য়ুই ক্লো' (রুদ্ধ দ্বার)।

১৯৪৪

ককতো, কাম্যু, সালাক্রু, ভিলার-এর সঙ্গে নাটক সম্পর্কে বিতর্কে অংশ গ্রহণ। ফরাসী জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনাকারী জাতীয় কমিটির সদস্য। 'কঁবা' পত্রিকায় জর্মন 'অধিকারের দিনগুলি' সম্বন্ধে রিপোর্টাজ। পরিকল্পিত 'লে তঁ মদের্ন' (আধুনিক কাল) পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলী গঠন। 'ল স্যুরসি' রচনা শেষ। 'আকসিয়ঁ' পত্রিকায় কম্যুনিস্ট আক্রমণের জবাবে অস্তিবাদ সম্পর্কে রচনা। হেমিংওয়ে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ, জঁ জনে-র সঙ্গে হৃদ্যতা। অধ্যাপনা থেকে অনির্দিষ্টকালের বিরতি গ্রহণ।

১৯৪৫

প্রকাশ : 'উই ক্লো', 'লাজ দ রেজ' 'ল স্যুর্সি'। সরকারী খেতাব (লেজিয়ঁ দন্নর) প্রত্যাখান।

কঁবা ও ল ফিগারো পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে গমন। সেখানে অঁদ্রে মার্সোঁ, ব্রতোঁ, লেভি-স্ত্রোস ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দলরেস্ ভে নাম্নী মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক।

অস্তিবাদ-এর প্রভাব বৃদ্ধি।

১৫ই অক্টোবর 'লে তঁ মদের্ন্' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ। 'অস্তিবাদ কি একটা মানবতাবাদ ?' শীর্ষক বিখ্যাত বক্তৃতা। [বোরিস ভিয়ন্ র তাঁর 'লেক্যুম দে জুর' উপন্যাসে কৌতুকের মধ্য দিয়ে এ বক্তৃতাকে অমর করা হয়েছে]

১৯৪৬

প্রকাশ : লেক্জিস্তঁসিয়ালিস্ম্ এতঁয়্যুমানিস্ম্ (অস্তিবাদ একটা মানবতা-বাদ), মর্ সঁ সেপুলত্যুর (সমাধিবিহীন মৃতেরা), লা পুতঁ্যা রেস্পেক্ত্যুয়জ (বিনীতা বেশ্যা), 'রেফ্লেক্সিয়ঁ স্যুর লা কেস্তিয়ঁ জ্যুইভ্' (ইহুদী সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা)। সংবিধান সম্পর্কিত রেফারেন্ডামে ভোট দানে বিরত থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালিতে বক্তৃতা। 'লে তঁ মদের্ন' পত্রিকায় 'মাতেরিয়ালিস্ম্ এ রেভল্যুসিয়ঁ' (বস্তুবাদ ও বিপ্লব)। সার্ত্র মাকে নিয়ে নতুন বাসা ভাড়া করেন, এই বাসায় তাঁরা ১৯৬২ পর্যন্ত ছিলেন। য়ুনেস্কো-র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা। হল্যাণ্ড ভ্রমণ। কাম্যুর সঙ্গে প্রথম বিরোধ।

১৯৪৩

স্টালিনগ্রাডে রুশ বিজয়। মুসোলিনির পতন ও ইতালীর আত্মসমর্পণ। বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর।

জঁ আনুই : আঁতিগোন (না) স্যাপেরভিএল : অভাগিনী ফ্রান্সের কবিতা (ক); সিমন দ বোভোয়ার : আমন্ত্রিতা (উ)। তারাশংকর : পঞ্চগ্রাম (উ) বুদ্ধদেব বসু : দময়ন্তী (ক)।

চারু শিল্পীদের 'ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৪

জুন মাসে মিত্রশক্তির নর্মাণ্ডি-তে অবতরণ। আগষ্ট মাসে প্যারিসের মুক্তি।

কামু্য : ভুল বোঝাবুঝি (না)। বিভূতিভূষণ : দেবযান (উ) জীবনানন্দ : মহাপৃথিবী (ক); সমর সেন : তিনপুরুষ (ক) বিজন ভট্টাচার্য : নবান্ন (না); অন্নদাশংকর রায় : বিনুর বই (প্র)।

রোমাঁ্যা রোলাঁ-র মৃত্যু। জার্মান কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে মাক্‌স্ জাকব-এর মৃত্যু।

১৯৪৫

৮ই মে : জার্মানীর আত্মসমর্পণ। হিটলারের অন্তর্ধান। মুসোলিনির ফাঁসি। জেনারেল পেতাঁ্যা-র মৃত্যুদণ্ড। ৬ই আগষ্ট : হিরোশিমায় আণবিক বোমা।

ভিয়েৎনামে ফরাসি অধিকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম সুরু।

বঁজাম্যাঁ পেরে : কবির অসম্মান (ক); দেনো : শেষ কবিতা (ক)।

সতীনাথ ভাদুড়ী : জাগরী (উ)।

পল ভালেরি ও রবের দেনো-র মৃত্যু।

১৯৪৬

বাংলা ও বিহার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

পের্স : পবন (ক) প্রেভের : কথা (ক), কাহিনী (ক); জিদ : তেজে (উ)। সুভাষ মুখোপাধ্যায় : চিরকুট (ক); বুদ্ধদেব বসু : হঠাৎ আলোর ঝলকানি (প্র); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শহরবাসের ইতিকথা (উ)।

১৯৪৭

প্রকাশ : সিতুয়াসিয়োঁ য় (প্রবন্ধ সংকলন, ১ম খণ্ড), বোদলের ; 'লে তঁ মদের্ন' পত্রিকায় 'কেসকলা লিতেরাত্যুর ?' (সাহিত্য কি ?) রচনার প্রকাশ সুরু। প্রাভ্‌দা-র আক্রমণের উত্তর দান। মৃত বন্ধু পল নিজঁ সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

রেইমোঁ আরোঁ ও আর্থার কোয়েসলারের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

১৯৪৮

প্রকাশ : সিতুয়াসিয়োঁ দ্যো (প্রবন্ধ সংকলন ২য় খণ্ড)।

গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সম্মেলন দলে যোগদান। অল্পকালের মধ্যে এই দল সার্ত্র ও দাভিদ্‌ রুসে র দল বলে পরিচিত হয়। 'লে ম্যাঁ সাল' (নোংরা হাত) নাটকের প্রথম অভিনয় ও সাফল্য ; কম্যুনিস্টরা এই নাটকের বিরুদ্ধ প্রচার করে এবং সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষ এই নাটককে রাশিয়া বিরোধী বলে বিবেচনা করে।

ইজরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে সমর্থন। পোপের দপ্তর থেকে সার্ত্র-এর সমস্ত রচনাকে বর্জনের আদেশ জারি করা হয়।

মালরো র বিরোধিতা-র ফলে 'লে তঁ মদের্ন' কে গালিমার ছেড়ে অন্য প্রকাশকের দারস্থ হতে হয়।

১৯৪৯

প্রকাশ : 'লা মর দঁ লাম' (আত্মার মধ্যে মৃত্যু), 'সিতুয়াসিয়ঁ ত্রোয়া' (প্রবন্ধসংকলন ৩য় খণ্ড) 'অঁতরতিয়ঁ স্যুর লা পলিতিক' (রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা) 'কঁবা' পত্রিকায় লুকাচ্‌-এর সঙ্গে বিতর্ক।

গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সম্মেলন দল থেকে পদত্যাগ। আমেরিকা ভ্রমণ।

'লে তঁ মদের্ন' পত্রিকায় 'লে শম্যাঁ দ লা লিবের্তে'-র চতুর্থ খণ্ড আংশিক প্রকাশিত, এই চতুর্থ খণ্ড রচনার পরিকল্পনা পরে পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে 'লে শম্যাঁ দ লা লিবের্তে' তিন খণ্ডে সমাপ্ত : লাজ দ রেজঁ, ল স্যুর্সি, লা মর দঁ লাম।

নিকোল ভের্দেস-এর 'লা ভি কঁমঁস দমাঁ' (আগামীকাল জীবনের সুরু) চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা ও অভিনয়।

১৯৫০

মেরলো পৌন্তির সঙ্গে সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সাহারা ও আফ্রিকা ভ্রমণ।

রাজনৈতিক দিক থেকে সার্ত্রে র অনিশ্চিতি।

১৯৪৭

১৫ই আগষ্ট : ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ।

৫ই অক্টোবর : কমিনফর্ম-এর প্রতিষ্ঠা (রাশিয়ার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংস্থা)

কাম্যু : মারী (উ)। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (উ) বিষ্ণু দে : সন্দীপের চর (ক)।

আঁদ্রে জিদের নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৪৮

৩০-এ জানুয়ারি : গান্ধী নিহত। কমিনফর্মের সঙ্গে টিটোর বিরোধ। ইজরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য : ছাড়পত্র (ক); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : চতুষ্কোণ (উ); অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (প্র)। জীবনানন্দ দাশ : সাতটি তারার তিমির (ক); প্রেমেন্দ্র মিত্র : ফেরারী ফৌজ (ক); সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অগ্নিকোণ (ক); বুদ্ধদেব বসু : দ্রৌপদীর শাড়ি (ক), এন্ একর্ অফ গ্রিন গ্রাস (প্র)।

টি, এস এলিয়ট-এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৪৯

চীনে চিয়াংকাইশেকের পতন ও চীন প্রজাতন্ত্র এর প্রতিষ্ঠা। ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম আণবিক বোমা পরীক্ষা।

জনে : ওপরের প্রহরা (না); ইওনেস্কো : টেকো গায়িকা (না); সিমন দ বোভোয়ার : নারীজাতি (ল দ্যোজিয়েম সেক্স্. (প্র)। বুদ্ধদেব বসু : তিথিডোর (উ); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ছোট বকুল পুরের যাত্রী (শ); সতীনাথ ভাদুড়ী : ঢোঁড়াই চরিত মানস (১ম খণ্ড)।

ফক্নার এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৫০

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা : ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি। কোরিয়ার যুদ্ধের সুরু।

আঁরি মিশো : পথ (পাসাজ); আদামভ্ : অভিযান (না); মার্গরিৎ দ্যুরাস : প্রশান্ত মহাসাগরের বিরুদ্ধে বাঁধ (উ); ইওনেস্কো : পাঠ (না)। বিষ্ণু দে : অন্বিষ্ট (ক)।

১৯৫২

প্রকাশ : সঁ্যা জনে, কমেদিয়াঁ এ মার্তির (সন্ত জনে, নট ও শহীদ)।

কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রথম সমঝোতা।

কাম্যুর সঙ্গে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ; এর পর দুজনের আর সাক্ষাৎ ঘটেনি।

নভেম্বর মাসে সার্ত্র্, পিকাসো এবং চ্যাপলিন মিশেল ভিয়ঁ-র বাড়িতে একসঙ্গে সান্ধ্যভোজ করেন।

ভিয়েনায় শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিরুদ্ধে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর। হাইডেগার এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯৫৪

প্রকাশ : কঁ (আলেকজঁদ্র্ দ্যুমা-র অবলম্বনে)।

দিয়েন-বিয়েন-ফু-কে ফরাসিদের পরাজয়ের পর সোভিয়েত ব্যালের উপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

রনো কারখানার শ্রমিকদের কাছে জুলিয়াস ফুচিক-এর 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' বইয়ের আলোচনা। বার্লিনে বিশ্বশান্তি কমিটির অধিবেশনে অংশ গ্রহণ। প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ। ফ্রান্স-সোভিয়েত সংঘের সহসভাপতি মনোনীত।

১৯৫৫

'নেক্রাসভ্ নাটকের অভিনয়। হেলসিংকির বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সম্মেলনে যোগদান ; সেখানে লুকাচের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯৫৬

প্রকাশ : 'নেক্রাসভ্' নাটক। ফরাসি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের জয়—সার্ত্র্ ভোট দেন তাঁর কেন্দ্রের কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে। ফরাসি সরকার কর্তৃক আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সামরিক শক্তির সাহায্য দমনের সক্রিয় বিরোধিতা।

সুয়েজে ফরাসি ইংরেজ-ইজরায়েলীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা।

হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা—কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ফ্রান্স-সোভিয়েত সংঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ; রচনা : 'ফঁতোম দ স্তালিন' (স্তালিনের ভূত)।

১৯৫৭

প্রথম পোলাণ্ড ভ্রমণ। একটি পোলিশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'একজিস্তঁসিয়ালিস্ম্ এ মার্কসিস্ম' (অস্তিবাদ ও মার্কস্‌বাদ)—পরে এই লেখা 'কেস্তিওঁ দ মেতদ্' (পদ্ধতির সমস্যা)-এর পরিণতি পায়।

আলজিরিয়ায় যুদ্ধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কয়েকবার প্রতিবাদ।

১৯৫১

সাম্যুয়েল বেকেট : গোদোর জন্য প্রতীক্ষা (না); ইওনেস্কো: চেয়ার (না)। বুদ্ধদেব বসু : মৌলিনাথ (উ) ; হেমিংওয়ে : বুড়ো লোকটা আর সমুদ্র (উ)। মোরিয়াক এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৫৪

আলজিরিয়ায় ফরাসিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সুরু (১৯৫৪-১৯৬২)।

সিমোন দ বোভোয়ার : মান্দারিনস্ (উ, গঁকুর পুরস্কার) ইওনেস্কো : আমেদে (না)। মিশেল ব্যুতর : মিলানের পথ (উ)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রতিধ্বনি (অনু, ক)। বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যচর্চা (প্র)।

হেমিংওয়ের নোবেল পুরস্কার লাভ জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু।

১৯৫৫

লেভি স্ত্রোস : করুণ গ্রীষ্মমণ্ডল (প্র) ; গোল্ডমান : লুক্কায়িত দেবতা (প্র) ; দ্যুরাস : স্কোয়ার (উ)। রব গ্রীয়ে : ল ভোয়াইয়র (উ)। আদামভ্ : পিংপং (না) ; অমিয় চক্রবর্তী : পালাবদল (ক) ; বুদ্ধদেব বসু : শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর (ক)।

১৯৫৬

ট্যুনিশিয়ায় ফরাসি প্রভুত্বের অবসান। সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দমন।

জনে : ঝুলবারান্দা (না) ; সারোৎ : সংশয়ের যুগ (প্র); ব্যুতর : সময় নির্ঘণ্ট (উ) ; কাম্যু : পতন (উ)। প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা (ক); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : দশমী (ক)।

হোয়ান রামোন হিমেনেথ-এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৫৭

ঘানা ও মালেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ। ভারতের সাধারণ নির্বাচনে, কেরালায় কমুনিস্ট পার্টির সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ।

রব-গ্রীয়ে : ঈর্ষা (উ) ; ব্যুতর : পরিবর্তন (উ); ক্লোদ সিমোঁ : বাতাস (উ); কাম্যু নির্বাসন ও রাজত্ব (গ)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ (প্র) ; অরুণ মিত্র : উৎসের দিকে (ক) ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ফুল ফুটুক (ক)।

আলবের কাম্যুর নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৫৮

রচনা করতে থাকেন 'সেকেস্ত্রে দালতোনা' (আলতোনার বন্দী; প্রকাশ ১৯৫৯) এবং 'ক্রিতিক দ লা রেঁজ দিয়ালেক্তিক্' (দ্বান্দ্বিক যুক্তির মূল্যায়ন)।

আলজিরিয়ার ফরাসি সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ; দ গোল-এর বিরুদ্ধে রচনা।

ইতালি ভ্রমণ। ২৮-এ সেপ্টেম্বরের রেফারেণ্ডামে না-বাচক ভোট দিতে আবেদন—বিপরীত ফলাফলে তীব্র হতাশা।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রথম হৃদরোগের আক্রমণ থেকে জীবনরক্ষা।

১৯৬০

প্রকাশ : 'ক্রিতিক দ লা রেজঁ দিয়ালেক্তিক'। সমগ্র সাহিত্যকর্মের জন্য ইতালিতে ওমেগা পুরস্কার লাভ।

কিউবা ভ্রমণ, ফিদেল কাস্ত্রো-র সঙ্গে হৃদ্যতা, চে গুয়েভারার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

যুগোস্লাভিয়া ভ্রমণ—মার্শাল টিটো কর্তৃক অভ্যর্থনা। আলজিরিয়ায় ফরাসি সরকারের যুদ্ধ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে '১২১ জনের ঘোষণাপত্র'-এ স্বাক্ষর।

১৯৫৭—১৯৬০-এর মধ্যে 'লে তঁ মদের্ন' কয়েকবার বাজেয়াপ্ত হয়।

শঁজেলিজে-তে প্রাক্তন যোদ্ধারা মিছিল করে দাবী জানায় 'সার্ত্র-কে গুলি করা হোক'।

ব্রেজিল ভ্রমণ ও কিউবা হয়ে প্রত্যাবর্তন। ১২১ জনের মামলায় দ গোল-এর নির্দেশ অনুসারে সার্ত্র-কে গ্রেপ্তার করা হয় নি; দ গোল-এর উক্তি: 'বুদ্ধিজীবিদের কথা ছেড়ে দাও…ভলতের-কে গ্রেপ্তার করা হয় না।'

১৯৬১

রেফারেন্ডামে না-বাচক ভোট দিতে আহ্বান।

আলজিরিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ।

ফান্‌ৎস্ ফানোঁ-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার; তাঁর 'পৃথিবীর অভিশপ্তেরা' গ্রন্থের ভূমিকা রচনা। গারোদি ও ঈপোলিৎ এর সঙ্গে দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ।

রোমে গ্রামৃচি ইনষ্টিট্যুটে 'মন্ময়তা ও মার্কস্‌বাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯৫৮

কিউবায় বিপ্লব। রেফেরাণ্ডামে ভোটাধিক্যে ফরাসি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হল—রাষ্ট্রপতি অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হলেন, ডিসেম্বরে জেনারেল দ গোল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

দ্যুরাস : মদেরাতো কঁতাবিল (উ); মোরিয়াক : সাম্প্রতিক অসাহিত্য (প্র)।

১৯৬০

পের্স : বৃত্তান্ত (ক); আরাগঁ : কবিরা (ক); ইওনেস্‌কো : গণ্ডার (না); ব্যুতর : ডিগ্রী (উ); ক্লোদ সিমঁ : ফ্লাণ্ডার্সের পথ (উ); অঁরি পিশেৎ : প্রত্যেকের প্রতি ওড (ক); রোলাঁ বার্ত : সমালোচনা ও সত্য (প্র)। অমিয়ভূষণ মজুমদার : নির্বাস (উ); সমরেশ বসু : বাঘিনী (উ)।

সাঁ্যা-জন পের্স-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। কাম্যু-র দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

১৯৬১

পাত্রিস লুমুম্বা নিহত। গোয়া পর্তুগীস শাসন মুক্ত ও ভারতভুক্ত।

বাশলার : স্বপ্নের কাব্যমীমাংসা (দ); মিশেল ফুকো : উন্মাদনার ইতিবৃত্ত (দ); ফিলিপ সোলেস : (উ); ফানোঁ : পৃথিবীর অভিশপ্তেরা (প্র); এমে সেজের : জরিপ (ক); সেঙ্গর : রাত্রি (ক)। বুদ্ধদেব বসু : শার্ল বোদলের ও তাঁর কবিতা (অ. ক); অমিয় চক্রবর্তী : ঘরে ফেরার দিন (ক); অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : যৌবন বাউল (ক), শক্তি চট্টোপাধ্যায় : হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য।

সার্ত্রের ফ্ল্যাটে দ্বিতীয়বার বোমা নিক্ষেপ, কিছুদিন পরে বাড়ি বদল। বাড়িতে বোমা পড়ার খবরে মামা আলবের সোয়েৎজের যে চিঠি লেখেন তার মধ্যে একজায়গায় ছিল, 'আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে তাদের মধ্যে যতবার তোর নাম দেখি ততবারই বোধ করি তুই আমার কত কাছের।'

সিমন দ বোভোয়ার এর সঙ্গে রাশিয়ায়। রাশিয়ান লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ক্রুশ্চেভ কর্তৃক অভ্যর্থনা। ফ্রান্সে ফিরে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণের পুনরায় মস্কো গমন।

প্রকাশ: সিত্যুয়াসিয়ঁ। IV, V ও VI (প্রবন্ধ সংকলন ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড), লে মো (শব্দ, আত্মজীবনী মূলক রচনা)। নীতি ও সমাজ সম্পর্কে রোমে গ্রামচি ইন্‌স্টিটুট-এ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা। রাশিয়া ভ্রমণ। ইতালীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, সার্ত্র্-এর দীর্ঘদিনের বন্ধু পালমিরো তোগলিয়াত্তি-র স্মরণে রচনা। নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান।

সিত্যুয়াসিয়ঁ। VII (প্রবন্ধ সংকলন ৭ম খণ্ড)।

১৯৫৬ সাল থেকে পরিচিত ইহুদী মেয়ে আর্লেৎ এর্কাল্‌ম্-কে আইনানুমোদিতভাবে দত্তক কন্যা হিসেবে গ্রহণ। ভিয়েৎনামের যুদ্ধের প্রতিবাদস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান। রাশিয়া ভ্রমণ। হেল্‌সিংকিতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ। ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মিতের‍ঁ-কে সমর্থন।

সিমন দ বোভোয়ার-এর সঙ্গে দুবার মিশর ও ইজরায়েল ভ্রমণ। মিশরে নাসের ও ইজরায়েলে এশকল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার আবহাওয়া তৈরি। সার্ত্র্ যুগপৎ ইজরায়েল-এর অস্তিত্ব রক্ষা ও প্যালেস্টেনীয়দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার সমর্থন করেন। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ সম্পর্কে 'লে তঁ মদের্ন'-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

আকাবা উপসাগর খুলে দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করায় আরব দেশগুলির তীব্র অসন্তোষ।

১৯৫৬-তে বার্টাণ্ড রাসেলের আহ্বানে সার্ত্র ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বিচার সভায় অংশ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৯৫৬-তে সার্ত্র প্যারিসে এই সভার অধিবেশন করার অনুমতি চান জেনারেল দ গোলের কাছে—এবং প্রত্যাখ্যাত হন। মে মাসে স্টকহোমে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়—সার্ত্র এর কার্যকরী সভাপতি মনোনীত হন। নভেম্বরে কোপেনহেগেন-এর কাছে এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

সিনিয়াভ্‌স্কি দানিয়েল-এর বিচার-এর প্রতিবাদে আরগঁ ও সার্ত্র কর্তৃক সোভিয়েত লেখকদের দশম সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

ফ্রান্সে রেফারেন্ডামের অনুমোদন অনুসারে রাষ্ট্রপ্রতি প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন এই প্রস্তাব গৃহীত। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা। কিউবায় রাশিয়ান রকেট স্থাপন – আন্তর্জাতিক উত্তেজনা।

লেভিস্ত্রোস : আদিম চিন্তা (প্র) ; নাতালি সারোৎ : সোনার ফল (উ) ; রবের প্যাঁজে : ল্যাকিজিতোয়ার (উ); আদামভ : বাকীদের রাজনীতি (না) ; অমিয় চক্রবর্তী : চলো যাই (ক) ; কমলকুমার মজুমদার : অন্তর্জলী যাত্রা (উ) ; অসীম রায় : রক্তের হাওয়া (উ) ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : যত দূরেই যাই (ক)।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের ফলস্বরূপ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত ; নেহেরুর মৃত্যু।

বার্ত: সমালোচনামূলক লেখা (প্র) ; রব গ্রীয়ে : নতুন উপন্যাসের জন্য (প্র) ; ল্যুসিয়াঁ গোল্ড্‌মান : উপন্যাসের সমাজতত্ত্বের জন্য (প্র) ; ফানোঁ : আফ্রিকান বিপ্লবের জন্য (প্র)।

ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট দ গোল পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ভিয়েৎনামে আমেরিকার বোমাবর্ষণ সুরু। পাক-ভারত সংঘর্ষ।

ক্যনো : নীল ফুল ; অ্যারাগোঁ : লা মিজ আ মর (উ) ; রব গ্রীয়ে : মিলন-গৃহ (উ) ; ল ক্লেজিয়ো : জ্বর (উ) ; মুরিসিয়ে : গৃহকর্তা : (উ)।

বিষ্ণু দে : একুশ বাইশ (ক) ; তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : মঞ্জরী অপেরা ; সমরেশ বসু : বিবর (উ)।

সলোকভ-এর নোবেল পুরস্কার লাভ।

ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির যুদ্ধ। জার্মানী ও আমেরিকায় ছাত্র বিক্ষোভ। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়।

ফ্রঁসিস্ পোঁজ : সাবান (ক) ; ক্লোদ সিমঁ : গল্প (উ) ; অন্দ্রে পেইর দ মঁদ্রিয়ার্গ : লা মার্জ (গঁকুর পুরস্কার) ; এমে সেজের : কঙ্গোতে একঋতু (না) ; ল ক্লেজিও : তের আমাতা (উ) ; ফিলিপ জাকোতে : হাওয়া (ক); মিশেল তুর্নিয়ে : ফ্রাইডে অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের প্রত্যন্ত (উ)। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : শুকসারী কথা (উ) ; বুদ্ধদেব বসু : রাত ভর বৃষ্টি (উ) ; অমিয় চক্রবর্তী : পুষ্পিত ইমেজ (ক) ; শঙ্খ ঘোষ : নিহত পাতাল ছায়া (ক) ; শক্তি চট্টোপাধ্যায় : সোনার মাছি খুন করেছি (ক) ; বিমল কর : পূর্ণ অপূর্ণ (উ) ; অন্নদাশংকর রায় : বিশল্যকরণী (উ) ; শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : ঘুণপোকা (উ)।

আর্থারাইটিস-এর আক্রমণ।

মে-মাসের ছাত্র-বিদ্রোহকে সমর্থন, পুলিশি দমননীতির নিন্দা। সার্ত্র রেডিও বক্তৃতায় বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের একমাত্র যে সম্পর্ক হতে পারে তা হোল এটাকে ভাঙার; বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাঙতে হ'লে একটি মাত্র উপায় রয়েছে—সেটা হোল রাস্তায় নেমে পড়া।' সর্বন-এর বিদ্রোহী ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা। কোহ্ন্-বেন্ডিট্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কম্যুনিস্ট পার্টি মে-র ছাত্র বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সার্ত্র অভিযোগ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েৎ সামরিক হস্তক্ষেপে তীব্র নিন্দা।

৩০-এ জানুয়ারি : মার মৃত্যু।

১০-ই ফেব্রুয়ারী : মিশেল ফুকো ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩৪ জন ছাত্রের বহিষ্কার-এর প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহণ। সভায় নিজের বসার জায়গায় সার্ত্র একটা কাগজের টুকরো পান, তাতে লেখা, 'সার্ত্র, যা বলার সংক্ষেপে বলবে', এই প্রথম নিজেকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতার সম্মুখীন বলে তাঁর বোধ হয়, সার্ত্র্-এর পরবর্তী পরিবর্তনের আরম্ভ এই সভা। মালরো এবং মোরিয়াক-এর সঙ্গে রেজিস দব্রে-র মুক্তির দাবী করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েৎ দমননীতি ও সলজেনিৎসিনকে সোভিয়েৎ লেখকসংঘ থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদ।

ফরাসি টেলিভিশনে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ সম্পর্কে ইণ্টারভিউ।

পশ্চিমী দেশগুলিতে ছাত্রবিক্ষোভ; ফ্রান্সে এই বিদ্রোহ জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, মে মাসে এক কোটি লোক ধর্মঘটে যোগ দেয়।

চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েত বাহিনী চেকদের 'মুক্তি আন্দোলন' দমন করে।

এরভে বাজ্যাঁ: মাতৃসম্পদ (উ); নাতালি সারোৎ: জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে (উ); সেংগর: শাকা (ক); আরাবাল: বিরাট অনুষ্ঠান (না);

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়: মহানগরী (ক); বুদ্ধদেব বসু: গোলাপ কেন কালো (উ); সমরেশ বসু: যৌবন (উ); অসীম রায়: শব্দের খাঁচায় (উ); শক্তি চট্টোপাধ্যায়: হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (ক)।

ফ্রান্সে রেফারেণ্ডামে দ গোলে-র প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোটাধিক্য—দ গোলে-র রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দান; জুন মাসে জর্জ পঁপিদু রাষ্ট্রপতি। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকায় বিপুল বিক্ষোভ। পশ্চিমবঙ্গে অন্তবর্তী নির্বাচন ও সি. পি. আই (মার্ক্সিস্ট) এর প্রাধান্য সহ যুক্তফ্রণ্টের জয়। সি পি. আই (মার্ক্সিস্ট) এর মধ্যে ভাঙন—বিপ্লববাদীদের আলাদা দলের সৃষ্টি।

মিশেল ফুকো: জ্ঞানের স্থাপত্য (দ); ক্লোদ সিমোঁ: ফার্সালের লড়াই (উ); এমে সেজের: ঝড় (না); বেকেট: ছাড়া (র)।

বিষ্ণু দে: সংবাদ মূলত কাব্য (ক); বুদ্ধদেব বসু: বিপন্ন বিস্ময় (উ); সুভাষ মুখোপাধ্যায়: যেতে যেতে দেখা (ক); অমিয় চক্রবর্তী: প্রেমের রঙ ময়ূরকণ্ঠী (ক); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: সরল সত্য (উ) সমরেশ বসু: দুই অরণ্য (উ); নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী: কলকাতার যীশু (ক)।

সামুয়েল বেকেটের নোবেল পুরস্কার লাভ। হো চি মিনের মৃত্যু।

'লা কোজ দ্যু পাপল' (জনগণের পক্ষে) পত্রিকার পরিচালনাভার গ্রহণ; এই পত্রিকার পূর্ববর্তী দুজন সম্পাদককে জেলে পাঠানো হয়েছিল, রাস্তায় কাগজ বিলি করার সময় পুলিস সার্ত্র্‌কে গ্রেপ্তার করে ও অবিলম্বে মুক্তি দেয়।

মাওপন্থী 'তু' (সব) পত্রিকার পরিচালনার ভার গ্রহণ। একটি ইণ্টারভিউতে সার্ত্র্‌ বলেন, একজন বুদ্ধিজীবির কর্তব্য হোল 'প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের জন্য কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবি সত্তাটাকে ধ্বংস করা।'

রেনো কারখানার শ্রমিকদের সামনে পিপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা।

প্রকাশ : 'লিদিয়ো দ লা ফামিঈ' I, II, (ফ্লোবের-এর ওপর বিপুলাকার আলোচনা গ্রন্থ ১ম ও ২য় খণ্ড)।

'জাক্যুজ' (অভিযুক্ত করছি) প্রকাশ, যাতে সার্ত্র্‌ নিয়মিত সক্রিয় সহযোগিতা করেন। রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থনে স্যাঁ বের্নার গীর্জায় অনশন ধর্মঘটের সক্রিয় সমর্থন। সাক্রে ক্যর গীর্জার ব্যর্থ অধিকার চেষ্টায় অংশ গ্রহণ।

লেখক পাদিলিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফিদেল কাস্ত্রো এবং কিউবা-র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। 'রেভল্যুসিয়োঁ' (বিপ্লব) পত্রিকার পরিচালনা ভার গ্রহণ এবং মোরিস ক্লাভেল এর সঙ্গে 'লিবেরাসিয়োঁ' (মুক্তি) সংবাদ-প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে নক্সালপন্থী আন্দোলন (৭০-৭২)। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন।

ইস্তনেসকো: জ্যো দ মাসাক্র্ (না); রব গ্রীয়ে: নিউইয়র্কে বিপ্লবের পরিকল্পনা (উ); মিশেল তুর্নিয়ে: ওল্‌নের রাজা (উ); রোলাঁ বার্ত: এস/জেদ (প্র); ল ক্লেজিও: যুদ্ধ (উ)।

বিষ্ণু দে: ইতিহাসে; ট্র্যাজিক উল্লাসে (ক); অরুণ মিত্র: মঞ্চের বাইরে মাটিতে (ক); শংকর: এপার বাংলা ওপার বাংলা (উ); সমরেশ বসু: মানুষ (উ)

২০ বছরের ইন্দো-সোভিয়েত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি। ইন্দোপাক সংঘর্ষ 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

রবের প্যাঁজে: নীতিকথা (উ): ক্লোদ সিমোঁ: ল কর কঁদ্যুকৃতর (উ); রনে শার: নগ্ন পথভ্রান্ত (ক)।

বুদ্ধদেব বসু: স্বাগত বিদায় (ক); শংকর: সীমাবদ্ধ (উ); সুভাষ মুখোপাধ্যায়: এই ভাই (ক); নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: উলঙ্গ রাজা (ক), অসীম রায়: আমি হাঁটছি (উ); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: অর্জুন (উ)।

প্রকাশ : 'সিত্যুয়্যাসিয়েঁা VIII, IX' ; লিদিয়ো দ লা ফামিঈ III। মিশেল মঁসো-র 'লে মাও অঁ ফ্রঁস (ফ্রান্সের মাওবাদীরা) গ্রন্থের ভূমিকা।

কারাগারে বিদ্রোহ নিয়ে আন্দোলন। রনো কারখানা থেকে সার্ত্র্‌কে বহিষ্কার। চরমপন্থী এক মার্কস্‌বাদীকে হত্যা সম্পর্কে সার্ত্র্‌-এর তদন্ত ও তার অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত। গুপ্ত মাওবাদী সংগঠন কর্তৃক মসিয়ো নগ্রেৎ-এর অপহরণ সমর্থন।

প্রকাশ : 'ম্য তেয়ার্ত দ সিত্যুয়াসিয়েঁা।

এলেক্‌সিয়েঁা পি এজ আ কোঁ' (নির্বাচন, গাঁড়লের ফাঁদ) প্রবন্ধে সার্ত্র্‌ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করে মার্চের নির্বাচন থেকে দূরে সরে থাকার জন্য আহ্বান জানান।

২১-এ মে সার্ত্র্‌-এর পরিচালনায় বিজ্ঞাপনহীন 'লিবেরাসিয়েঁা' পত্রিকার প্রকাশ।

৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক ইণ্টারভিউতে সার্ত্র্‌ নিজের জীবনের মূল্যায়ন করেন, নিজের প্রায়—অন্ধত্বের কারণে পড়া এবং লেখায় অক্ষমতার ফলে লেখক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন, পরিষ্কারভাবে মার্কস্‌বাদের থেকে নিজের দূরত্ব ঘোষণা করে নিজেকে 'অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী সমাজতন্ত্রে' ('সোসিয়ালিস্‌ম লিবের্তের') -এর সমর্থক বলে স্বীকার করেন।

লিখতে অক্ষম হওয়ায় বিভিন্ন ইণ্টারভিউতে নানা বিষয়ে নিজের চিন্তা প্রকাশ করেন।

জুন মাসে ব্রেজনেভ্‌-কে যখন রাষ্ট্রপতির এলিজে প্রাসাদে সরকারী সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে তখন বহু বুদ্ধিজীবির সঙ্গে সার্ত্র্‌ 'রকামিয়ে' থিয়েটারে পূর্ব ইয়োরোপের দলত্যাগীদের সম্বর্ধনা জানান।

'আমার ইজরায়েলীয় বন্ধুদের প্রতি' শীর্ষক আবেদন-পত্রে সার্ত্র্‌ ইজরায়েলীয়-দের প্যালেস্তানীয়দের সঙ্গে আলোচনার সমর্থন করতে আহ্বান জানান।

দত্তক-কন্যা আর্লেৎ ও পিয়ের ভিক্তর সহ সার্ত্র জেরুসালেমে যান। সেখানে ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চলের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্যালেস্টানীয়ের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন।

সিমলাতে ইন্দো-পাক শীর্ষ সম্মেলন ও চুক্তি।

নাতালি সারোৎ: তোমরা ওদের শুনতে পাচ্ছ (উ)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: কবি ও নর্তকী (উ); লীলা মজুমদার: ফেরারী (উ); শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়: পারাপার (উ); সুভাষ মুখোপাধ্যায়: ছেলে গেছে বনে (ক); বিমল কর: একা একা (উ)।

অঁরি মিশো: মুহূর্তের (ক); ক্লোদ সিমোঁ: ত্রিপ্তিক (উ); ল ক্লেজিয়ো: দানব (উ); পিয়ের এমান্যুয়েল: সোফিয়া (ক)।

বিমল কর: অন্তরাল (উ); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: স্বর্গের নীচে মানুষ (উ); শংকর: জন-অরণ্য (উ)।

'সিকিম' ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত। ভারতে 'জরুরী অবস্থা'র (এমারজেন্সি-র) ঘোষণা (জুন)।

মিশেল তুর্নিয়ে: উল্কা (উ); ল ক্লেজিয়ো: পৃথিবীর অপর প্রান্তে ভ্রমণ (উ); প্রেভের: গাছ (ক); জঁ কারিয়ল: গাছের কাহিনী (উ)।

বিষ্ণু দে: চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: সংসারে এক সন্ন্যাসী (উ)।

ইজ্‌রায়েলের প্রধান মন্ত্রী গোল্ডা মেইর ও মিশরের রাষ্ট্রপতি সাদাতের সাক্ষাত ও আলোচনা।

ভারতে জরুরী অবস্থার অবসান, নির্বাচন, কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের জয় ও মন্ত্রীসভা গঠন।

দকোঁয়া দিদিয়ে: জন লঁফের (উ)।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়: মহাশ্বেতা (উ); বিষ্ণু দে: উত্তরে থাকো মৌন (ক); সমরেশ বসু: মহাকালের রথের ঘোড়া (উ); অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত: গিলোটিনে আলপনা (ক); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: এক জীবনে (উ)।

পাসকাল জ্যারর্দ্যা: হলুদ বামন (উ); কামিঈ বুর্নিকেল: তঁপো (উ), পাত্রিক মোদিয়ানো: অন্ধকার দোকানের রাস্তা (উ)।

সমর সেন: বাবু বৃত্তান্ত (প্র); অরুন মিত্র শুধু রাতের শব্দ নয় (ক); নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: আজ সকালে (ক); সমরেশ বসু: অপদার্থ (উ)।

ভিয়েৎনামীয় উদ্‌বাস্তুদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন। রেইমঁ আরোঁ এবং আঁদ্রে গুস্‌কৃমান এর সঙ্গে কোন কারণের কথা চিন্তা না করে ফরাসী সরকারে উদ্‌বাস্তুদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত করার জন্য সার্ত্র্ এলিজে প্রসাদে যেতে স্বীকৃত হন ও সেখানে যান।

সেপ্টেম্বরে অসুস্থতা ও অবসাদ সত্ত্বেও নিহত পিয়ের গোল্ডম্যান-এর অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত থাকেন।

মার্চ মাসে 'নুভেল অব্‌সেরভাত্যর' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে বেনি লেভি (পিয়ের ভিক্‌তর) কর্তৃক সার্ত্র্-এর দীর্ঘ ইণ্টারভিউ-র প্রকাশ। এই সাক্ষ্যাৎ-কারে সার্ত্র্ তাঁর দার্শনিক রচনা এবং বিভিন্ন মতামতের আলোচনায় আত্ম-সমালোচনা ও চিন্তার বিবর্তনের পরিচয় দেন।

এই সংলাপের মধ্যে তিনি তাঁর শেষ নিরাশা ও আশার কথা প্রকাশ করেন 'পৃথিবী আজ মনে হচ্ছে কুৎসিত, খারাপ আর আশাহীন।··· কিন্তু আমি প্রতিরোধ করছি এবং আমি জানি আমি আশা নিয়েই মরব, কিন্তু এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।··· আশা বরাবর বিপ্লব ও বিদ্রোহের এক প্রধান চালিকা-শক্তি ··' (অনুবাদ : অরুণ মিত্র।)

২০-এ মার্চ অসুস্থ অবস্থায় ব্রুসে হাসপাতালে নীত।

মৃত্যু : ১৬ই এপ্রিল।

ভারতে কেন্দ্রীয় অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভার ভাঙন ও পতন।

সেজর: প্রধান এলজি গুচ্ছ (উ); রনে শার: মুমন্ত জানলা আর ছাদের ওপর দরজা (ক)।

অরুণ মিত্র: শিকড় যদি দেখা যায় (ক); কমলকুমার মজুমদার: পিঞ্জরে বসিয়া শুক (উ)।

ভারতে মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচন: কংগ্রেস (ই)-এর বিজয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা গঠন (১৪ই জানুয়ারী)।

সারোৎ: বারান্দায় বসা লোকটি (উ); আর্ল্যা বোস্কে: শতাব্দী শেষের সনেট (ক), জ' কো: জাঞ্জিবার বিজয় (উ); মিশেল তুর্নিয়ে: গাসপার, মেলশিয়র ও বালতাজার (উ); জ' কারিয়ল: আমি আর সবার ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে আছি (উ)।

ক=কবিতাগ্রন্থ; উ=উপন্যাস; না=নাটক; প্র=প্রবন্ধ; দ=দর্শন; র=রচনা; জী=জীবনী।